প্রাকৃতিকী

শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৪

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ২৲ দুই টাকা

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

এলাহাবাদ 'ইণ্ডিয়ান প্রেসে' শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্গীয়

মাতা-পিতার

পবিত্র নামে

উৎসর্গীকৃত

নিবেদন

নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী হইতে কতকগুলিকে লইয়া "প্রাকৃতিকী" রচিত হইল; ইহাতে কয়েকটি অপ্রকাশিত নূতন প্রবন্ধও স্থান পাইয়াছে। "শুক্রভ্রমণ" প্রভৃতি দুই তিনটি প্রবন্ধ প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা; তখন সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। এই কারণে নূতন এবং ঐ কয়েকটি পুরাতন প্রবন্ধের ভাবে ও ভাষায় পাঠক অসঙ্গতি লক্ষ্য করিবেন। পুরাতন প্রবন্ধগুলির সহিত আমার কয়েকটি পরলোকগত সুহৃদের স্মৃতি জড়িত আছে; এই জন্যই মাসিক পত্রিকার জীর্ণ পাতা হইতে উদ্ধার করিয়া সেগুলিকে পুস্তকে স্থান দিলাম। এই ইচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য পাঠকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন বোলপুর
ভাদ্র ১৩২১

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

চিত্রসূচী

বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন

আমাদের শাস্ত্রে "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" বলিয়া যে পঞ্চভূতের উল্লেখ আছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদের চারিটি—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুকে ভূত অর্থাৎ মূলপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের এই প্রাণিউদ্ভিদ্ নদীসমুদ্র, শিলাকঙ্কর সকলই সেই চারিটি মূলপদার্থে গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ যখন বহুযুগের অসম্বদ্ধ ভাব, চিন্তা ও অদ্ভুত কাহিনীর আবর্জ্জনা হইতে রাসায়নিক তত্ত্বের সারোদ্ধার করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিমান্ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখনো ইঁহারা সেই চাতুর্ভৌতিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। বসন্তের দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শ যেমন সমস্ত প্রকৃতিকে সজীব করিয়া তোলে, উনবিংশ শতাব্দীর উষালোকের স্পর্শ তেমনি সমগ্র সভ্যদেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া সত্যকে বুঝিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রসায়নবিদ্‌গণও প্রাচীন পুঁথির পাতা

উল্টাইয়া মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি কি কারণে মূলপদার্থ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। বীক্ষাণাগারেও দেশবিদেশের মহাপণ্ডিতগণ পরীক্ষা সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্থির হইয়া গেল, জলবায়ু বা অগ্নিমৃত্তিকার কোনটিও মূলপদার্থ নয়, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি কয়েকটি বায়ব পদার্থ এবং গন্ধক, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি কয়েকটি তরল ও কঠিন পদার্থ সৃষ্টির মূল উপাদান। ইহার পরে অণু-পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া কি প্রকারে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। অধিক দিন নয়, দশ বারো বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ সেই অণু-পরমাণুরই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন এবং উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির মূল রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি এক বৃহৎ সমস্যা উপস্থিত হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

পদার্থকে সচরাচর কঠিন, তরল ও বায়ব, এই তিন অবস্থাতেই আমরা দেখিয়া থাকি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স্ (Crooks) সাহেব পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রায়-বায়ুশূন্য কাচের নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার জুড়িয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে থাকিলে, শূন্য নলের ভিতর বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে। এই পরীক্ষায় ক্রুক্স্ সাহেব এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম জড়কণাকে বিদ্যুৎ বহন করিতে দেখিয়াছিলেন। কণিকাগুলিতে কঠিন, তরল বা বায়ব কোন পদার্থেরই লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই আবিষ্কর্ত্তা উহাদিগকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম নেতা সার্ উইলিয়ম্ লজ্ (Lodge) এই অদ্ভুত কণাগুলি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে জানা গিয়াছিল, তাহারা আকারে ও

গুরুত্বে লঘুতম পরমাণু অপেক্ষাও সহস্রগুণে ক্ষুদ্র! লজ্ সাহেব বুঝিয়াছিলেন, হয় ত এই জিনিষটাই সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের মূল উপাদান, কিন্তু তখন বিষয়টির বিশেষ আলোচনা হয় নাই। কাজেই ক্রুকস্ সাহেবের সেই চতুর্থ অবস্থার কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

প্রায় কুড়ি বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ষ্টোনি সাহেব (Johnstone Stoney) দেখিয়াছিলেন, অনেক যৌগিক পদার্থে ব্যাটারির দুইপ্রান্ত ডুবাইয়া রাখিলে পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং বিশ্লিষ্ট অংশগুলি (Ions) তারের প্রান্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ বহন করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। ইনি মাপিয়া ঐ বিদ্যুতের পরিমাণকে ইলেক্ট্রন (Electron) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রুকস্ সাহেবের সেই পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বিদ্যুৎপূর্ণ কণিকার উপর বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, এগুলিরও বিদ্যুতের পরিমাণ ষ্টোনি সাহেবের ইলেক্ট্রনের সহিত অবিকল এক। সকলে ক্রুক্সের সেই সূক্ষ্ম কণিকাগুলিকে ইলেক্ট্রন্ নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন, এবং চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ জড়কণিকা ও ইলেক্ট্রনের একতা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ পর্য্যন্ত স্বর্ণ-রৌপ্য হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন প্রভৃতিকে যে, মূলপদার্থ বলা
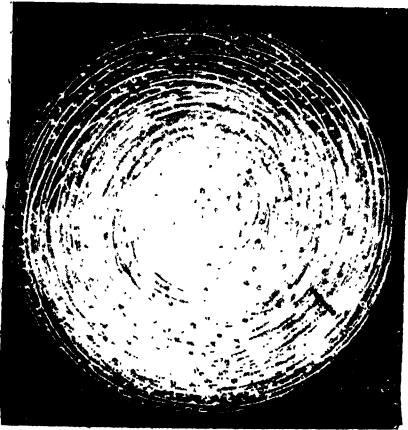
সহস্র ইলেক্ট্রনযুক্ত একটি পরমাণুর কল্পিত চিত্র

হইতেছে, তাহা ভুল। ইলেক্ট্রনের আবিষ্কার প্রচলিত রাসায়নিক সিদ্ধান্তকে খুবই বিচলিত করিয়া দিয়াছিল।

এই প্রকার একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারকে সম্মুখে রাখিয়া বৈজ্ঞানিক-গণ আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন নাই। নূতন গবেষণার শত দ্বার মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেরই বড় বড় বৈজ্ঞানিক মনে করিতে লাগিলেন, সত্তর বা আশীটি মূলপদার্থ নাই; বোধ হয়, এক মূলপদার্থে সমগ্র বিশ্বের রচনা হইয়াছে এবং তাহা সেই ইলেক্ট্রন্।

ক্রুক্‌স্ সাহেবও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন না। সকল পদার্থের গোড়ায় একটা মাত্র মূলপদার্থেরই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব বলিয়া ইঁহার মনে হইয়াছিল। এই কাল্পনিক জিনিষটাকে "Protyle" নামে আখ্যাত করিয়া, ইনি তাঁহার নির্জ্জন বীক্ষণাগারে বসিয়া বিশ্বরচনার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ইহাই মনে হইতে লাগিল, তাঁহার আবিষ্কৃত সেই সূক্ষ্ম কণাগুলি যেন কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে একত্র হইয়া হাইড্রোজেনের পরমাণুর রচনা করিতেছে। তাহাদেরই সহিত আবার কতকগুলি নূতন কণিকা অল্পাধিক পরিমাণে মিলিয়া গন্ধক, আর্সেনিক্, লৌহ, তাম্রাদির সৃষ্টি করিতেছে এবং সমবেত কণিকার সমষ্টি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইলে ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি গুরু ধাতুর সৃষ্টি চলিতেছে। স্বপ্নের শেষে দেখিতে পাইলেন, সেই বিদ্যুদ্বাহক কণিকা লঘুগুরু পদার্থের জন্ম দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, গুরু ধাতু হইতে তাহারা গোলা-গুলির মত ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাকে লঘুতর পৃথক্ পদার্থে পরিণত করিতেছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ক্রুক্‌সের পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সত্যই স্বপ্নের ন্যায় ছিল। বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবে কিন্তু তাহাই সত্যে পরিণত হইতে চলিতেছে। ইলেক্ট্রন্ জিনিষটা যে কি, তাহা আজও

নিঃসংশয়ে স্থির হয় নাই। কেহ সেগুলিকে বিদ্যুৎপূর্ণ জড়কণা বলিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ ইহাদিগকে খাঁটি বিদ্যুৎ বা মূর্ত্তিমান্ শক্তি বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু জিনিষটা যে সৃষ্টির মূল উপাদান সে বিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়া আসিয়াছেন।

সংগঠনতত্ত্ব জানা না থাকিলেও, ইলেক্ট্রনের আকার প্রকার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে, হাজারটি মিলিয়া জোট না বাঁধিলে, তাহাদের সমবেত আয়তন বা গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হয় না এবং যখন ছুটিয়া চলে তখন উহাদের বেগের পরিমাণ আলোকের বেগের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ হইয়া দাঁড়ায়।

রসায়নবিদ্‌গণ যখন এই অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান পাইয়া তাহার রহস্য আবিষ্কারের জন্য অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন রেডিয়ম্ নামক এক অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার গবেষণার এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। নূতন ধাতুর আণবিক গুরুত্ব স্থির হইয়া গেল, বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) উহা কোন্ কোন্ বর্ণরেখার পাত করে তাহা দেখা গেল, এবং কোন্ কোন্ পদার্থের মিলনে তাহা কতগুলি যৌগিক উৎপন্ন করে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু রতিপ্রমাণ রেডিয়ম্ হইতে অবিরাম যে তাপরশ্মি ও ইলেক্‌ট্রন্ নির্গত হয় তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। মূল পদার্থের পরিবর্ত্তন নাই ও বিয়োগও নাই বলিয়া যে বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকগণ শত বৎসর ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলেন, তাহা একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা পাইয়া গেল। তা' ছাড়া আলোক ও বিদ্যুতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, তাহারো ভিত্তি যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর সেই বিদ্যুন্ময় ইলেক্ট্রন-প্রবাহ ও রেডিয়ম্ লইয়া এ পর্য্যন্ত নানা দেশে নানা গবেষণা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে

প্রচলিত রাসায়নিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকদিগের অবিশ্বাসের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। রেডিয়ম্ একটা ধাতু এবং মূলপদার্থ, সুতরাং প্রচলিত সিদ্ধান্তানুসারে ইহার রূপান্তর না হইবারই কথা। কিন্তু ইহারই দেহ হইতে যে সকল ইলেক্ট্রন্ অবিরাম নির্গত হয়, তাহা যখন জোট বাঁধিয়া হেলিয়ম্ (Helium) নামক আর একটি ধাতুর উৎপত্তি করে, তখন রেডিয়মকে পরিবর্ত্তনশীল মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। কেবল রেডিয়মেরই এই সৃষ্টিছাড়া ধর্ম্ম দেখিলে নিশ্চিন্ত থাকা যাইত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে অনেক মূলপদার্থে এই প্রকার ভাঙা-গড়ার সন্ধান পাইয়াছেন, কাজেই ব্যাপারটিকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না।
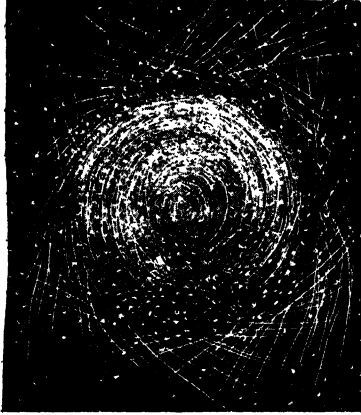
রেডিয়মের একটি পরমাণু হইতে সহস্র সহস্র ইলেক্ট্রনের নির্গমন

ক্রুক্‌স্ সাহেব তাঁহার স্বপ্নের এই আংশিক সফলতা দেখিয়াই নিরস্ত হন নাই। ইনি পূর্ব্বোক্ত ইউরেনিয়ম্ নামক গুরু ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, ইহা খনির যে স্থানে থাকে, তাহার চারিদিকে রেডিয়ম্ পাওয়া যায়। প্রথমে ইহাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যেখানে ইউরেনিয়ম্ আছে, তাহারি চারিদিকে রেডিয়ম্ জমিয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইউরেনিয়ম্ ইলেক্‌ট্রন্ ত্যাগ করিয়া ক্ষয় পাইলেই যে, লঘুতর

ধাতু রেডিয়মের উৎপত্তি করে, ইহাতে আর অবিশ্বাস করা চলিতেছে না। বংশের পরিচয় দিতে গেলে, বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম তালিকা-শীর্ষে স্থান পায়। তার পর পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রের নাম যথাক্রমে বংশতালিকায় লেখা হইয়া থাকে। ক্রুক্‌স্ সাহেব ও অপর বৈজ্ঞানিকগণ ইউরেনিয়মের এক বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। জিনিষটা জ্ঞাত অজ্ঞাত ও ধাতু অধাতু পদার্থের মধ্যে গুরুত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই ইহাকে প্রতিষ্ঠাতার আসন দিতে হইয়াছে। তাহার পরে ইহারি দেহচ্যুত ইলেক্ট্রন্ দ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থের উৎপত্তি হইল দেখিয়া, তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। এই প্রকারে এক ইউরেনিয়মেরই পুত্র-পৌত্রাদির নামসহ এক প্রকাণ্ড বংশতালিকা পাওয়া গিয়াছে। সন্তান-দিগের মধ্যে কে কোন্ খনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি আকারে আছে, আজও তাহার সন্ধান হয় নাই, তথাপি উহার বংশধরের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের সকলেই ডাল্‌টনের সিদ্ধান্তে মূলপদার্থ অর্থাৎ খাঁটি কুলীন, কিন্তু এখন ইহারা সকলেই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নিজেদের কুল-গৌরব হারাইতেছে।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয় সত্তর-আশীটি মূলপদার্থের নাম মুখস্থ করাইয়া ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন যে, মূলপদার্থের পরিবর্ত্তন নাই এবং ক্ষয়ও নাই। এখন দেখিতেছি এই দু'টির উল্টাই উনবিংশ শতাব্দীর মূল-পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম। জীবরাজ্যে সকল জীবের আয়ুষ্কাল সমান নয়। যাহারা দুই চারি ঘণ্টায় জীবনের লীলা শেষ করে, এ প্রকার অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। আবার যাহারা দুইশত বৎসর বা হাজার বৎসর বাঁচিয়া আছে, এ প্রকার জীবের সহিতও আমাদের পরিচয় রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল বস্তুকে মূলপদার্থ বলা হইতেছিল, তাহাদের জীবনের ঐ প্রকার এক একটা সীমা আবিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। ইউরেনিয়ম্ প্রায় ত্রিশকোটী বৎসর জীবিত থাকে এবং

রেডিয়ম্ কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যেই বিকার প্রাপ্ত হইয়া পদার্থান্তরে পরিণত হয়। অর্থাৎ কয়েক রতি ইউরেনিয়ম্ ধাতুকে কোন পাত্রে রাখিয়া যদি ত্রিশ কোটি বৎসর প্রতীক্ষা করা হয়, তবে ঐ দীর্ঘকালের শেষে পাত্রে আর ইউরেনিয়মের সন্ধান পাওয়া যাইবে না ; উহার দেহনির্গত তেজ অর্থাৎ ইলেক্ট্রন্ হইতে যে সকল অপর পদার্থের উৎপত্তি হইবে, তাহারাই পাত্রটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিবে। সীসকের (Lead) গুরুত্ব স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর তুলনায় অনেক কম, সুতরাং কালক্রমে ক্ষয় দ্বারা সীসকের স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নয়। কোন ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তি তাঁহার লোহার বাক্সে সীসা বোঝাই করিয়া যদি সুবর্ণপ্রাপ্তির আশায় প্রতীক্ষা করেন, তবে অবৈজ্ঞানিকদিগের নিকট লাঞ্ছিত হইলেও বৈজ্ঞানিক সমাজে এখন তাঁহার সমাদর লাভের সম্ভাবনা আছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পদার্থতত্ত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, এই যে নদীসমুদ্রপ্রাণিউদ্ভিদ্ময় জগৎ দেখিতেছ, ইহা মূলে কিছুই নয়। জড় বলিয়া কোন জিনিষই বিশ্বে নাই। জড়ের সূক্ষ্মতম কণা অর্থাৎ পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া হাজারটি বা ততোধিক সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ কর, দেখিবে, এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি সেই ইলেক্ট্রনের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। আবার ইলেক্ট্রন্গুলি খাঁটি বিদ্যুতের কণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই বলিতে হইতেছে, এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিদ্যুতেরই রূপান্তর। অর্থাৎ জগতে জড় নাই, এক শক্তিকে লইয়াই বিশ্ব।

ক্রুক্স্ সাহেব গত শতাব্দীর শেষে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে। পদার্থতত্ত্ববিদ্গণ এখন স্বপ্নে জড়ের শক্তিমূর্ত্তি দেখিতেছেন ; স্বপ্ন সাফল্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষে এই সকল স্বপ্নের স্থানে কোন্ স্বপ্ন আসিয়া বিশ্বের কোন্ মূর্ত্তি সম্মুখে ধরিবে, তাহা কেবল বিশ্বনাথই জানেন।

পরশ-পাথর

রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক সময়ে এক দল লোক পরশ-পাথরের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন আধুনিক রসায়নী বিদ্যার ভিত্তিও প্রোথিত হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এমন একটা বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যাহার স্পর্শে লৌহ প্রভৃতি ইতর ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারা যায়। কোথা হইতে এই বিশ্বাস তাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাহার খোঁজ পাওয়া যায় না। তাঁহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় বৈদ্যুতিক চুল্লী, বুনসেনের শিখা, তাপমান বা বায়ুমান যন্ত্র কিছুই ব্যবহার করিতেন না,—নানা প্রকার গাছের শিকড়ের রস, তন্ত্রমন্ত্র, জপ হোম প্রভৃতি উপকরণ লইয়া লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিবার জন্য সাধনা করিতেন। শুনা যায়, এই সাধনায় নাকি তাঁহারা সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিকদের অস্তিত্ব আর নাই, তাঁহাদের পুঁথিপত্রও লোপ পাইয়াছে, সুতরাং কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহারা পরশ-পাথরের আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। আছে কেবল তাঁহাদের নাম—আল্‌কেমিষ্ট্।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই আল্‌কেমিষ্টদের অদ্ভুত খেয়াল বা পাগলামির কথা স্মরণ করিয়া যে কত বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তাই হয় না। কিন্তু গত দশ বৎসরে রসায়ন-শাস্ত্রে যে-সকল অদ্ভুত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে সেই বিদ্রূপকারিগণই বুঝিতেছেন, আল্‌কেমিষ্টরা পাগল ছিলেন না, তাঁহাদেরও সাধনা ছিল এবং তাহার ফলে তাঁহাদের সত্য-

দর্শন ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান রসায়নবিদ্ র‍্যাম্‌জে (Sir William Ramsay) সাহেব আজকাল মুক্তকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, লৌহকে সুবর্ণে এবং রাঙ্‌কে রৌপ্যে পরিণত করা অসাধ্যসাধন নয়। সুতরাং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সেই আল্‌কেমিষ্টের দল যে পরশ-পাথরের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহারি অনুসন্ধানে ছুটিতে হইতেছে।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের আবিষ্কারের কথা বুঝিতে হইলে একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে। সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উঠিলেই অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ পঞ্চভূতের অবতারণা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দিয়াই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং এই পাঁচটি পদার্থের প্রত্যেকটিই মূলপদার্থ অর্থাৎ তাহাদের আর রূপান্তর নাই। এই যে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, ঘরদুয়ার, সকলি সেই পঞ্চভূতের বিচিত্র মিলনে উৎপন্ন ; এগুলি যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন আবার সেই পঞ্চভূতের আকার গ্রহণ করে। প্রাচীনদের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়িয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। গত উনবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্‌টন্ সাহেব প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন, ক্ষিতি অপ্‌ প্রভৃতির কোনটিই মূলপদার্থ নয়। ইহাদের প্রত্যেকটিকেই বিশ্লেষ করা যায় এবং ইহাতে তাহাদের মধ্যে একাধিক অপর বস্তুর মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ডাল্‌টন্ সাহেব প্রচার করিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে সৃষ্ট নয় ; হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ প্রভৃতি বায়ব পদার্থ, গন্ধক অঙ্গার প্রভৃতি কঠিন পদার্থ এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থ দিয়া এই জগতের সৃষ্টি। তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে লাগিলেন, বায়ু জল প্রভৃতি ভূতপদার্থ, অক্সিজেন্ নাইট্রোজেন্ ও হাইড্রোজেন্ দিয়াই গঠিত। কাজেই প্রাচীন যুগের পঞ্চভূতের স্থানে বহু ভূতকে বসাইতে হইল ; বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়া

লইয়েন, হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্' গন্ধক স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি প্রায় নব্বুইটি বস্তু দিয়াই এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং এগুলিই প্রকৃত মূলপদার্থ। ইহাদের ধ্বংস বা রূপান্তর নাই।

ডাল্‌টন্ সাহেবের এই সিদ্ধান্তটি দীর্ঘকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে আদৃত হইয়া আসিতেছিল; কোন কালে যে ইহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হইবে এ কথা কেহ কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের মূলেও কুঠারাঘাত হইল। ফ্রান্সের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ক্যুরি সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রেডিয়ম্ নামক এক ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহা আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাণু অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। রেডিয়ম ধাতুটি মূলপদার্থ বলিয়াই জানা ছিল, কাজেই একটা মূল বস্তুকে ঐপ্রকারে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়া সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া গেলেন। ক্যুরি সাহেব এক রেডিয়মেরই বিশ্লেষ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না, থোরিয়ম্, ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি বহু ধাতব মূলপদার্থের ঐ প্রকার বিশ্লেষ দেখাইতে লাগিলেন এবং এগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যে, একই অতি সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হয় তাহাও সকলে দেখিলেন। পরমাণুর এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশগুলির নাম দেওয়া হইল ইলেক্‌ট্রন বা অতি-পরমাণু।

ক্যুরি সাহেবের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কার অতি অল্প দিনই হইল প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র রদারফোর্ড, সডি, টম্‌সন্ প্রমুখ বর্ত্তমান যুগের প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন; আজও এই সকল গবেষণার বিরাম নাই; ইহার ফলে আজকাল বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব নিত্যই আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহারা দেখিতে পাইলেন, রেডিয়ম্ ধাতু বিশ্লিষ্ট হইলে কেবলি ইলেক্‌ট্রন্ অর্থাৎ অতি-পরমাণুতে পরিণত

হয় না, সঙ্গে সঙ্গে উহা নাইটন্ (Niton) নামক আর এক নূতন ধাতুতেও রূপান্তরিত হয় এবং এই নাইটন্ জিনিষটা জন্মগ্রহণ করিয়াই আবার হেলিয়ম্ এবং রেডিয়ম্ জাতীয় আর একটি বস্তুতে (Radium-A) রূপান্তর গ্রহণ করে। কাজেই যে-সকল ধাতু এ পর্য্যন্ত মূলপদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদিগকেই বিশ্লিষ্ট ও রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া ইঁহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এই সকল আবিষ্কারে ডাল্‌টন্ সাহেবের পারমার্ণবিক সিদ্ধান্ত (Atomic Theory) আর অটল থাকিতে পারিল না। বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে লাগিলেন, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ প্রভৃতি নব্বুইটি ধাতু ও অধাতু মূলপদার্থ জগতে নাই ; মূলপদার্থ জগতে একটি মাত্রই আছে এবং তাহাই ঐ ইলেক্ট্রন্ বা অতি-পরমাণু। এগুলিই অল্প বা অধিক সংখ্যায় জোট বাঁধিয়া আমাদের সুপরিচিত অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতির উৎপত্তি করে। ইঁহারা আরও অনুমান করিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল যে, রেডিয়ম্ বা সেই জাতীয় বস্তুই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অতি-পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নহে, জগতের সকল বস্তুই ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া অতি-পরমাণুতে পরিণত হইতেছে এবং অতি-পরমাণু জোট বাঁধিয়া আবার নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিতেছে। ইঁহারা কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এই প্রকার এক বিশ্বব্যাপী ভাঙাগড়া লইয়াই এই জগৎ। এই ভাঙাগড়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

যখন সমগ্র জগৎ পূর্ব্বোক্ত নবাবিষ্কারে এবং নবভাবে আবিষ্ট, তখন ইংলণ্ডের প্রধান রসায়নবিৎ সার্ উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে ঐ রেডিয়ম্ লইয়াই নীরবে গবেষণা করিতেছিলেন। ইনি দেখিলেন, এই যে রেডিয়ম রূপান্তরিত হইয়া নাইটনে পরিণত হইল এবং নাইটন্ বহু তাপ ত্যাগ
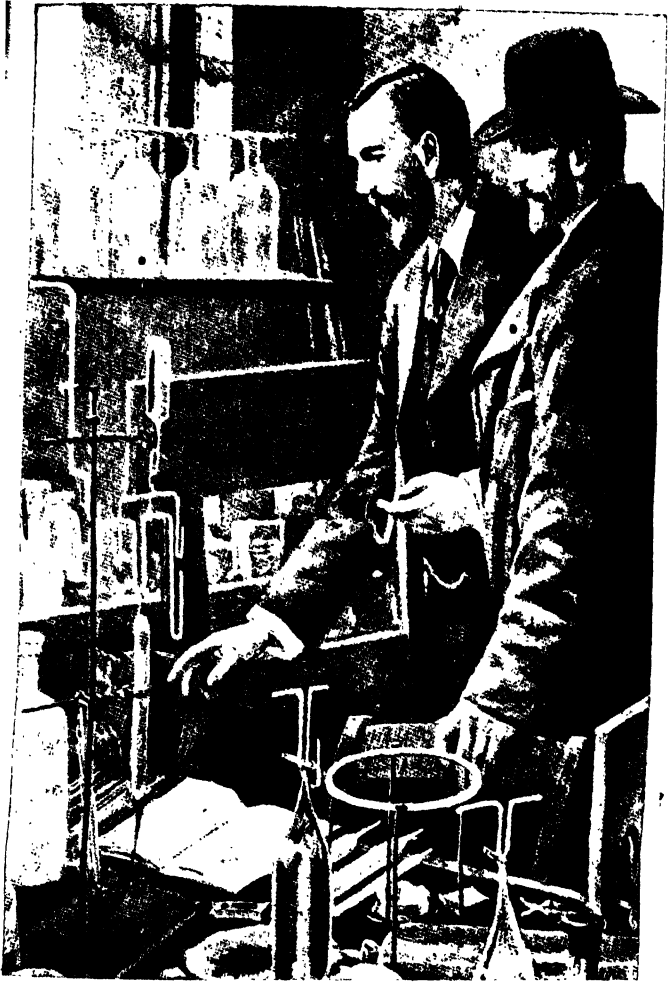
অধ্যাপক ক্যুরি ও সার উইলিয়ম্ র্যামজে

করিয়া হেলিয়ম্ হইয়া দাঁড়াইল, এই সমস্ত ভোজবাজি শক্তিরই লীলা। হিসাব করিয়া দেখিলেন, এক ঘন সেণ্টিমিটার (One Cubic Centimeter) স্থানে আবদ্ধ নাইটন্ বিশ্লিষ্ট হইয়া হেলিয়ম্ ইত্যাদিতে পরিণত হইলে, সেই আয়তনের চল্লিশ লক্ষ গুণ হাইড্রোজেন্‌কে পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার তাপ আপনা হইতেই জন্মে। তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এই বিপুল শক্তিরাশি খুব নিবিড়ভাবে রেডিয়মেই লুক্কায়িত থাকে এবং রেডিয়ম্ নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, তখন ঐ শক্তিই তাপের প্রকাশ করে। র‍্যাম্‌জে সাহেবের বিশ্বাস হইল, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এই প্রকার বিশাল শক্তিস্তূপ সঞ্চিত আছে, এবং সেই সযত্নরক্ষিত শক্তিভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া প্রকৃতিদেবী জগতে ভাঙাগড়ার ভেল্কি দেখান। রেডিয়মের ন্যায় গুরু ধাতু যখন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ত্যাগ করিয়া নাইটন্ ও হেলিয়ম্ প্রভৃতি লঘুতর বস্তুতে পরিণত হইতেছে, তখন লঘু পদার্থের উপরে প্রচুর শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কেন তাহাকে গুরুতর পদার্থে পরিণত করা যাইবে না ;—এই প্রশ্নটি র‍্যাম্‌জে সাহেবের মনে উদিত হইল। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করিতে পারিলে লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা কঠিন হইবে না, ইহা সকলেই বুঝিতে লাগিলেন।

প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রণালী আবিষ্কার করা কঠিন নয়, কিন্তু যে-সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপরিমিত শক্তিপ্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি জগতের কার্য্য চালাইয়া থাকেন, তাহার অনুকরণ করা মানব-বিশ্বকর্ম্মার সাধ্যাতীত। র‍্যাম্‌জে সাহেব ইহা জানিয়াও কোন কৃত্রিম উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করিয়া লঘু পদার্থকে স্বতন্ত্র গুরু পদার্থে পরিণত করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উপায় ধরা দিল না এবং রেডিয়ম্ বিযুক্ত হইবার সময়ে যে বিপুল শক্তি

দেহ হইতে নির্গত করে সে প্রকার শক্তিরও তিনি সন্ধান করিতে পারিলেন না। এই সময়ে আর একটি কথা র‍্যাম্‌জে সাহেবের মনে হইল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, নাইটন্ বিযুক্ত হইবার সময়ে স্বভাবতঃ যে বিপুল শক্তিরাশি দেহচ্যুত করে, তাহা যদি কোন উপায়ে অপর লঘু পদার্থের উপরে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে হয় তো সেই লঘু বস্তু কোন গুরু পদার্থে পরিণত হইতে পারিবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আরম্ভ হইল। প্রথমে কয়েক বিন্দু বিশুদ্ধ জলে নাইটন্ নিক্ষেপ করিয়া তিনি জলের হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের কোন পরিবর্ত্তন হয় কিনা দেখিতে লাগিলেন। জল যথারীতি বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করিতে লাগিল, এবং নাইটন্ হইতে হেলিয়ম্ জন্মিতে লাগিল। পাত্র হইতে এই সকল বাষ্প স্থানান্তরিত করিয়া তাহাতে আর কোনও নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে কিনা, র‍্যাম্‌জে সাহেব তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে দেখা গেল, ঐ সকল বাষ্প ব্যতীত নিয়ন্ (Neon) নামক একটি মূলপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। র‍্যাম্‌জে সাহেবের বিস্ময়ের এবং আনন্দের আর সীমা রহিল না। জলের হাইড্রোজেন্ বা নাইট্রোজেন্‌কে যখন গুরুভারবিশিষ্ট নিয়নে পরিণত করা গেল, তখন অদূর ভবিষ্যতে এক দিন ঐ প্রকার উপায়ে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করাও সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার-সমাচার অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে যে আন্দোলন ও বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে, বোধ হয় আধুনিক যুগের কোন আবিষ্কার তদ্রূপ বিস্ময় ও আন্দোলন সৃষ্টি করে নাই। আজকাল বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র ও সভাসমিতিতে এই বিষয়

সার জে. জে. টমসন

লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিতেছে; জগতের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানরথিগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। সকলেই যে, র‍্যাম্‌জে সাহেবের আবিষ্কারের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেছেন তাহা বলা যায় না। বেকেরেল্‌ সাহেব, যিনি সর্ব্বপ্রথমে রেডিয়ম্‌ জাতীয় পদার্থের গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি এখন আর ইহজগতে নাই। ক্যুরি সাহেবেরও মৃত্যু হইয়াছে। মাডাম্‌ ক্যুরি, রদারফোর্ড, টমসন্‌ ও সডি সাহেবই এখন এই আবিষ্কারে মতামত প্রকাশের অধিকারী। রদারফোর্ড সাহেব র‍্যাম্‌জের আবিষ্কার-কাহিনী শুনিয়া বলিয়াছিলেন সম্ভবতঃ পরীক্ষাকালে কোনক্রমে জলের পাত্রে বাতাস প্রবেশ করিয়াছিল; বাতাসের নিয়ন্‌কে র‍্যাম্‌জে সাহেব সদ্য উৎপন্ন নিয়ন্‌ মনে করিয়া ভুল করিতেছেন। মাডাম্‌ ক্যুরিও এই আবিষ্কারে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষার পর র‍্যাম্‌জে সাহেব নানা পদার্থের যে-সকল রূপান্তর প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই সকল বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি এক পরীক্ষায় র‍্যাম্‌জে সাহেব তাম্র, নাইট্রোজেন্‌ ও অক্সিজেন্‌ মিশ্রিত এক যৌগিক পদার্থে (Copper Nitrate) সেই নাইটন্‌ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উক্ত যৌগিক পদার্থটি পরিবর্ত্তিত হইয়া আর্গন (Argon) নামক এক মূলপদার্থ উৎপন্ন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সিলিকন্‌, টিটানিয়ম্‌, থোরিয়ম্‌ প্রভৃতি ঘটিত অনেক যৌগিক পদার্থের উপরেও এই পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং এই শেষোক্ত প্রত্যেক পদার্থের রূপান্তরে অঙ্গারের (Carbon) জন্ম হইয়াছে। বিস্‌মথ্‌ ঘটিত এক পদার্থের (Bismuth Perchloride) রূপান্তরে সেদিন অঙ্গারক বাষ্পের উৎপত্তিও দেখা গিয়াছে।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের এই সকল পরীক্ষার কোনটিই গোপনে করা

হয় নাই। তিনি বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এই সকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, এবং কোন কোনটি ইংলণ্ডের কেমিক্যাল সোসাইটির প্রকাশ্য সভার সম্মুখে করা হইয়াছে। সুতরাং এগুলির সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কারণ নাই। জগতের লোকে এখন বুঝিবেন, প্রকৃতির এই যে বিচিত্র লীলা তাহা নব্বইটি মূলপদার্থ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে না,—সকল পরিবর্ত্তনের গোড়ায় একই বর্ত্তমান। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, তাম্র সকল একেরই বিচিত্র রূপ। আল্‌কেমিষ্টরা লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিবার জন্য যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া করেন নাই। লৌহকে সুবর্ণ করিবার জন্য পরশ-পাথর এই ভূমণ্ডলে এবং এই প্রকৃতির মধ্যেই আছে।

রসায়নীবিদ্যার উন্নতি

গত কয়েক বৎসরে জড়বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই দ্রুত উন্নতিতে পুরাতন সিদ্ধান্তগুলি নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন দেখিলে তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কঠিন হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হেলম্‌হোজ্, হার্জ ও কেল্‌ভিন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া গিয়াছেন, এখনকার নূতন আবিষ্কারে তাহাদেরও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। শারীরবিদ্যা, জীবাণু-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানও উন্নতির পথে দ্রুত ধাবমান হইয়াছে। ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও মানবতত্ত্বের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্রও তাহাদের পুরাতন মূর্ত্তিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই, কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথির জীর্ণ পাতা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকেও নবীন রূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইলেও, যাঁহারা ইহার সুপ্রতিষ্ঠার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন এখনো জীবিত আছেন। বৃদ্ধ ওয়ালেস্ * এখনো অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে পুস্তকাদি লিখিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে অভিব্যক্তিবাদেরও সংস্কারের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে রসায়নী-বিদ্যায় যে সকল উন্নতি ও

---

* সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে, রেডিয়ম্ (Radium) ধাতুর আবিষ্কারের কথা মনে পড়িয়া যায়। এই
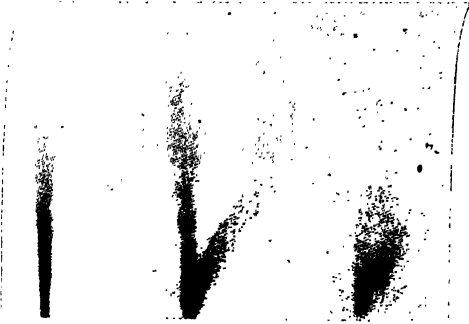
রেডিয়মের তেজোনির্গমন

অদ্ভুত জিনিষটি হইতে অবিরাম কয়েক জাতীয় তেজোরশ্মি ও তাপ নির্গত হয়। এগুলির মধ্যে একটিকে অতিসূক্ষ্ম জড়-কণিকা বা শক্তি-কণিকা বলিয়া স্থির করা হইতেছে। ডাল্‌টন্ তাম্রলৌহাদি ধাতু এবং হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্, গন্ধক প্রভৃতি অধাতুকে যে, মূলপদার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, রেডিয়ম্ ও অপর ধাতু হইতে অতিসূক্ষ্ম অণুর নির্গমন দেখিয়া তাহা স্বীকার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। এই অণুগুলি হাইড্রোজেনের ন্যায় লঘু বস্তুর পরমাণু অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র। প্রায় হাজারটি কণিকা একত্র না হইলে, তাহারা গুরুত্বে বা আকারে এক পরমাণু প্রমাণ হাইড্রোজেনের সমান হয় না।

ডাল্‌টনের নিয়মে পরমাণুকে বিভাগ করা যায় না। রেডিয়ম্ জিনিষটা হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ বা স্বর্ণরৌপ্যের ন্যায় একটা মূলপদার্থ, সুতরাং ইহার পরমাণু অবিভাজ্য হইবারই কথা। কিন্তু অবিভাজ্য পরমাণুগুলিকেই এখন বিভক্ত হইতে দেখিয়া প্রচলিত

রাসায়নিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে। কেবল রেডিয়মের পরমাণুই এই প্রকারে বিভক্ত হয় না, ইউরেনিয়ম্ (Uranium) প্রভৃতি আরো অনেক মূলপদার্থের পরমাণুকে এই প্রকারে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, এবং বিশ্লেষণের ফলে যে অতি সূক্ষ্ম কণিকার উৎপত্তি হইতেছে, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি সকল জিনিষেই এক দেখা যাইতেছে। সকলে ভাবিতেছেন, এই অতি-সূক্ষ্ম কণিকাগুলিই বিশ্বের একমাত্র উপাদান এবং ইহাদেরই সংযোগ-বিয়োগে তাম্রলৌহ, শিলামৃত্তিকা প্রভৃতি নানা যৌগিক-অযৌগিক বস্তু উৎপন্ন হইয়া জগৎকে এত বিচিত্র ও এত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, তাম্রলৌহ বা হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি সেই সত্তরটি মূলপদার্থের কোনটিই প্রকৃত মূল-পদার্থ নয়, সেই রেডিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুর দেহনির্গত সূক্ষ্মকণাই বিশ্বে একমাত্র মূল জিনিষ।

জগতের সমস্ত বস্তুই এক মূলপদার্থ দ্বারা গঠিত, এই মহা-সত্যটির আভাস পাইয়া রসায়নশাস্ত্র কম গৌরবান্বিত হয় নাই। একই মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে, একই পদার্থ বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা দেশবিদেশের দার্শনিকগণ বহু পূর্ব্বে প্রকারান্তরে স্থির করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান আজ সেই পরম সত্যটিকে চাক্ষুষ দেখাইবার উপক্রম করিয়া ধন্য হইয়াছে।

রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ফ্রান্সের ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ক্যুরি সাহেবের পত্নী মাডাম্ ক্যুরিই ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। জনৈক মহিলা দ্বারা এই প্রকার একটা বৃহৎ আবিষ্কারের সূত্রপাত বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক রেডিয়ম্ আবিষ্কারের পর ফরাসী ও ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপর কেহই এই জিনিষটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারেন নাই।

পিচ্-ব্লেণ্ডি Pitch blende) নামক যে আকরিক পদার্থ হইতে রেডিয়ম্ ঘটিত বস্তু সংগ্রহ করা হয়, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, * কাজেই উহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন রেডিয়মের ন্যায় তেজোনির্গমনক্ষম প্রায় চব্বিশটি ধাতুর অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। ইহাতে রসায়নবিদ্‌গণের গবেষণার খুবই সুবিধা হইয়াছে। থোরিয়ম্ (Thorium) নামক ধাতুটি খুব দুর্লভ নয়। আজকাল গ্যাসের শিখার উপরে যে সাদা রঙের আবরণ লাগাইয়া আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে, তাহা সেই থোরিয়ম্-ঘটিত উপাদানে প্রস্তুত। ইহার পরীক্ষায় জর্ম্মান্ পণ্ডিত অধ্যাপক হান্ (Prof. Otto Hahn) আরো কতকগুলি তেজোনির্গমনক্ষম নূতন পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রেডিয়ম্ লইয়া যে-সকল পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহাতে বিশুদ্ধ রেডিয়মের ব্যবহার করা হয় নাই। ইহাকে বিশুদ্ধ আকারে পাইবার উপায়ও জানা ছিল না। কাজেই রেডিয়ম্ ও ব্রোমিনের (Bromine) মিশ্রজাত রেডিয়ম্‌ব্রোমাইড্‌কে নাড়াচাড়া করিয়া তৃপ্ত থাকা ব্যতীত আর উপায় ছিল না। সম্প্রতি মাডাম্ ক্যুরি বিশুদ্ধ রেডিয়ম্ প্রস্তুতের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া গবেষণার এক বৃহৎ অভাব মোচন করিয়াছেন।

বামে আকরিক পিচ-ব্লেণ্ডির ছবি ;
তাহাই তেজোনির্গমন দ্বারা ফোটোগ্রাফের
কাচে যে আলোকচিত্র আঁকিয়াছে
দক্ষিণাংশে তাহারই ছবি

---

* সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আমাদের দেশের গয়া জেলার এক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পিচ-ব্লেণ্ডি আছে। ইহা উত্তোলন করিবার আয়োজন চলিতেছে।

বীক্ষণাগারে মাডাম ক্যুরি

অধিক তাপে ও অধিক ঠাণ্ডায় পদার্থের অবস্থা কি প্রকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা অনেক সময় আবশ্যক হয়। কিন্তু পদার্থকে খুব উষ্ণ বা শীতল করিবার উপায় বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কাজেই অনেক পরীক্ষা দুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছিল। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এখন নানা পদার্থকে অনায়াসে তিন হাজার ডিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতেছে। এক শত ডিগ্রি তাপে জল ফুটিতে আরম্ভ করে, ইহার তিন শত গুণ তাপ যে কত অধিক তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। চাপ দিয়া ও শীতল করিয়া বায়ুকে জলের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত করা যাইতেছে। এই তরল বায়ুর ন্যায় শীতল বস্তু এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। আজ কাল ইহা দ্বারা নানা পদার্থকে শীতল করিয়া অনেক পরীক্ষাদি হইতেছে।

হাইড্রোজেন্ বাষ্পকে যে, কোন কালে তরল করা যাইবে, পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ তাহা কল্পনাই করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি ইহাও সুসাধ্য হইয়াছে। তরল হাইড্রোজেনের তাপ, তরল বায়ু অপেক্ষাও অনেক কম। উষ্ণতার সীমা সেণ্টিগ্রেডের শূন্য ডিগ্রিতে নামিলে জল বরফে পরিণত হয়। তরল-বায়ুর উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা কেবল ষাট্ ডিগ্রি মাত্র কম, কিন্তু তরল হাইড্রোজেনের উষ্ণতাকে এখন বরফের তুলনায় ২৫২ ডিগ্রি কম দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জানেন, বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থের একটা নিস্তাপ অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন। উষ্ণতার মাত্রা বরফের শৈত্যের ২৭৩ ডিগ্রি নীচে নামিলেই সেই নিস্তাপ অবস্থা আসিয়া পড়ে। ইহাতে পদার্থের অণুর কম্পন রহিত হয় এবং সংকীর্ণ পাত্রে আবদ্ধ রাখিলেও এই অবস্থায় বায়বীয় পদার্থ চাপ-ধর্ম্ম ত্যাগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে শীতল করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া,

বৈজ্ঞানিকগণ সেই নিস্তাপ ও নিঃস্পন্দ অবস্থার খুব কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর কোন প্রকারে উষ্ণতাকে কুড়ি ডিগ্রি নীচে নামাইতে পারিলেই জড়ের সেই স্তব্ধ প্রকৃতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবে। প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রয়াল্ ইনষ্টিটিউসনের অধ্যাপক ডিওয়ার (Dewar) তরল হাইড্রোজেন্ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এখনো সেই উপায়েই হাইড্রোজেন্‌কে তরল করা হইতেছে।

বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই এক বারের চেষ্টায় এক দিনে সুসাধিত হয় নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিলে তবে অভীষ্টের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়। যে তরল-বায়ু ও তরল হাইড্রোজেন্ আজকাল নানা পরীক্ষার প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রস্তুত-উপায়ের আবিষ্কারেও বহু ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মণ্ড (Dr. Mond) নামক জনৈক জর্ম্মান্ ধনী ইহার সমগ্র ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। যাহা সত্য, তাহাকে কোন ক্রমেই ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের সম্পত্তি করিয়া রাখা যায় না। ইহা জানিয়াও আধুনিক নানা আবিষ্কারের কর্ত্তৃত্ব লইয়া নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডিওয়ার সাহেবের গবেষণার আনুকূল্যে জর্ম্মানের দান সত্যই আধুনিক যুগের একটা নূতন কথা।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের (Organic Chemistry) বিশেষ কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইত না। সেই পুরাতন কয়েকটি ব্যাপার লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ তৃপ্ত থাকিতেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, জৈব বস্তুকে আমরা বিশ্লেষ করিতে পারি, কিন্তু উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া তাহাকে গঠন করিতে পারি না। এখনো যে, সে বিশ্বাস

সম্পূর্ণ অপনীত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; তথাপি বৈদ্যুতিক চুল্লীর উষ্ণতা ও তরল হাইড্রোজেনের শীতলতাকে ব্যবহারে লাগাইয়া গত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকগণ জৈব পদার্থের সংগঠনে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রবীণ জর্ম্মান্ পণ্ডিতগণ বীক্ষণাগারে দিবারাত্রি পরীক্ষা করিয়া যে সকল রহস্যের সন্ধান পাইতেছেন, সে গুলিকেই কারখানার কাজে প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্যের যে কত উন্নতি করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

যে গভীর বায়ুর আবরণ আমাদের পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ নামক দুইটি স্বচ্ছ বায়বীয় বস্তু তাহার প্রধান উপাদান। সচরাচর আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাতে প্রচুর অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ আছে, কিন্তু এগুলিতে উহারা সংযুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া সেই সকল পদার্থ হইতে অক্সিজেন্ বা নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগানো কঠিন হয়। তা ছাড়া এ প্রকারে যে অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণও অধিক হয় না। কিন্তু এই প্রকারে নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করা ব্যতীত আর উপায় ছিল না। মানুষ নাইট্রোজেনের সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়াও মুক্ত নাইট্রোজেন্‌কে কি প্রকারে কাজে লাগানো যাইতে পারে, তাহা জানিত না। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বায়ুর নাইট্রোজেন্‌কে আজ কাল নানা কার্য্যে প্রয়োগ করা হইতেছে।

নাইট্রোজেন্‌যুক্ত যে-সকল পদার্থ আজ কাল ব্যবসায় বাণিজ্যে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের নাম করিতে গেলে, প্রথমে নাইট্রিক এসিড্ নামক দ্রাবকের কথা মনে পড়িয়া যায়। কলকারখানার কাজে ইহার ন্যায় অত্যাবশ্যক বস্তু আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুর নাইট্রোজেন লইয়া নাইট্রিক্ এসিড্ প্রস্তুত করিবার জন্য দীর্ঘ কাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি

ইঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। বায়ুর নাইট্রোজেনে বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হান্‌পসন্ Dr. William Hanpson) নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুতের এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই নরওয়ের এক বৃহৎ জলপ্রপাতের নিকট এই উপায়ে এসিড্ প্রস্তুতের জন্য এক কারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জলপ্রপাতের শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে এবং তাহারই সাহায্যে নাইট্রিক্ এসিড্ প্রস্তুতের কার্য্য চলিতেছে।

সোরা (Saltpetre) জিনিষটা আমাদের কম প্রয়োজনে লাগে না। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ইহা একটি উৎকৃষ্ট সার। তা ছাড়া বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুতে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। স্বভাবতঃ নানা স্থলে যে সোরা উৎপন্ন হয়, এ পর্য্যন্ত তাহাই সংগ্রহ করিয়া লোকে কাজ চালাইত। কিন্তু নাইট্রোজেন্‌কেই ইহার প্রধান উপাদান দেখিয়া, বায়ুর নাইট্রোজেন্ লইয়া কোন প্রকারে জিনিষটাকে প্রস্তুত করিবার জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছিল। বায়ুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি কৃত্রিম সোরা প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এমোনিয়া জিনিষটাও নাইট্রোজেন্-প্রধান, এবং কারখানায় ইহার ব্যবহারও যথেষ্ট। বায়ুর নাইট্রোজেন্ হইতে ইহারও এক প্রস্তুত-উপায় অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক হাবের (Haber) নামক জনৈক জর্ম্মান্ ইহার উদ্ভাবক। এমোনিয়া প্রস্তুতের নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। অনেকে আশা করিতেছেন, হয় ত অল্প দিনের মধ্যে জিনিষটা খুব সুলভ হইয়া দাঁড়াইবে।

ভূ-গর্ভ হইতে তাম্র লৌহ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুগুলিকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাহারা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। নানা বিজাতীয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া সেগুলি আকারে-প্রকারে এমন

বিকৃত অবস্থায় থাকে যে, সেগুলিকে ধাতু বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হয়। এই সকল অবিশুদ্ধ ধাতুকে শুদ্ধ করিবার জন্য যে-সকল উপায় প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটিই সহজ বা অল্পব্যয়সাধ্য নয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যকে যদি ঠিক স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকারেই খনিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেগুলি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইত না; অনেক স্থলেই জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাতুকে শুদ্ধ করিতে হয়। গত ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় বিদ্যুতের সাহায্যে যে-সকল শুদ্ধিপ্রথার আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা রাসায়ন-শাস্ত্রকে কম উন্নত করে নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিনটি প্রধান ধাতু হইতে আকরিক যৌগিক পদার্থ আজকাল এত সহজে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে যে, তাহার বিবরণ শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। লৌহ জিনিষটা সুলভ হইলেও ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা বড় কঠিন। অথচ বিশুদ্ধ লৌহের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সাধারণ লৌহে তার প্রস্তুত করিতে গেলে, যে শ্রম লাগে, বিশুদ্ধ লৌহ লইয়া কার্য্য করিলে তাহার শতাংশ শ্রমেরও আবশ্যক হয় না। তা' ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে এই প্রকার লৌহের চুম্বক ব্যবহার করিলে অল্প শক্তিতে অনেক কাজ আদায় করা যাইতে পারে। জর্ম্মানির লিপ্‌জিক্ (Leipsic) নগরের কারখানায় যে বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহা দ্বারা আজকাল অনেক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। সাধারণ যন্ত্রের তুলনায় বিশুদ্ধ লৌহনির্ম্মিত কলে প্রায় আড়াই গুণ অধিক কাজ পাওয়া যাইতেছে। ইহা কম লাভের কথা নয়!

এক সূর্য্যের তাপই পৃথিবীর সমগ্র শক্তির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়া রাখে। যে কয়লা পোড়াইয়া আমরা বাষ্পযন্ত্র বা বিদ্যুতের যন্ত্র চালাইতেছি, তাহা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উদ্ভিদ্ আবার অতি প্রাচীন যুগে সেই শক্তি সূর্য্যতাপ হইতে

আহরণ করিয়া দেহে সঞ্চিত রাখিয়াছিল। কাজেই কয়লার শক্তিকে সৌরশক্তিরই রূপান্তর বলিতে হয়। যে জলপ্রপাতকে শৃঙ্খলিত করিয়া আজকাল নানা কাজ করাইয়া লওয়া হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহাদের শক্তিও সৌরশক্তি। পর্ব্বত-চূড়ায় জলের সঞ্চয় সূর্য্যতাপেরই কাজ। জলই সেই সৌরশক্তিকে বক্ষে ধরিয়া রাখে এবং তার পরে নীচে নামিবার সময় তাহার বিকাশ দেখায়। বুদ্ধিমান্ মানুষ এই সুযোগ ছাড়িতে চায় না, নিম্নগামী জলের প্রবাহ দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া অনেক কাজ করাইয়া লয়।

কয়লায় যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, পোড়াইলেই তাহা তাপালোকে পরিণত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষয়ের সময় ষোল আনা শক্তিকেই যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের লাভ হয়, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্রেও কয়লা পোড়াইলে সমগ্র শক্তিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি না; অধিকাংশই বৃথা তাপালোক উৎপন্ন করিয়া এবং পার্শ্বের জলস্থলবায়ুকে অনাবশ্যক গরম করিয়া নিয়তই নষ্ট হয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, এই অপব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ। অর্থাৎ এক শত ভাগ শক্তির মধ্যে কেবল ১৫ ভাগ মাত্র কল চালায়। এই অপচয় বড় অল্প নয়। দীর্ঘকাল এ প্রকার বাজে খরচের প্রশ্রয় দিতে থাকিলে, কয়লার অভাবে কল-কারখানা বন্ধ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এই সকল কারণে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কয়লা পোড়াইয়া, তাহার অধিকাংশ শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গত কয়েক বৎসরের রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইঁহারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে যেন কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণ চুল্লীতে পোড়াইলে কয়লা হইতে যে কতকগুলি অনাবশ্যক বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই শক্তিকে ক্ষয় করায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ

এই সকল বাষ্পকে ছাড়িয়া না দিয়া, তাহাদিগকেও কলে পোড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই প্রকারে কয়লা পোড়াইতে আরম্ভ করিলে, এখন যে পরিমাণ শক্তি কাজে লাগানো যাইতেছে তাহার অন্ততঃ চতুর্গুণ শক্তি আমাদের করায়ত্ত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। তা'ছাড়া কয়লার বাষ্প প্রস্তুত করিতে গেলে, যে আল্‌কাতরা ও এমোনিয়া উৎপন্ন হইবে তাহাও নষ্ট হইবে না।

এই ত গেল অজৈব রসায়নের (Inorganic Chemistry) উন্নতির কথা। জৈব রসায়নের নানাবিভাগে গত কুড়ি বৎসরে বহু উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম শর্করা এবং নানা জাতীয় কৃত্রিম রঙ্গ ও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশগুলি কি প্রকার ধনশালী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের পর হইতে আমাদের দেশ হইতে নীলের চাষ এক প্রকার লোপ পাইয়াই গিয়াছে। সুলভ কৃত্রিম রঙ্গ হাতের গোড়ায় পাইয়া লোকে এখন আর মহার্ঘ লাক্ষারস বা মঞ্জিষ্ঠা রঞ্জনকার্য্যে ব্যবহার করে না। যাহা হউক এই সকল কৃত্রিম জিনিষের প্রস্তুতোপায় কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে জৈব রসায়নশাস্ত্রের অধিকারে আসিয়া পড়িতে হয়।

ধাতুর কয়েকটি গুণ

যেখানে সীমারেখা টানা যায়, সেখানেই যত সন্দেহ, যত বিরোধ একে একে দেখা দিতে থাকে। সীমা-সরহদ্দ লইয়া যে, কেবল রাজায় রাজায় লড়াই বাধে তাহা নহে, বৈজ্ঞানিকগণ যেখানে সীমা-রেখা টানিয়া প্রাণি-জগৎকে উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক্ করেন বা চেতন পদার্থকে অচেতন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, সেখানেও বিরোধ ও সন্দেহ দেখা দেয়। এই বিরোধে গোলাগুলি বর্ষণ বা রক্তপাত হয় না সত্য, কিন্তু তর্ককোলাহলের আর অন্ত থাকে না। নির্জীব জড়-জগৎকে ধাতু ও অধাতু, এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিবার রীতি আছে ; খুব মোটামুটি কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া এই শ্রেণীবিভাগ করা হয় ; কিন্তু যখনই বৈজ্ঞানিকগণ সুস্পষ্ট রেখা টানিয়া ধাতুকে অধাতু হইতে পৃথক্ করিতে গিয়াছেন, তখনই ঘোর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইয়াছে। যেগুলিকে একদল বৈজ্ঞানিক ধাতুর কোটায় ফেলিতে চাহিয়াছেন, অপর একদল বৈজ্ঞানিক সেগুলিকেই অধাতু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই কতকগুলি পদার্থ চূড়ান্ত বিচারের অভাবে কোন বিশেষ শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। সেলেনিয়ম্, টেলুরিয়ম্, আর্সেনিক্ এণ্টিমণি প্রভৃতি পদার্থ এই প্রকারে সমাজচ্যুত হইয়া রহিয়াছে। ধাতু ও অধাতুর সীমান্ত রেখায় ইহাদের বসতি।

সার্ হেন্‌রি রস্কো আধুনিক যুগের একজন খ্যাতনামা রসায়নবিৎ। ধাতুর লক্ষণ জানিবার জন্য তাঁহার গ্রন্থাদির অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পারদ ব্যতীত সকল ধাতুই সাধারণতঃ কঠিনাবস্থায় থাকে,

সুতরাং কাঠিন্য ধাতুর প্রধান লক্ষণ। তা' ছাড়া আলোক রোধ করিয়া *তাহার কিয়দংশ প্রতিফলিত করা, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহন করা, অল্প তাপে দ্রবীভূত না হওয়া, কঠিন আঘাত দিলে ভাঙ্গিয়া না গিয়া* আকারান্তর পরিগ্রহ করা ইত্যাদি আরও অনেক লক্ষণের উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই সকল লক্ষণ কেবল ধাতুরই বিশেষত্ব নয়; যেগুলি প্রত্যক্ষ অধাতু, সেগুলিতেও এই সকল লক্ষণ একাধিক পরিমাণে দেখা গিয়া থাকে। কাজেই কোন্ কোন্ বিশেষ ধর্ম্ম দেখিলে পদার্থকে ধাতু বলা যাইবে, তাহা নূতন করিয়া নির্ণয় করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

ইলেক্ট্রন্ বা অতি-পরমাণু নামক যে এক অতি সূক্ষ্ম জড়কণার উপরে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টিকে দাঁড় করাইতে চাহিতেছেন, তাহারই সাহায্যে ধাতুতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক রহস্যের প্রকাশ হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। ইহাতে ধাতুর প্রকৃত লক্ষণ কি এবং সেই লক্ষণগুলি কি প্রকারে প্রকাশ লাভ করে, তাহা নূতন করিয়া একে একে জানা যাইতেছে। ধাতু আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান উপাদান; কল-কারখানা, ঘরবাড়ী এবং গৃহসজ্জার নানা উপকরণ প্রধানতঃ ধাতু দ্বারাই নির্ম্মিত; কাজেই ধাতুর প্রকৃতি জানিয়া তাহাকে যথোপযুক্তভাবে আমাদের সংসারের কার্য্যে লাগাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই চেষ্টা যে কোন শুভ ফল প্রদান করে নাই, ইহা বলা যায় না। গণিতবিশারদগণ ধাতুর আণবিক অবস্থা ও অণুর গতিবিধি-সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দিয়াছেন। রশ্মিনির্ব্বাচন-যন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ জ্বলন্ত ধাতুর রশ্মিজালের অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। দুই বা ততোধিক ধাতু মিশাইয়া যে সঙ্কর ধাতুব (Alloy) উৎপত্তি হয়, তাহার ভিতরকার অণুগুলির বিন্যাস নানা পণ্ডিতের চেষ্টায় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তরল বায়ুর (Liquid

Air) ন্যায় শীতল পদার্থে এবং বৈদ্যুতিক চুল্লীর ন্যায় গরম স্থানে ধাতু সকল কিপ্রকার অবস্থায় থাকে, দক্ষ রসায়নবিদ্‌গণ নানা পরীক্ষায় তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। এই সকল আবিষ্কারে আমাদের যে প্রচুর জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু এই জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের কাজের দিক্‌টা যে উন্নত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। ধাতুর ধাতুত্ব কোথায় তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া না দেখাইলে, ধাতুর ব্যবহারের দিক্‌টা কখনই উন্নতি লাভ করিবে না। আজকাল অনেকে নানা ধাতু বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া কখন কখন ইচ্ছানুরূপ বহুগুণসম্পন্ন সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত করিতেছেন বটে, কিন্তু এই মিশ্রণব্যাপারের কোনও বাঁধা নিয়ম ধরা পড়িতেছে না, কাজেই সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা যাইতেছে না। যে মূল ব্যাপার ধাতুকে তাপ ও বিদ্যুতের পরিচালক করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাতসহ ও কোমল করে, তাহার আবিষ্কার না হইলে, কখনই ধাতুকে আমাদের সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করা যাইবে না।

বিদ্যুৎ-পরিচালন-শক্তি ধাতুমাত্রেরই একটা প্রধান ধর্ম্ম। কাঠ ও পাথরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ সহজে চলাফেরা করিতে পারে না, কিন্তু ধাতুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারে। এই কারণে টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্ বা অপর কলে বিদ্যুৎ লইয়া যাইবার জন্য ধাতুর তারের ব্যবহার হয়। কার্পাস-সূত্র বা দড়াদড়ির ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। ধাতুর এই বিদ্যুৎ-পরিবাহন শক্তির উপরেই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রথম নজর পড়িয়াছিল। ধাতুর অণু-পরমাণু কোন্ বিশেষ গুণে বিদ্যুৎ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, ইহাই তাঁহারা প্রথমে খোঁজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড়ই

অদ্ভুত। ডাল্‌টন্‌ সাহেবের আণবিক সিদ্ধান্ত প্রচার হইবার পর হইতে আমরা জানি, পদার্থমাত্রই অতি সূক্ষ্ম অণু দিয়া গঠিত এবং এই অণুগুলি আবার দুই বা ততোধিক আরও সূক্ষ্মতর পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। অণুপরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে যে, ডাল্‌টনের সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার আর কারণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এত জানা সত্ত্বেও পদার্থে অণুপরমাণু কি প্রকারে বিন্যস্ত থাকে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দিগের গবেষণায় ধাতুর ভিতরকার এই আণবিক অবস্থার অনেক কথা জানা গিয়াছে। ইঁহারা বলিতেছেন, যে ধাতুপিণ্ডটিকে আমরা স্থূল দৃষ্টিতে নিরেট্‌ দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত নিরেট্‌ নয়; ধাতুর ভিতরে পরমাণুগুলি সুবিন্যস্ত থাকিয়া মৌচাকের মত এক সচ্ছিদ্র পিণ্ডের রচনা করে। পরমাণুর এই প্রকার সুবিন্যাসের সহিত বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলেন; গাঢ় চিনির রস জমিয়া যখন দানাদার চিনি বা মিছরি উৎপন্ন করে, তখন ঐ প্রকার আণবিক সুবিন্যাস দেখা যায়। কিন্তু গুরু ধাতুপিণ্ডের ভিতরেও যে, অণুপরমাণু সুসজ্জিত হইয়া দানার উৎপত্তি করে, এবং মধুচক্রের ন্যায় ধাতুপিণ্ডমাত্রই যে সচ্ছিদ্র এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নূতন। কেবল ইহাই নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ আরও বলিতেছেন, ধাতুর ভিতরকার সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি ইলেক্‌ট্রন্‌ অর্থাৎ অতিপরমাণুতে পূর্ণ। বায়ব বস্তুর অণু যেমন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে এবং পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া অবিরাম ছুটাছুটি করিতে থাকে, ধাতুর ছিদ্রস্থ ইলেক্‌ট্রন্‌গুলিও সেই প্রকার চঞ্চল হইয়া চলাফেরা করে। আজ প্রায় বারো বৎসর ধরিয়া নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্‌ট্রন্‌ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। রেডিয়ম্‌ ধাতু হইতে নির্গত ইলেক্‌ট্রনে বা ক্রুক্‌স্‌ সাহেবের নলের ভিতরকার ইলেক্‌ট্রনে ইঁহারা সকল অবস্থাতেই ঋণাত্মক বিদ্যুতের সন্ধান পাইয়াছেন, ইলেক্‌ট্রন্‌ মাত্রেই যে, ঋণাত্মক

বিদ্যুতের (Negative Electricity) বাহক, তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়া গিয়াছে। কাজেই ধাতুর ভিতরকার ছিদ্রে যে ইলেক্ট্রন্ আবদ্ধ থাকিয়া চলাফেরা করে, তাহাতে প্রচুর ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ইলেক্ট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ এবং অণুতে সঞ্চিত ধনাত্মক বিদ্যুৎ (Positive Electricity), পরস্পর টানাটানি করিয়া এমন সাম্যাবস্থায় থাকে যে, আমরা বাহির হইতে ধাতুতে ধন বা ঋণ, কোন বিদ্যুতেরই লক্ষণ দেখিতে পাই না।

ধাতুমাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে যে বিদ্যুৎ-পরিবাহন-শক্তি দেখা যায়, ধাতুর মধ্যে আবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত ইলেক্ট্রনের সাহায্যে আজকাল তাহার ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, এক-খণ্ড ধাতুকে বৈদ্যুতিক শক্তির সীমার মধ্যে আনিলে, তাহার ছিদ্র-মধ্যবর্ত্তী ইলেক্ট্রনগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির দিকে ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ধাতুর মধ্যে যে একটা ইলেক্ট্রনের প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের নিকট বিদ্যুতের প্রবাহরূপে ধরা দেয়।

সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ বায়ব পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে, পদার্থটা স্ফীত হইতে চায় এবং পাত্রের গায়ে জোরে চাপ দিতে থাকে। এই ব্যাপারটির কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা হইয়াছে যে, তাপ পাইলেই বায়ব পদার্থের অণুগুলির চঞ্চলতা বাড়িয়া যায়; এই অবস্থায় ইহারা দ্রুতবেগে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া জোরে পাত্রের গায়ে আসিয়া পড়ে, কাজেই চাপের মাত্রা তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলে। তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতুর বিদ্যুৎ-পরিবাহন-শক্তি কমিয়া আসে; এই সুপরিচিত ব্যাপারটির ব্যাখ্যান দিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাপবৃদ্ধির সহিত ধাতুমধ্যস্থ ইলেক্ট্রনের গতিবৃদ্ধির কথা প্রচার করিতেছেন। ইলেক্ট্রনগুলি গুরুত্বে ও আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের তিন হাজার ছয় শতটি একত্র না হইলে একটি হাইড্রোজেনের অণুর সহিত সমান

হয় না। গুরুত্বের এই পরিমাণ লইয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় হাইড্রোজেনের অণুগুলি যে বেগে পরিভ্রমণ করে, ধাতুর ভিতরে ইলেক্ট্রনগুলি সেই অবস্থায় প্রায় তাহার ষাট গুণ বেগে চলাফেরা আরম্ভ করে। এই হিসাবে বরফের ন্যায় শীতল অবস্থাতেও প্রত্যেক ইলেক্ট্রনকে প্রতি সেকেণ্ডে শতাধিক মাইল বেগে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলি যত জোরে ছোঁড়া যায়, বাহিরের ভূমধ্যাকর্ষণ বা অপর কোন বাধাবিঘ্ন ভেদ করিয়া তাহা ততই বেগে ধাবমান হয়। তাপ প্রয়োগে ধাতুগর্ভে আবদ্ধ ইলেক্ট্রনগুলি যখন গোলাগুলির ন্যায় প্রবলতর বেগে ছুটাছুটি আরম্ভ করে, তখন বাহিরের নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি তাহাদিগকে নিজের দিকে টানিয়া প্রবাহের উৎপত্তি করিবার সুযোগ পায় না; কাজেই এই অবস্থায় বিদ্যুৎশক্তির টান্ অপেক্ষা তাপের চঞ্চলতাই প্রাধান্য লাভ করে; সুতরাং অধিক বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইতে পারে না।

কেবল বিদ্যুতের পরিবাহনেই ইলেক্ট্রনের কার্য্য ধরা পড়ে নাই;—ধাতুর তাপ পরিচালন ব্যাপারটাও এখন ইলেক্ট্রনের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, দীর্ঘ ধাতুদণ্ডের এক প্রান্তে তাপ দিলে যখন তাহার দূরবর্ত্তী প্রান্ত পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া দাঁড়ায়, তখন বুঝিতে হয়, তাপপ্রাপ্ত অংশের ইলেক্ট্রনই উত্তাপ বহন করিয়া ধাতুর সর্ব্বাঙ্গে তাপ সঞ্চারিত করে। এই ব্যাখ্যানেও তাপসংযোগে অতি সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রনগুলির যে বেগ বৃদ্ধি হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, তাপ পাইলে ধাতুর ছিদ্রস্থিত সেই ইলেক্ট্রনগুলির চঞ্চলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কাজেই এই অবস্থায় সেগুলি তাহাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুর সর্ব্বাঙ্গের তাপ বহন করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে।

দুইটি পৃথক ধাতুকে জুড়িয়া, তাহাদের সংযোগস্থানে তাপ দিতে থাকিলে, আপনা হইতেই এই সংযুক্ত ধাতুতে বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই বিদ্যুৎকে Thermo-Electricity অর্থাৎ তাপজ বিদ্যুৎ বলা হইয়া থাকে। বিদ্যুতের নাম যাহাই হউক, কি প্রকারে কেবল তাপ দ্বারা বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, এ পর্য্যন্ত তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যান আমাদের জানা ছিল না। আধুনিক ইলেক্ট্রন্ সিদ্ধান্ত দ্বারা এই ব্যাপারটারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ধাতুর ছিদ্রে যে-সকল ইলেক্ট্রন্ থাকে, সকল ধাতুতে তাহাদের সংখ্যা সমান দেখা যায় না। সীসক (Lead) এবং বিস্‌মথ্ উভয়ই ধাতু পদার্থ, কিন্তু তাহাদের ভিতরকার ইলেক্ট্রনের সংখ্যা হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, বিস্‌মথের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে যে পরিমাণ ইলেক্ট্রন্ আছে, সীসাতে ঠিক তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ধাতুমধ্যস্থ ইলেক্ট্রনের সংখ্যার এই অসমতাকেই তাপজ বিদ্যুতের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

মনে করা যাউক, যেন একটি বিস্‌মথের দণ্ড এবং আর একটি সীসকের দণ্ড জোড়া দিয়া তাহাদের সন্ধিস্থলে তাপ দেওয়া যাইতেছে। এই ব্যবস্থায় বিস্‌মথ্ হইতে সীসকের দিকে এক সুস্পষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে দেখা যাইবে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ব্যাখ্যানে বলিতেছেন, সীসাতে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বিস্‌মথের তুলনায় অনেক অধিক থাকে, কাজেই তাপসংযোগে সেগুলি অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া এবং উত্তপ্ত সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া বিস্‌মথের দিকে ধাবমান হয়। ইহাতে সীসক হইতে বিস্‌মথের দিকে ঋণাত্মক তাড়িতপূর্ণ ইলেক্ট্রনের প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে; আমরা বাহির হইতে এই ঋণাত্মক প্রবাহকেই বিস্‌মথ্ হইতে সীসার দিকে চালিত বিপরীতমুখী ধনাত্মক তড়িতের প্রবাহরূপে দেখিতে পাই।

দুইটি পৃথক্ ধাতুকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জুড়িয়া তাহাদের সন্ধিস্থলের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে থাকিলে কখনও সন্ধিস্থল গরম এবং কখনও শীতল হইয়া পড়ে। মনে করা যাউক, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বিস্‌মথ্ হইতে সীসার দিকে যেন প্রবাহ চালানো যাইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, সন্ধিস্থল গরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রবাহটিকে বিস্‌মথ্ হইতে সীসকের দিকে না চালাইয়া, যদি তাহাকে গুরুভারবিশিষ্ট সীসক হইতে বিস্‌মথের দিকে চালানো যায়, তবে উহারই ঠিক্ বিপরীত ফল দেখা যাইবে ;—এই অবস্থায় সন্ধিস্থল অপর অংশের তুলনায় স্পষ্ট শীতল হইয়া পড়িবে। বিদ্যুৎপ্রবাহে যুগ্ম ধাতুর এই প্রকার কার্য্যের কথা বহু দিন হইতে আমাদের জানা আছে ; বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে Peltier Effect নাম দিয়াই এ পর্য্যন্ত তৃপ্ত ছিলেন। ব্যাপারটির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে-সকল ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিকেই সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় নাই। যাহা হউক, ইলেক্ট্রনের সাহায্যে ধাতুপদার্থের এই বিশেষত্বটিরও এক ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, আমরা যখন সীসক এবং বিস্‌মথের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্‌মথের ইলেক্ট্রন্‌গুলিকে জোর করিয়া যেন সীসকের ইলেক্ট্রনের সহিত মিশাইতে থাকি। কাজেই ফুটবলের থলির ভিতরে জোরে বাতাস পম্প্ করিলে যেমন বল্ গরম হইয়া উঠে, এখানেও জোরে বিস্‌মথের ইলেক্ট্রন্ সীসাতে প্রবেশ করায় সন্ধিস্থল গরম হইয়া উঠে। এখন মনে করা যাউক যেন প্রবাহটিকে সীসক হইতে বিস্‌মথের দিকে চালানো যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীসক জিনিষটা বিস্‌মথ্ অপেক্ষা গুরু, কাজেই ইহাতে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বিস্‌মথের তুলনায় অনেক অধিক থাকে। সুতরাং সীসক হইতে

বিস্মথের দিকে বিদ্যুৎ পরিচালনা করায় সীসকেরই ইলেক্ট্রন্‌ভাণ্ডার ক্রমে শূন্য হইতে থাকে এবং পূর্ব্বে যে স্থানে বহু ইলেক্ট্রন্ জড় হইয়াছিল, তাহা এখন শূন্য স্থান পাইয়া ফাঁপিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করে। আবদ্ধ স্থানের বায়ব বস্তুকে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিবার অবকাশ দিলে, জিনিষটার তাপ আপনা হইতেই কমিয়া আসে। কাজেই সীসকের ইলেক্ট্রন্‌গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রসারিত হওয়ায় এখানেও তাপের মাত্রা কমিয়া যায়।

পদার্থের অণুপরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বস্তু হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ নানা কৌশলে তাহাদের আয়তন এবং গুরুত্বাদি নির্ণয় করিয়াছেন। ইলেক্ট্রন-সিদ্ধান্তের সাহায্যে ধাতুর অণুপরমাণুর আয়তনাদি সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় স্থাপনের সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে তাপজাত বিদ্যুতের (Thermo-Electricity) উৎপত্তিপ্রসঙ্গে যে ইলেক্ট্রনের প্রবাহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে প্রত্যেক পরমাণুতে কতকগুলি করিয়া মুক্ত ইলেক্ট্রন্ আছে তাহা হিসাব করিয়া নির্ণয় করা হইতেছে। এবং তার পর বিদ্যুৎ পরিবাহনের (Electric Conduction) নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে সমবেত ইলেক্ট্রনের সংখ্যা জানিয়া লইয়া ধাতুর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কতগুলি পরমাণু রহিয়াছে নির্ণয় করিতে পারিলে প্রত্যেক পরমাণুর আয়তন নির্ণয় করা কঠিন হয় না। কাজেই প্রত্যেক ঘন ইঞ্চ্ স্থানে কতগুলি পরমাণু আছে জানিয়া লইয়া প্রত্যেক পরমাণুর আয়তনও স্থির করা হইতেছে।

কাচ, জল, বায়ু প্রভৃতি অল্লাধিক পরিমাণে স্বচ্ছ, কিন্তু কোন ধাতুই স্বচ্ছ নয়। ইলেক্ট্রন-সিদ্ধান্ত দ্বারা ধাতুর এই বিশেষ ধর্ম্মটিরও ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। ধাতুর রন্ধ্রস্থ মুক্ত ইলেক্ট্রন্‌ই ধাতুকে অস্বচ্ছ করে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ধাতুর উপরে আলোকপাত হইলেই ইলেক্ট্রন্‌গুলি আলোকতরঙ্গ শোষণ করিয়া লয়।

যখন ধাতুকে পিটিয়া খুব সূক্ষ্ম পাতে পরিণত করা যায়, তখনই কেবল এক-একটু আলোক ধাতু ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে। স্বর্ণের সূক্ষ্ম পাতের ভিতর দিয়া যে আলোক বাহিরে আসে তাহা সবুজ, নূতন সিদ্ধান্তীরা বলিতেছেন, এস্‌রাজ্‌ বা সেতারের তার বিশেষ বিশেষ সুরে বাঁধিয়া রাখিলে তাহারা নাড়া পাইলে যেমন সেই সকল বাঁধা সুর ব্যতীত অপর সুর ধ্বনিত করিতে পারে না, সেইপ্রকার বিশেষ বিশেষ ধাতুর রন্ধ্রে আবদ্ধ ইলেক্‌ট্রনগুলি এক একটি বিশেষ আলোকতরঙ্গ ব্যতীত অপর তরঙ্গে সাড়া দিতে পারে না। স্বর্ণের রন্ধ্রগত ইলেক্‌ট্রন্‌ কেবল সবুজ রঙের উৎপাদক তরঙ্গেই সাড়া দেয়; কাজেই সোণার পাতের ভিতর দিয়া যে আলোক আসে, তাহা সবুজ। নানা জ্বলন্ত ধাতুর বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) কেন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বর্ণরেখার প্রকাশ হয়, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বটি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহার মীমাংসা করিতেছেন। তা'ছাড়া আলোকরশ্মির সমতলীভবন (Polarisation of Light) ইত্যাদি অনেক জটিল প্রাকৃতিক ব্যাপারের কারণ ইলেক্‌ট্রন্‌-সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এই জটিল বিষয়-গুলির ব্যাখ্যানও এত জটিল যে, সেগুলির উল্লেখমাত্র করিয়া এখানেই আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল।

বর্ণচ্ছত্র

শুভ্রালোকবিশ্লেষণজাত বর্ণবৈচিত্র্য আমরা জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। রামধনুর অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাসে ও পত্রপ্রান্তসংলগ্ন শিশির-বিন্দুতে বালসৌরকিরণের অদ্ভুত বর্ণচ্ছটা সকলই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ত গেল স্বভাবের কথা,—কৃত্রিম উপায়েও আমরা সহজে আলোক-বিশ্লেষণ দেখিতে পারি। ত্রিকোণ কাচফলকের মধ্য দিয়া, সাধারণ শুভ্রালোক আসিতে দিলে, ইহা মৌলিক বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া উজ্জ্বল লোহিত পীতাদি বর্ণযুক্ত একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করে,—বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকেই Spectrum, বর্ণচ্ছত্র বলিয়া থাকেন। ঝাড় দেওয়ালগিরি-লম্বিত বহুকোণযুক্ত কাচফলকগুলি দ্বারা কোন পদার্থ দেখিলে, এই জন্যই ইহা নানা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। ত্রিকোণ কাচফলকের এই বর্ণবিশ্লেষণী শক্তির কথা বালকবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন। বাল্যকালে উৎসবের সময় দেয়ালগিরিচ্যুত দুই একখানি কাচ সংগ্রহ ইচ্ছায়, তৈলগন্ধামোদিত ক্ষুদ্র ফরাস-গৃহে ভৃত্যগণের সহিত কিছু অধিক বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় নানা মিষ্টান্ন ঘুষ দিয়া পরে একখানি ভগ্ন কাচ লাভের কথা আজও স্মরণ আছে। এই কাচ দ্বারা অপূর্ব্ব বর্ণময় একটা নূতন সংসার দেখিয়া, বোধ হয় তখনকার জন্য অকৃতজ্ঞ ভৃত্যের উৎকোচলিপ্সা ও উৎসবের সকল আমোদের কথা একবারে ভুলিয়াছিলাম। প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের কম আদর নয়। বালক ইহা দ্বারা পার্থিব পদার্থের বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ দেখিয়া আহ্লাদিত হয়,—বৈজ্ঞানিক কোটি যোজনস্থিত

ক্ষুদ্র নক্ষত্রের গঠনোপাদান ও গতিবৈচিত্র্য নির্দ্ধারণ করিয়া ও অতীন্দ্রিয় নক্ষত্রমালার নিখুঁৎ ছবি তুলিয়া দৃষ্টির অনন্ত প্রসারতায় বিমুগ্ধ হন। অল্পায়াসেই ত্রিকোণ কাচ সংগ্রহ করিয়া যথেষ্ট আলোক বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়, এজন্য অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ন্যায়, বর্ণচ্ছত্র দেখিবার জন্য জটিল যন্ত্র নির্ম্মাণের কোনই আবশ্যক হয় না। কেবল এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের সাহায্যে আজকাল যে-সকল অভাবনীয় আবিষ্কার হইতেছে, তাহার হিসাবে, আধুনিক বিজ্ঞানে এই সামান্য যন্ত্রটি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবলমাত্র আলোক-বিজ্ঞানে নয়, বর্ণচ্ছত্র দ্বারা বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই নানা অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। আধুনিক রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ বর্ণচ্ছত্রের পরীক্ষা দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যে এই উপায়ে কয়েকটি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পদার্থ-বিশ্লেষণের পরিজ্ঞাত উপায়গুলির মধ্যে, বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার প্রথাই (Spectrum Analysis), অতি সূক্ষ্ম ও সরল উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জড়বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রত্যেক শাখাপ্রশাখার পূর্ণতার জন্য অনেক পণ্ডিতের বহুকালব্যাপী অনুসন্ধান ও গবেষণার আবশ্যক হইয়াছে। একজনের আজীবন পরিশ্রম দ্বারা কোন বিজ্ঞানই উন্নতির উর্দ্ধ সোপানে পৌঁছে নাই। আলোক-বিজ্ঞান ও বর্ণচ্ছত্রের ইতিহাসে এ নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য্যের অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে আলোক-বিজ্ঞানের আজ এই উন্নতি হইয়াছে,—তবে তাড়িৎ-বিজ্ঞানাদির পরিণতি হইতে যেমন অধিক সময় লাগিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে বর্ণচ্ছত্রের উন্নতির জন্য তত সময়ের আবশ্যক হয় নাই। আলোক-বিশ্লেষণ দ্বারা জটিল যৌগিক পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন রসায়নবিৎ পণ্ডিত কল্পনাই করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ কেবল বর্ণচ্ছত্রের সাহায্যে পার্থিব পদার্থ ত দূরের কথা, সূর্য্য ও বহুদূরস্থিত নক্ষত্রাদির গঠন উপাদান এবং চিররহস্যময় ছায়াপথের প্রকৃত তথ্য স্থিরীকৃত হইতেছে।

বর্ণচ্ছত্রের আদিম ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, সার আইসাক্ নিউটনের কথা প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণ শুভ্রালোক যে, রামধনুস্থ কয়টি মূল বর্ণের সমষ্টি, তাহা নিউটনই খৃষ্টীয় ১৬৭৫ অব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। একটি অন্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা সূর্য্য-কিরণ প্রবিষ্ট করাইয়া পরে পূর্ব্ব-বর্ণিত ত্রিকোণ কাচ-সাহায্যে আলোক বিশ্লিষ্ট করিয়া, লোহিত পীত বেগুনিয়া ইত্যাদি কয়েকটি বর্ণচ্ছত্র অর্থাৎ বর্ণশ্রেণী ইনিই সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানের আয়ত্তীভূত করিয়াছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণচ্ছত্র প্রাপ্তির কৌশল এবং রশ্মি সকলের বাঁকিবার পরিমাণ, সে সময় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, এজন্য নিউটনের পাতিত বর্ণচ্ছত্রে সমগ্র মৌলিক বর্ণ দেখা যায় নাই। ইহা দ্বারা কেবল দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন ও মিশ্র বর্ণচ্ছত্র রচিত হইয়াছিল মাত্র। যাহা হউক, শুভ্রালোক যে,

নিউটন

কয়েকটি মৌলিক বর্ণের সমষ্টি তাহা নিউটনই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন, এবং বর্ণচ্ছত্রের বর্ণগুলি একখানি স্থূলমধ্য কাচের (Double convex lens) সাহায্যে একত্র করিয়া পুনরায় শ্বেতালোক উৎপাদন দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু নিউটন অবলম্বিত উপায়ে অবিমিশ্র বর্ণচ্ছত্র রচনা অসম্ভব বলিয়া, সৌর বর্ণচ্ছত্রের প্রধান লক্ষণ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরেখাগুলি সে সময় আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা আজ কাল যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে আলোক কি প্রকারে বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা মোটামুটি জানা আবশ্যক। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, শুভ্রালোকের উপাদান মূল বর্ণগুলির প্রকৃতি সমান নয়। প্রত্যেক বর্ণ, বিশ্বব্যাপী ঈথর নামক পদার্থের কম্পনজাত এক একটি নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বর্ণচ্ছত্রের লোহিতাংশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং লোহিত হইতে বর্ণানুক্রমে কমিতে কমিতে ভায়লেট্ অংশে ইহা অত্যন্ত অল্প হইতে দেখা যায়; গণনা করিলে লোহিতের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ভায়লেট তরঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। যদিও মৌলিক বর্ণগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ মধ্যে ইহাদের গতি একই থাকে না, এজন্য তরঙ্গের দৈর্ঘ্যহিসাবে ঈথরকণার কম্পন-পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় এবং দীর্ঘ তরঙ্গযুক্ত বর্ণের কম্পন-সংখ্যা ক্ষুদ্র তরঙ্গযুক্ত বর্ণের কম্পন-পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। এই কারণে লোহিতাদি বর্ণ অপেক্ষা ভায়লেট্ দ্বারাই ঈথরকণা সকল অতি দ্রুত কম্পিত হয়। বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন, আলোক-রশ্মি কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ দিয়া গমনকালে, সকল সময়েই সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। একটি অন্ধকার গৃহের জানালার ছিদ্র দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করাইয়া, বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা দ্বারা রশ্মিপথ সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে

পারে। কিন্তু উক্ত নির্দ্দিষ্ট পদার্থ ত্যাগ করিয়া, গাঢ় বা তরলতর আর একটি নূতন পদার্থে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে রশ্মিসকল পূর্ব্ব-অবলম্বিত সরল পথানুক্রমে চলিতে পারে না, এই দুই পদার্থের সন্ধিস্থলে আসিয়া ইহাদের পথপরিবর্ত্তন হয় এবং পদার্থের গাঢ়তা হিসাবে বাঁকিয়া নূতন পথানুক্রমে চলিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আলোকপথ বাঁকিবার আরো কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সকল গুলির বিবরণ অনাবশ্যক।

আলোকপথ-পরিবর্ত্তনের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই, একই রশ্মি অবস্থাভেদে নানা পথে চলিতে পারে। আলোকবাহক (Medium) পদার্থগুলি সমান থাকিলে, রশ্মি সকল কোন পদার্থ হইতে গাঢ়তর পদার্থে বক্রভাবে প্রবেশ করিয়া যে নূতন পথ অনুসরণ করে, পরীক্ষা করিলে তাহাকে আলোকবাহক পদার্থদ্বয়ের সন্ধিতলস্থ লম্বের সহিত প্রায় এক সরল রেখায় দেখা যায়, কিন্তু গাঢ় পদার্থ হইতে তরলতর পদার্থে প্রবেশ করিলে ইহার ঠিক বিপরীত ফল লক্ষিত হয়,—এস্থলে নূতন আলোকপথ উক্ত লম্ব হইতে দূরে গিয়া সন্ধিভূমির সহিত এক সমতলস্থ হইবার চেষ্টা করে। সকল আলোক-পথ পরিবর্ত্তনই এই দুইটি স্থূল নিয়ম দ্বারা সাধিত হয়। যদি কোন দুইটি স্বচ্ছ পদার্থের সন্ধিভূমিদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিলে দেখা যায় আলোক-পথ ভূমিদ্বয়ে দুইবার বাঁকিয়া, ইহার পূর্ব্ব পথের সহিত ঠিক্ সমান্তরাল হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ত্রিকোণ কাচফলকের মধ্যে সমান্তরাল ভূমি নাই, এজন্য আলোক-পথ ভূমিদ্বয়ে দুইবার বাঁকিয়া গিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতেই চেষ্টা করে, সমান্তরাল হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। ত্রিকোণ কাচফলকের গঠনে এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া ইহা দ্বারা আলোক বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। নিউটনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ রশ্মিপথের এই জটিল পরিবর্ত্তনের

নানা কারণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, আধুনিক পণ্ডিত-সমাজে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং গাঢ় পদার্থ অপেক্ষা তরল স্বচ্ছ পদার্থে আলোকের গতি দ্রুত হওয়াই রশ্মিপথ বাঁকিবার একমাত্র কারণ বলিয়া আজ কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আলোক-পথের পরিবর্ত্তনে আরো দুই একটি ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। রশ্মিপুঞ্জ পদার্থদ্বয়ের সন্ধিতল ঠিক লম্বভাবে ভেদ করিয়া পদার্থান্তরে প্রবিষ্ট হইলে ইহার পথের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না, যে সকল রশ্মি তির্য্যগ্‌ভাবে প্রবিষ্ট হয় তাহাদেরই কেবল পথ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পদার্থান্তরে প্রবেশ দ্বারা আলোকের গতি পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া আলোক-পথেরও পরিবর্ত্তন হয়। আলোকরশ্মিমাত্রেই এই নিয়মের অধীন, কিন্তু পদার্থান্তরে প্রবেশকালে লম্ব রশ্মিপুঞ্জস্থ প্রত্যেক রশ্মির গতি এককালে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া আলোক-পথের পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিন্তু রশ্মিসকল তির্য্যগ্‌ভাবে প্রবেশ করিলে আলোকতরঙ্গের সকল অংশ এক কালে ভিন্ন পদার্থে প্রবেশ করে না। তরঙ্গের যে অংশ প্রথম সন্ধিতল স্পৃষ্ট হয়, তাহাই কেবল পৃথক্ গতিতে চলিতে থাকে এবং কিছুকালের জন্য তরঙ্গের অবশিষ্টাংশের গতি পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। এই প্রকারে একই আলোকতরঙ্গের বিভিন্নাংশ যুগপৎ ধীর ও দ্রুত গতিতে চলে বলিয়া, সমগ্র তরঙ্গ ঐ পদার্থ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ব্বের গতিবৈচিত্র্য হেতু আলোকতরঙ্গ ভিন্নপথাবলম্বী হয়, এবং ইহারই ফলে পথ-পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

আলোক-পথপরিবর্ত্তন বুঝিবার জন্য, প্রায় সকল বিজ্ঞানগ্রন্থেই একটি সুন্দর উদাহরণ দেখা যায়। এটি বুঝিলে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইতে পারে। ইহাতে রশ্মিসকল একদল চলিষ্ণু সৈন্যের

সহিত এবং সৈন্যশ্রেণীকে আলোকতরঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। সৈন্যদল সরল পথানুক্রমে এক গতিতে ও সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া যেমন সম্মুখবর্ত্তী জলাশয় পদব্রজে পার হয় এবং প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণী জলপ্রবিষ্ট হইবামাত্র জলের বাধা অতিক্রমণার্থে যেমন ইহার গতি হ্রাস করে, আলোকরশ্মির গাঢ়তর পদার্থে প্রবেশকালে কতকটা এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। সৈন্যদল সরল পথানুক্রমে আসিয়া লম্বভাবে জলপ্রবিষ্ট হইলে, প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণী একই সময়ে জল-প্রবিষ্ট হয় এবং ইহার গতি এককালে সমভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। কাজেই ইহা দ্বারা সৈন্যদলের গমনপথের কোনই পরিবর্ত্তন দেখা যায় না এবং শ্রেণী ভঙ্গও হয় না। কিন্তু ইহারা তির্য্যগ্‌ভাবে আসিয়া জলাশয় পার হইতে আরম্ভ করিলে, একই শ্রেণীর কতক সৈন্যকে ধীরপদে জল পার হইতে এবং ইহার অপরাংশকে দ্রুতপদে স্থলভাগ অতিক্রম করিতে দেখা যায়। এই প্রকারে একই শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ এক সময়ে পৃথক গতিতে অগ্রসর হওয়ায় পূর্ব্বপথের বৈলক্ষণ্য হয়। একটু ভাবিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, আলোকপথ-পরিবর্ত্তনও অবিকল এই প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে।

এই ত গেল আলোকপথ-পরিবর্ত্তনের স্থূল ও সাধারণ নিয়ম; কোন এক নির্দ্দিষ্ট মৌলিক বর্ণ-রশ্মি অর্থাৎ বর্ণচ্ছত্রস্থ লোহিত পীতাদির মধ্যে কোন একটি বর্ণ বাছিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলে ঠিক পূর্ব্ববর্ণিত ফল দেখা যাইবে। কিন্তু বর্ণচ্ছত্রস্থ প্রত্যেক বর্ণ লইয়া পরীক্ষা করিলে, ইহাদের প্রত্যেকের পথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ মধ্যে কোনই একতা লক্ষিত হইবে না। কোন বর্ণের পথ অধিক, কোনটির বা অল্প বাঁকিয়াছে দেখা যাইবে। এই মৌলিক বর্ণগুলির পথ পরিবর্ত্তনেরও এক নিয়ম আছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, বর্ণরশ্মির তরঙ্গের ক্ষুদ্রতা হিসাবে, ইহাদের বাঁকিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ

ক্ষুদ্রতরঙ্গযুক্ত বর্ণের আলোকপথ বৃহৎ-তরঙ্গযুক্ত বর্ণ অপেক্ষা অধিক বাঁকিয়া যায়। মৌলিক বর্ণগুলির এই এই প্রকার পৃথক বাঁকিবার শক্তি থাকায় বর্ণচ্ছত্রের বিকাশ হয়, অন্তথা বর্ণচ্ছত্র রচনা অসম্ভব হইয়া পড়িত। আমরা শুভ্রালোক ত্রিকোণ কাচ-ফলকের মধ্য দিয়া আনিয়া, শুভ্রালোকস্থ ভিন্ন প্রকৃতির মৌলিক বর্ণগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে বাঁকিবার সুযোগ প্রদান করি। ভায়লেটের রশ্মিতরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া, ইহা দ্বারা এগুলি অত্যন্ত বাঁকিয়া কাচ হইতে বাহির হয় এবং দীর্ঘ তরঙ্গশীল লোহিত অল্পই বাঁকিয়া আইসে। এজন্য শুভ্রালোক হইতে লোহিত ও ভায়লেট বর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ণগুলিরও উক্ত অবস্থা ঘটে; ইহাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরস্পর সমান নয় বলিয়া, ইহারাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, লোহিত ও ভায়লেটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যানুসারে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সাধারণ শুভ্রালোক এই প্রকারেই বিশ্লিষ্ট হইয়া লোহিতাদি সপ্ত মৌলিক বর্ণযুক্ত উজ্জ্বল সুপ্রশস্ত বর্ণচ্ছত্র রচনা করে।

নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা যে বর্ণচ্ছত্র প্রাপ্ত হই, তাহাতে লোহিতাদি বর্ণ অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে, কেবল ইহার মধ্যে সৌরবর্ণচ্ছত্রের প্রধান লক্ষণ কতকগুলি কৃষ্ণরেখা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু এই কৃষ্ণরেখাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া, স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ বর্ণচ্ছত্র
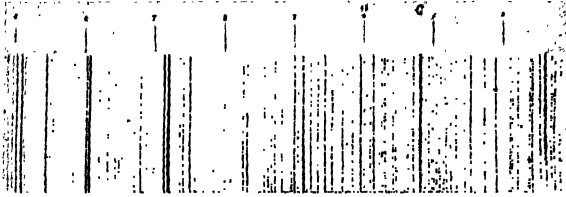
সৌর বর্ণচ্ছত্রের একাংশের কৃষ্ণরেখা

পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এগুলি সহসা লক্ষিত হয় না; এজন্য সৌরবর্ণচ্ছত্র প্রায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এই ত গেল সূর্য্যালোকের কথা। অপর আলোকও বিশ্লিষ্ট হইলে, বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মৌলিক বর্ণরশ্মি সংযোগে সূর্য্যালোক উৎপন্ন হয়, তাহার সকলগুলি অপর আলোকে এককালে উপস্থিত থাকে না। এজন্য বিবিধ বর্ণচ্ছত্রে বর্ণবিন্যাসের অনেক প্রভেদ দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে এই কারণে বর্ণচ্ছত্রের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাও দেখা গিয়া থাকে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিভেদে পদার্থ সকলের বর্ণচ্ছত্রগুলিকে প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে সকল বর্ণচ্ছত্রে

বর্ণসকল অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর সজ্জিত থাকে, তাহাদিগকে এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, কঠিন ও তরল পদার্থ প্রজ্বালিত করিলে, তজ্জাত আলোক দ্বারা সাধারণতঃ এই অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের বিকাশ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রে বিশ্লিষ্ট-বর্ণগুলির উজ্জ্বলতা সমান থাকে না, এজন্য ইহাতে বর্ণসকল বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেখা যায়;—সৌরবর্ণচ্ছত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত, ইহার সর্ব্বাংশ কৃষ্ণরেখা পরিব্যাপ্ত থাকে বলিয়া, পূর্ব্বাপর বর্ণগুলির মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া যায়, কাজেই ইহা প্রথম শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—এই শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রোৎপাদক আলোক হইতে কোন প্রকারে কতকগুলি মৌলিক বর্ণরশ্মি লয়প্রাপ্ত হইলে বর্ণচ্ছত্রে লুপ্তবর্ণ সকল প্রকাশিত হয় না, কাজেই ইহাদের স্থান শূন্য পড়িয়া থাকে। এই শূন্যস্থানই সৌরবর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণরেখাকারে প্রকাশিত থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রেও অবিচ্ছিন্ন বর্ণের সমাবেশ দেখা যায় না, ইহাতে কেবল মধ্যে মধ্যে কয়েকটি স্থূল ও উজ্জ্বল বর্ণরেখা দৃষ্ট হয় মাত্র; যে-সকল রশ্মি কেবল দুই বা ততোধিক মৌলিকবর্ণ সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিশ্লেষণে, এই শেষোক্ত বর্ণচ্ছত্র রচিত হইয়া থাকে,—প্রজ্বলিত বাষ্পজাত আলোকের এই বর্ণচ্ছত্রই প্রধান লক্ষণ।

নিউটনের বর্ণবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর বর্ণচ্ছত্র লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে কিছুদিন বেশ আন্দোলন চলিয়াছিল, কিন্তু ইহা দ্বারা কোন নূতন তথ্য প্রকাশ পায় নাই। নিউটনের আবিষ্কারের অনেক পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে, টমাস মেল্‌ভিল্‌ নামক জনৈক কৃতবিদ্য যুবক নিউটন-প্রদর্শিত পথে বর্ণচ্ছত্রের নূতন গবেষণায় নিযুক্ত হন; সৌভাগ্যের বিষয়, সমসাময়িক অপর বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় মেল্‌ভিলের অনুসন্ধান ও যত্ন বিফল হয় নাই,—দাহ্য পদার্থভেদে যে দীপালোকের নানা

বর্ণচ্ছত্র হইতে পারে তাহা যুবক মেল্‌ভিলই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন এবং স্থূল কাগজস্থ ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা ত্রিকোণ কাচ-মধ্যাগত আলোক পরীক্ষা করিয়া প্রজ্বলিত বাষ্পের স্থূলোজ্জ্বল রেখাময় বর্ণচ্ছত্রের বিষয় ইনিই আবিষ্কার করেন। সামান্য যন্ত্র দ্বারা নানা জাতীয় বর্ণচ্ছত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কার করায় তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক সমাজে মেলভিলের বিশেষ সমাদর হইয়াছিল; এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া যুবক দ্বিগুণ উৎসাহে আলোকবিজ্ঞানের নানা গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত আবিষ্ক্রিয়ার দুই বৎসর পরেই মেলভিলের মৃত্যু হওয়ায় বিজ্ঞানজগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মেল্‌ভিলের পর, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওলাষ্টন্ বর্ণচ্ছত্রের গবেষণায় নিযুক্ত হন; ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রয়াল্ সোসাইটির অধিবেশনে তাঁহার পরীক্ষালব্ধ কয়েকটি নূতন কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা দ্বারা আলোকবিজ্ঞানের বিশেষ কোন উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। আলোক-বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস ঠিক কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, অনেকে বলেন, স্বনামপ্রসিদ্ধ যোজেফ্ ফ্রান্‌হোফারের সময় হইতেই আলোক-বিজ্ঞানের উন্নতি আরম্ভ হয়। যাহা হউক ফ্রান্‌হোফারের বিখ্যাত আবিষ্কার এবং তাঁহার নানা পরীক্ষা, আলোকবিজ্ঞান ও বর্ণচ্ছত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে যে একটি মহৎ ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্‌হোফার কর্ত্তৃক সৌর বর্ণচ্ছত্রে পূর্ব্ববর্ণিত কৃষ্ণরেখার আবিষ্কার হওয়ায় অনেকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুইখানি ভিন্ন-প্রকৃতি কাচ লইয়া, বিবিধ রশ্মির আলোকপথ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ স্থির করিতে গিয়া এই জর্ম্মান্ পণ্ডিত, সৌর বর্ণচ্ছত্রে হঠাৎ কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করেন। অপর পণ্ডিতগণ ইঁহার এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সন্দিহান হওয়ায়, থিওডোলাইট্ যন্ত্রের দূরবীক্ষণ দ্বারা, ঐ

রেখাগুলির সংখ্যা ও স্থান প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে পর, সকল সন্দেহই অপনীত হইয়াছিল। ফ্রানহোফার এই ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা প্রায় ছয়শত কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিত কেবল কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রায় তিন বৎসর অবিরাম পরিশ্রম দ্বারা সেগুলির পরস্পর ব্যবধান স্থির করিয়া, সৌর বর্ণচ্ছত্রের কয়েকটি প্রতিকৃতিও অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরেখাগুলির সংখ্যা যে নির্দ্দিষ্ট, এবং সাধারণ সূর্য্যালোকে ও চন্দ্রাদি গ্রহ-উপগ্রহাগত প্রতিফলিত আলোকে, ঐ কৃষ্ণরেখাগুলির স্থানও যে নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাও ফ্রানহোফার সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। এই প্রকারে নানা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেও, নানা পরীক্ষা ও চেষ্টাতে, ফ্রানহোফার কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

ফ্রানহোফারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান শতাব্দীর গবেষণা-পরায়ণ পণ্ডিতদের কথা স্মরণ করিলে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সার্ জন হার্সেল ও ফক্স ট্যালবটের কথা স্বতঃই মনে হয়। এই বৈজ্ঞানিক-দ্বয়ের মৌলিক গবেষণা দ্বারা, বর্ণচ্ছত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অপরি-জ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং বর্ণচ্ছত্র দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা, এই পণ্ডিতযুগলই সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হার্সেল সাহেব, বিবিধ জ্বলন্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় নিযুক্ত হন এবং প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের নির্দ্দিষ্টাংশে এক একটি স্থূল বর্ণরেখা দেখিয়া, এই নির্দ্দিষ্ট বর্ণরেখাগুলিকেই, দাহ্য পদার্থের প্রকৃতি-জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করেন। হার্সেলের পরীক্ষাকালে, তাৎকালিক অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানবিৎ সার্ ডেভিড ব্রুষ্টার ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার উদ্ভিজ্জরসে বর্ণচ্ছত্র পাতিত করিলে ইহার বর্ণ পরিবর্ত্তন

হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ণচ্ছত্র দ্বারা বিশ্লেষণ কার্য্য সম্ভবপর বলিয়া, এই বৈজ্ঞানিকদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথম অনুমান করেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বাষ্পের নির্দ্দিষ্ট রশ্মিহরণক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, সৌর বর্ণচ্ছত্রস্থ কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের প্রকৃত কারণের আভাষ, ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রচারিত করেন।

হার্সেল এবং ব্রুষ্টারের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ফক্স ট্যাল্‌বট্‌ উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের আবিষ্কারের সমালোচনা করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে, ট্যাল্‌বটের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, প্রাচীন বিজ্ঞান ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন,—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারাই আধুনিক বর্ণচ্ছত্রীয় বিশ্লেষণ-প্রথার মূলভিত্তি স্থাপিত হয়। গ্রন্থকার একস্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—জটিল রাসায়নিক পদার্থ প্রজ্বালিত করিয়া, কেবল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা দ্বারা ইহার গঠনোপাদান অতি সূক্ষ্মভাবে স্থির করিতে পারা যায়। এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকার্য্য অপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সকল বর্ণচ্ছত্রে সোডিয়ম্ জাত উজ্জ্বল পীতরেখা দেখিয়া পীতরেখা-উৎপাদক পদার্থটির আবিষ্কারার্থে ট্যাল্‌বট্‌ নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। প্রায় সকল পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে জল আছে দেখিয়া জলই পীতবর্ণোৎপাদক পদার্থ বলিয়া স্থির করেন এবং অপর এক সময়ে লোহিতালোকজাত বর্ণচ্ছত্রে অত্যুজ্জ্বল পীতরেখা দেখিয়া, গন্ধকই ইহার কারণ বিবেচনা করেন।

এখন পূর্ব্ববর্ণিত প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের নানা পরীক্ষাদি দ্বারা দেখা যাইতেছে পদার্থমাত্রই তাপসংযোগে বাষ্পীভূত ও প্রজ্বলিত হইলে, ইহাদের বর্ণচ্ছত্রে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয় এবং পদার্থটির অস্তিত্ব থাকিলে সকল সময়েই বর্ণচ্ছত্রের এক একটি নির্দ্দিষ্ট

স্থানে উক্ত রেখাসকল প্রকাশিত দেখা যায়; কাজেই বর্ণচ্ছত্রস্থ এই স্থির বর্ণরেখাগুলি পরিদর্শন করিয়া, অনায়াসেই অতি জটিল পদার্থের গঠনোপাদানও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সোডিয়ম্ পোটাসিয়ম্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু সাধারণ দীপশিখায় সহজেই বাষ্পীভূত ও প্রজ্বলিত হয়, এজন্য ইহাদের বর্ণচ্ছত্র অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অপর পদার্থ অল্পতাপে বাষ্পীভূত ও প্রজ্বলিত করা অতি কষ্টসাধ্য এবং অনেক সময়ে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এ পর্য্যন্ত সাধারণ বিশ্লেষণকার্য্যে বর্ণচ্ছত্র ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু আজ কাল বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও অক্সি-হাইড্রোজেন দীপশিখার সাহায্যে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, এজন্য এই অভিনব বিশ্লেষণপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া আদৃত হইতেছে। কেবল বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা, আজকাল সকল ধাতুই বাষ্পীভূত হইতেছে।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা কেবল যে, পদার্থ বিশ্লেষণের সুযোগ হইয়াছে তাহা নয়, গত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে, ইহা দ্বারা কয়েকটি নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোটাসিয়ম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর বর্ণচ্ছত্রে ইহাদের বর্ণরেখা নিরূপণকালে জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মানপণ্ডিত বুন্‌সেন্ দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। পোটাসিয়মের বর্ণচ্ছত্রের বর্ণরেখার পার্শ্বে অপর একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণরেখা দেখিয়া নিশ্চয়ই ইহা কোন বিজাতীয় পদার্থ যোগে উৎপন্ন হইয়াছে স্থির করিয়া বুন্‌সেন্ এই বর্ণোৎপাদক পদার্থটিকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন, এবং ইঁহার এই চেষ্টার ফলে রুবিডিয়ম্ ও সিজিয়ম্ নামক দুইটি নূতন ধাতুর আবিষ্কার হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্ কোন একটি যৌগিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষাকালে বর্ণচ্ছত্রে একটি অত্যুজ্জ্বল নীলরেখা দেখিয়াছিলেন এবং ইহা পরিজ্ঞাত কোন মৌলিক পদার্থজাত হইতে পারে না বুঝিয়া সম্ভবতঃ ইহা একটি নূতন পদার্থের অস্তিত্বজ্ঞাপক

বলিয়া স্থির করেন, এবং অল্পায়াসেই থ্যালিয়ম নামক একটি নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। বর্ণচ্ছত্র দ্বারা ধাতুআবিষ্কারে বুন্‌সেন্ ও ক্রুক্‌স্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাৎকালিক অনেক পণ্ডিত সকল পদার্থেরই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বয়স্‌বাদ্রোঁ ও ফ্রেনবর্গ নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় অল্পকাল মধ্যেই ইণ্ডিয়ম্ ও গ্যালিয়ম্ নামে অপর দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন।

প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রস্থ নির্দ্দিষ্ট বর্ণের স্থির রেখাগুলিই, এই নূতন বিশ্লেষণ প্রথার প্রধান অবলম্বন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—পদার্থ পরিবর্ত্তন না করিলে, বর্ণচ্ছত্রে নির্দ্দিষ্ট বর্ণরেখাগুলির স্থান সকল সময়েই এক থাকে। এখন ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে,—কোন এক জটিল যৌগিকের উপাদান স্থির করিতে হইলে, বর্ণচ্ছত্র রচনা করিয়া ইহার কোন্ কোন্ বর্ণরেখা মৌলিক বর্ণচ্ছত্রস্থ রেখার অনুরূপ, সর্ব্ব প্রথমে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, তাহা স্থির করিতে পারিলে, তত্তৎ বর্ণরেখা উৎপাদক মৌলিক পদার্থ যে, উক্ত যৌগিকে বর্ত্তমান আছে, তাহা অনায়াসেই স্থির করা যায়। কোন্ মৌলিক পদার্থ কোন্ বর্ণরেখা প্রকাশ করে তাহা নানা পদার্থের রঞ্জিত প্রতিকৃতি দেখিয়া অনায়াসে জানিতে পারা যায়। আজকাল সাধারণ বিশ্লেষণকার্য্য এই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ণচ্ছত্রস্থ বর্ণরেখাগুলির স্থান যে, সকল সময়েই নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোকজনক পদার্থের অবস্থা-ভেদে, অনেক সময় রেখাগুলি কখন ক্ষীণতর কখন বা প্রশস্ততর হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, আলোকোৎ-পাদক পদার্থের চাপ ও তাপ বৃদ্ধি করিলে ইহার পরিচায়ক বর্ণরেখাগুলি ক্রমেই উজ্জ্বল ও প্রশস্ততর হইতে দেখা যায় এবং তাপ পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলে, বর্ণচ্ছত্রে কখন কখন একই

বর্ণের অপর দুই একটি রেখা দৃষ্ট হয়। চাপ ও তাপ দ্বারা বর্ণচ্ছত্রের এই পরিবর্ত্তনে, পরীক্ষায় নানা গোলযোগ উপস্থিত করে; কারণ, অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল বর্ণচ্ছত্র, জ্বলন্ত কঠিন পদার্থজাত বলিয়া সাধারণতঃ স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু বাষ্পজাত বিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রস্থ বর্ণরেখা-গুলিকেও প্রচুর উত্তাপ ও চাপ সাহায্যে বিস্তৃত করিয়া, কঠিন পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ অবিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়। এজন্য বর্ণচ্ছত্রের বিশ্লেষণ কালে বর্ণরেখাগুলির পরস্পর ব্যবধান অতি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হয় এবং পরীক্ষাধীন পদার্থটিকে উপযুক্ত তাপ সংযোগে, অতি সাবধানে প্রজ্বালিত করিতে হয়।

এই ত গেল বিচ্ছিন্ন বাষ্পীয় বর্ণচ্ছত্রের কথা। কৃষ্ণরেখাময় সৌর বর্ণচ্ছত্র দ্বারাও, রাসায়নিক বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্মরূপে সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শুভ্রালোকস্থ সমবেত বিবিধ বর্ণরশ্মি সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আগমনকালে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং কতকগুলি রশ্মি কোন প্রকারে এককালে লোপ পাইয়া থাকে;— এই জন্যই সৌরবর্ণচ্ছত্রে লুপ্তবর্ণের স্থানে কৃষ্ণরেখা প্রকাশিত হয়। এই লুপ্তরশ্মি-আলোকের বর্ণচ্ছত্র দ্বারা, অনেক সময়ে সহজে তরলপদার্থের নির্ম্মাণোপাদান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—আমরা সচরাচর যে-সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তাহারা তাহাদের বর্ণ সূর্য্যালোক হইতেই পাইয়া থাকে। শুভ্রালোক ঐ সকল পদার্থে পতিত হইলে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মানুসারে ইহারা আলোকস্থ কতকগুলি বর্ণরশ্মি হরণ করে ও হৃতাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত করে,—এই প্রতিফলিত রশ্মি দ্বারা আমরা পদার্থগণকে তত্তৎবর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পাই। এই ত গেল সাধারণ পদার্থের বর্ণের কথা। স্বচ্ছ পদার্থসকলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে,— ইহাতে কেবল লুপ্তাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত না হইয়া, পদার্থের

মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বহির্গত হইয়া, ইহাদিগকে রঞ্জিত করে। বর্ণচ্ছত্র সাহায্যে কোন তরল পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, ইহার মধ্য দিয়া অবিশ্লিষ্ট রশ্মিগুচ্ছ আনয়ন করিয়া, পরে পূর্ব্ববর্ণিত সাধারণ উপায়ে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিতে হয়, পরে এই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা দ্বারা পদার্থটির উপাদান স্থির করিতে হয়। এই প্রকার বর্ণচ্ছত্রের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, তরল পদার্থের মধ্য দিয়া আগমনকালে সাধারণ সৌর বর্ণরশ্মিগুচ্ছের কতকগুলি, পদার্থটির প্রকৃতি অনুসারে লোপ প্রাপ্ত হয়; কাজেই এই লুপ্তরশ্মির আলোক দ্বারা যে বর্ণচ্ছত্র রচিত হয়, তাহাতে সৌর বর্ণচ্ছত্রস্থ স্থিররেখাগুলি ব্যতীত আরো কয়েকটি নূতন কৃষ্ণরেখা প্রকাশিত হয়। এই নূতন রেখাগুলির স্থান বর্ণচ্ছত্রের কোন্ কোন্ অংশে অবস্থিত, এবং কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ দ্বারা উক্ত বর্ণলুপ্ত রেখা সকল উৎপন্ন হয় তাহা স্থির করিলে, তরলপদার্থটির উপাদান অনায়াসেই স্থির করিতে পারা যায়।

আজকাল পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে, সকল জৈব ও ধাতব পদার্থের বিশ্লেষণকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যে-সকল জৈব পদার্থ জটিলতার জন্য এ পর্য্যন্ত অবিশ্লিষ্ট অবস্থায় ছিল, বর্ণচ্ছত্র সাহায্যে এখন তাহার অতি ক্ষুদ্র উপাদানও, অতি সহজে আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সন্দেহজনক মৃত্যুতে, মৃতব্যক্তির পাকাশয়স্থ পদার্থের বিশ্লেষণ অসম্ভব হইলে, কেবল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা দ্বারা অনেক সময়ে বিষাক্ত পদার্থের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে। অল্পদিন হইল, হপ্‌সেলার নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ, নরশোণিতের বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করিয়াছেন এবং শোণিত বিষসংযুক্ত হইলে, বর্ণচ্ছত্রের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয় তাহাও দেখাইয়াছেন। হপ্‌সেলারের এই আবিষ্কার দ্বারা, বিকৃত-শোণিত ব্যক্তির রক্ত কি বিষে দূষিত হইয়াছে, তাহা অল্পায়াসেই স্থিরীকৃত হইতেছে। আজকাল আবার অধ্যাপক সর্লিপ্রমুখ কয়েকটি

পণ্ডিত বর্ণচ্ছত্র সাহায্যে ব্যবসায়িগণের দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতাও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; *য়ুরোপীয় অনেক বণিক্-সভা, বিশুদ্ধতা নিরূপণের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্মতম উপায় বলিয়া স্বীকার* করিয়াছেন।

অদৃশ্য কিরণ

জ্বলন্ত কঠিন ও তরল পদার্থজাত বর্ণচ্ছত্র প্রায়ই অবিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়; সৌরবর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখা বা বাষ্পীয় বর্ণচ্ছত্রের স্থূলোজ্জ্বল রেখা ইহাতে থাকে না। * এই অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রে লোহিত হইতে ভায়লেট্ পর্য্যন্ত সকল বর্ণেরই পূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ হয়;—কিন্তু এই সুবিন্যস্ত প্রশস্ত বর্ণচ্ছত্রেও আমরা সকল বর্ণ দেখিতে পাই না। জ্বলন্ত পদার্থজাত আলোক-তরঙ্গ দ্বারা যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হয়, মানবচক্ষু তাহার সকলগুলি দেখিতে পায় না,—অনন্ত আকাশব্যাপী অনন্ত-তরঙ্গের প্রত্যেক প্রকার হিল্লোল লক্ষ্য করা, সসীম মানব দৃষ্টির সম্পূর্ণ অসাধ্য ব্যাপার; তাই আমরা অনতিবিস্তৃত সাধারণ বর্ণচ্ছত্রে কেবল লোহিত হইতে ভায়লেট্ পর্য্যন্ত কয়েকটি বর্ণ দেখিয়া থাকি। লোহিত বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর তরঙ্গ দ্বারা যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানব কিছুতেই দেখিতে পায় না, এবং ভায়লেট্ উৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কম্পন দ্বারা যে সকল বর্ণ বিকশিত হয়, তাহাও মানব-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। মানব-ইন্দ্রিয়াদির হীনতার ইহাই একমাত্র উদাহরণ নয়,—চক্ষুর ন্যায় আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়েরও শক্তির একটা সীমা আছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, বায়ুরাশি কোন প্রকারে আন্দোলিত হইয়া কম্পিত হইলে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কম্পন সংখ্যা যত অধিক হইবে, শব্দও তত চড়িতে থাকিবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা

---

* বর্ণচ্ছত্রের বিশেষ বিবরণ "বর্ণচ্ছত্র" ও "বিশ্লেষণ প্রথা" প্রবন্ধ দ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

গিয়াছে, এই কম্পনসংখ্যা সেকেণ্ডে ৩৮০০০ বার হইলে, শব্দ এতই চড়িয়া যায় যে, তাহা তখন আমাদের কর্ণ দ্বারা অনুভূত হয় না। আবার কম্পনসংখ্যা কমাইতে কমাইতে সেকেণ্ডে ৩০ বারের কম হইলে, শব্দ এতই গম্ভীর হইয়া পড়ে যে, তাহা আর কোনক্রমেই শ্রুতিগোচর হয় না। পরীক্ষা করিলে ইন্দ্রিয়াদির অসম্পূর্ণতা আমরা প্রতিপদক্ষেপেই দেখিতে পাই,—তাই দর্শনকার্য্যে চক্ষুর অপকর্ষতা লক্ষ্য করিয়া জনৈক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন,—"মানব-চক্ষুর ন্যায় একটা অসম্পূর্ণ স্থূল যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিলে, তাহা চিরকালই অবিক্রীত থাকিত।"

পূর্ব্বোল্লিখিত অতীন্দ্রিয় কিরণের অস্তিত্ব ও তাহার প্রকৃতি অল্পদিনই হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে,—একশত বৎসর পূর্ব্বে অদৃশ্য-কিরণের কথা কেহই জানিতেন না। গত ১৮০০ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম্ হার্সেল, তাপমান যন্ত্র দ্বারা বর্ণচ্ছত্রস্থ বিবিধ আলোকের তাপ নির্দ্ধারণকালে, ইহার লোহিতাংশের ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপের চিহ্ন দেখিয়া, ইহা নিশ্চয়ই বর্ণচ্ছত্রস্থ কোন অদৃশ্য আলোকরশ্মি দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। হার্সেলের এই আবিষ্কারের এক বৎসর পরে, আলোক দ্বারা নানা রাসায়নিক পদার্থ কি প্রকারে বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় তাহার পরীক্ষাকালে, রিটার্ নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ বর্ণচ্ছত্রের সকল বর্ণ অপেক্ষা ভায়লেটেরই রাসায়নিক-শক্তি অতীব প্রবল বলিয়া স্থির করেন এবং ভায়লেটের পরবর্ত্তী আলোকহীন স্থানে, এই শক্তি আরো অধিক প্রত্যক্ষ করেন। কি প্রকারে বর্ণচ্ছত্রবহির্ভূত আলোক-হীন স্থানে, এই অত্যাশ্চর্য্য রাসায়নিক শক্তি আসিল, অনেকদিন অবধি তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফলে, ইহা নিশ্চয়ই ভায়লেট্ বর্ণোৎপাদক আলোকতরঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গজাত

কোন এক আলোকশক্তির প্রভাবে ঘটিতেছে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সাধারণ দৃশ্য বর্ণচ্ছত্রে, লোহিত ও ভায়লেট্ প্রান্তের পরেও, যে আরো কতকগুলি অদৃশ্য-বর্ণের বিকাশ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, হার্সেল ও রিটারের মৌলিক গবেষণায় বেশ প্রমাণিত হইয়াছিল।

এই আবিষ্কারেব পর, সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ওলাষ্টন্ বর্ণচ্ছত্রের এই অদৃশ্যাংশের প্রকৃতি বিষয়ে নানা পরীক্ষাদি করিয়া, পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারক-দ্বয়েব সিদ্ধান্তেব সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন,—এতদ্ব্যতীত তাঁহার পবীক্ষাফলে বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বও প্রকাশিত হইয়াছিল। রশ্মিপুঞ্জের আলোকপথ পরিবর্ত্তন ক্ষমতা (Refrangibility) ও রাসায়নিক শক্তি, বর্ণচ্ছত্রের লোহিত প্রান্তে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে ভায়লেট্ প্রান্তেই যে অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে, তাহা ওলাষ্টনই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, এবং তাপের মাত্রা ঠিক্ বিপরীত ভাবে ভায়লেট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া যে, লোহিতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও ইনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন।

১৮৩৯ অব্দ হইতে কয়েক বৎসর সার্ জন হার্সেল অদৃশ্য কিরণ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ফোটোগ্রাফের কাচের (Sensitive Plate) উপর এই আলোকের প্রভাব সম্বন্ধে নানা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে, ডাক্তার ড্রেপার নামক জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিকও উক্ত বিষয়ে পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বিশেষ কোন নূতন তত্ত্বাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হন নাই,—বর্ণচ্ছত্রের কয়েক খানি ফোটো তুলিয়াই পরীক্ষায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।

বর্ণচ্ছত্র-সম্বন্ধে,—বিশেষ ইহার অদৃশ্য কিরণ বিষয়ে, আজ কাল আমরা যে সকল নূতন কথা জানিয়াছি, তাহার অধিকাংশই ফোটোগ্রাফি সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোক বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফির কার্য্য

অশেষ,—বিশেষতঃ রশ্মিনির্ব্বাচনকার্য্যে ইহার ন্যায় কার্য্যোপযোগী উপায় দুষ্প্রাপ্য। ফোটোগ্রাফের কাচের পূর্ব্বোক্ত বর্ণচ্ছত্র অঙ্কনশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পরও, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণচ্ছত্র উৎপাদনের সহজ উপায় পরিজ্ঞাত না থাকায়; অনেক দিন অবধি অদৃশ্য কিরণ সম্বন্ধে কোন আবিষ্কারের কথা শুনা যায় নাই। ১৮৫২ অব্দে নানা পদার্থের রশ্মিহরণ শক্তি (Power of Absorption) পরীক্ষাকালে, অধ্যাপক ষ্টোক্স্ (Stokes) অদৃশ্যালোক নির্ব্বাচনে কোয়ার্টজ্ নামক বালুকা প্রস্তরের (Quartz) উপযোগিতা আবিষ্কার করেন। সাধারণ কাচের পরকলার (Lens) মধ্য দিয়া আলোক আনিলে অধিকাংশ অদৃশ্যালোকরশ্মিই, কাচ দ্বারা হৃত হয়, কাজেই সেই আলোকজাত বর্ণচ্ছত্রে অদৃশ্যকিরণের পরিমাণ অতি অল্পই থাকে,—কিন্তু উক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত পরকলার সাহায্যে বর্ণচ্ছত্র পাতিত করিলে, ইহার মধ্য দিয়া সকল বর্ণরশ্মিই অক্ষত ও অলুপ্তভাবে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ বর্ণচ্ছত্র বিকাশ করে। ষ্টোক্স্ সাহেব আলোক পরীক্ষার এই সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বালুকা-প্রস্তর সাহায্যে অল্পায়াসেই ঈপ্সিত বর্ণচ্ছত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং ফোটোগ্রাফির দ্বারা ইহার অনেকগুলি ছবি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ষ্টোক্স সাহেবের এই পরীক্ষা দ্বারা অদৃশ্যালোকরশ্মি সম্বন্ধে নানা রহস্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি বৈদ্যুতিক বর্ণচ্ছত্রের যে ছবি তুলিয়াছিলেন, তাহাতে অদৃশ্যালোকরশ্মি এত অধিক ছিল যে, কেবল তাহারই বর্ণচ্ছত্র, দৈর্ঘ্যে দৃশ্যমান সাধারণ বর্ণচ্ছত্রের প্রায় সাত গুণ হইতে দেখা গিয়াছিল।

এই অদৃশ্যালোকের প্রকৃত বর্ণ কি, তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত। অসম্পূর্ণ মানবদৃষ্টি উক্ত আলোক-উৎপাদক কম্পন কোনক্রমেই অনুভব করিতে পারে না। ভায়লেটের অপর পার্শ্বস্থ অদৃশ্য-কিরণের রাসায়নিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং এই শক্তিই আলোকের একমাত্র

অস্তিত্বজ্ঞাপক। ফোটোগ্রাফের কাচ, এই আলোকে উন্মুক্ত রাখিলে তৎক্ষণাৎ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কাচের এই বিকৃতি দেখিয়া আমরা অদৃশ্যালোকের অস্তিত্ব জানিতে পারি।

আজকাল যে প্রণালীতে ফোটোগ্রাফের ছবি তোলা হইয়া থাকে, পূর্ব্ব-বর্ণিত অদৃশ্যালোকই তাহার মূল অবলম্বন। লেন্‌স্ দ্বারা ক্যামেরার মধ্যস্থ কাচের পরদায় ছায়ালোকময় যে ছবি হয়, তাহার আলোকাংশে দৃশ্যমান আলোকের সহিত অদৃশ্যালোকই মিশ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত আলোক, ইহার স্বাভাবিক রাসায়নিকশক্তি প্রভাবে, পরদাসংলগ্ন ফোটোগ্রাফিক্ কাচ বিকৃত করিয়া ফেলে, কিন্তু কাচের ছায়াহীন অংশটি আলোকাভাবে পূর্ব্বাবস্থাতেই থাকিয়া যায়। ইহার পর, অপর প্রক্রিয়াদ্বারা উক্ত কাচের অবিকৃত অংশটি, বিকৃত আলোকাস্পৃষ্ট অংশ হইতে স্পষ্টতঃ পৃথক করিলে ছবি ফুটাইয়া তোলা হইয়া থাকে।

এই ত গেল ভায়লেটের পরবর্ত্তী অদৃশ্য-কিরণের কথা। বর্ণচ্ছত্রের লোহিতপ্রান্তস্থ অদৃশ্য কিরণের প্রকৃতি, আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই অদৃশ্যরশ্মির অস্তিত্ব কেবল তাপ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—কাজেই তাপ পরীক্ষাই এই রশ্মিজাত বর্ণচ্ছত্রের বিস্তৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়; কিন্তু এই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার উপযোগী অতি সূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্র এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত না হওয়ায়, ইহার প্রকৃত রহস্য চিরান্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত অদৃশ্য কিরণের ন্যায় ইহাতে রাসায়নিক শক্তির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, এজন্য ইহার প্রকৃতি স্থিরীকরণকার্য্যে ফোটোগ্রাফের কাচের ন্যায় কোন রাসায়নিক পদার্থও বিশেষ উপযোগী হইতেছে না। এই অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ-ব্যাপারে, এই প্রকার নানা গোলযোগ থাকায় অনেক দিন অবধি বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ টিণ্ডালা ও মেলোনি কিছুকাল ইহার পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই পণ্ডিতদ্বয়ের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও অদৃশ্যালোক সম্বন্ধে, বিশেষ নূতন তত্ত্ব কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তবে মেলোনি-আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তাপমান যন্ত্র (Thermo-Electric Pile) অত্যল্প তাপ পরিমাপ কার্য্যে বিশেষ উপযোগী বলিয়া অদৃশ্যবর্ণচ্ছত্রের বিস্তৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল অনুমান করিয়াছিলেন তাহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য ইহা বেশ দেখা যাইতেছে এবং এই বর্ণচ্ছত্রের দৈর্ঘ্য যে, অনুমিত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক অধিক তাহাও বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে। অধ্যাপক ল্যাংলের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার সময়ে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, কাপ্তেন আবনি (Aboney) নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পূর্ব্ববর্ণিত ফোটোগ্রাফিক্ কাচের ন্যায়, একটা রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; ইহা বর্ণচ্ছত্রের লোহিত প্রান্তস্থ অদৃশ্যালোকে কিছুকাল উন্মুক্ত রাখিলে বিকৃত হইয়া যায়।

যাহা হউক, লোহিত প্রান্তস্থ অদৃশ্যালোক সম্বন্ধে এখনও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তামসাচ্ছন্ন রহিয়াছে, এ সকলের আবিষ্কার যে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কালব্যাপী ধীর অনুসন্ধানসাপেক্ষ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডপ্‌লার সাহেবের সিদ্ধান্ত

কোন স্রোতস্বিনী নদীতে এক ব্যক্তি দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছে, আর এক ব্যক্তি স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। মনে করা যাউক, দশ মিনিট্ কাল ঐ দুইজন জলে ছিল। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন, এই দুইটি লোকের মধ্যে কাহার গায়ে অধিক ঢেউ লাগিল, তাহা হইলে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বোধ হয় কঠিন হয় না। যে লোকটি সাঁতার কাটিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে চলিয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার গায়ে অধিক ঢেউ ধাক্কা দিয়াছিল।

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসে বলা যায়, যে লোকটি দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছিল সে অধিক ঢেউয়ের ধাক্কা খাইবার জন্য একটুও গরজ দেখায় নাই। ঢেউ যেমন নিয়মিত চলে ঠিক্ সেই প্রকারে চলিয়াই নিশ্চল স্নাতকের গায়ে নিয়মিত ধাক্কা দিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যে লোকটি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটিতেছিল, তাহাকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মিত ঢেউগুলির ধাক্কা ছাড়া আরো কতকগুলি নূতন ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ যে দিক্ হইতে ঢেউ আসিতেছে, লোকটি সেই দিকেই সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইয়া কতকগুলি নূতন ঢেউয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, যদি দণ্ডায়মান স্নাতক দশ মিনিটে দুই শত ঢেউয়ের ধাক্কা খাইয়া থাকে তবে সন্তরণশীল স্নাতক হয়ত দুইশত পঁচিশটি ঢেউয়ের ধাক্কা খাইয়াছে।

এখন মনে করা যাউক, দণ্ডায়মান স্নাতক ঠিক দাঁড়াইয়াই আছে, কেবল সন্তরণকারী লোকটি স্রোতের দিকে দ্রুত সাঁতরাইয়া চলিয়াছে। এস্থলে কোন্ লোকটিকে অধিক ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য করিতে হইবে?

বিবেচনা করিলে দেখা যায়, দণ্ডায়মান লোকটির গায়েই অধিক ঢেউ স্পর্শ করিতেছে। কারণ সন্তরণশীল লোকটি ঢেউয়ের সহিত দ্রুত সাঁতরাইতে আরম্ভ করায় পিছনের ঢেউগুলি বিলম্বে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিবে। কাজেই ধাক্কার সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি যদি দশ মিনিট সময়ে দুই শত ঢেউয়ের ধাক্কা পাইয়া থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে সন্তরণকারী লোকটি হয় ত এক শত পঁচাত্তরের অধিক ঢেউয়ের ধাক্কা পাইবে না।

ঢেউয়ের ধাক্কা পাওয়ার এই যে উদাহরণ দেওয়া হইল, ইহারই সাহায্যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের ও শব্দতত্ত্বের যে কত রহস্যের মীমাংসা হইয়াছে সত্যই তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঈথর, বাতাস বা জল, যে কোন পদার্থে যখন ঢেউ উঠে, তখন তাহাতে মজ্জমান নিশ্চল পদার্থ অপেক্ষা সচল পদার্থ যে, কখন অধিক এবং কখন কম ঢেউয়ের ধাক্কা পায়, ইহা বিজ্ঞানে Doppler's Principle অর্থাৎ ডপ্‌লার সাহেবের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মনে করা যাউক, একখানি রেলের এঞ্জিন্ দূরে দাঁড়াইয়া বাঁশি বাজাইতেছে এবং একজন শ্রোতা অদূরে ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া আছে। বাঁশি বাজিবার সময় বাতাসে যে ঢেউ তুলিতেছে তাহা শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাতে নিশ্চয়ই একটি শব্দ শুনাইবে। এখন মনে করা যাউক, সেই এঞ্জিন্‌টিই বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বে দণ্ডায়মান গাড়ির বাঁশির কম্পনে বাতাসে যে প্রকার ঢেউ হইতেছিল, এখনো তাহাই হইবে বটে, কিন্তু গাড়িখানি বাঁশি বাজাইয়া শ্রোতার দিকে ছুটিয়া আসায়, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক শব্দতরঙ্গের ধাক্কা লাগিবে। কিন্তু শব্দতরঙ্গের সংখ্যারই উপর সুরের উঁচুনীচু নির্ভর করে। প্রতি সেকেণ্ডে বারো শত বার ধাক্কা পাওয়ায় আমরা যে

শব্দ শুনিব, তাহা সেকেণ্ডে দুই হাজার বার ধাক্কা পাওয়ার শব্দ অপেক্ষা অনেক নীচু অর্থাৎ মোটা হইবে। চরকার বন্ বন্ শব্দ খুব মোটা, কারণ ইহা বাতাসে যে শব্দতরঙ্গের উৎপন্ন করে তাহা লম্বায় অত্যন্ত বড়, কাজেই শ্রোতার কানে অতি ধীরে আসিয়া আঘাত দেয়, কিন্তু মশকের গুন্ গুন্ শব্দ খুব মিহি, কারণ পুনঃ পুনঃ পক্ষান্দোলনে ইহারা বাতাসে যে তরঙ্গ তুলে তাহা অতি ছোট, কাজেই শ্রোতার কর্ণে এগুলি অতি দ্রুতভাবে আঘাত করিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের উদাহৃত এঞ্জিনখানির বাঁশি হইতে এখন যে শব্দ শ্রোতার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, তাহা পূর্ব্ব শব্দের তুলনায় মিহি হইবার কথা। ষ্টেশনের দিকে বাঁশি বাজাইয়া ছুটিতেছে, এমন কোন গাড়ির শব্দ পরীক্ষা করিলে, পাঠক সত্যই বাঁশির শব্দকে ক্রমেই মিহি হইতে শুনিবেন।

এখন সেই গাড়িখানি বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে ষ্টেশনের দিকে না আসিয়া ষ্টেশন্ হইতে দূরে যাইতেছে, এপ্রকার অবস্থা যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বাঁশির ধ্বনি মিহি হইবে কি মোটা হইবে বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শব্দের উঁচু নীচু অর্থাৎ মিহি মোটা ব্যাপারটা কর্ণে প্রবিষ্ট শব্দতরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এঞ্জিন্ স্থির থাকিয়া বাঁশি বাজাইবার সময় যতগুলি শব্দতরঙ্গ শ্রোতার কর্ণে প্রবিষ্ট করাইতেছিল, এখন দূরে যাইতে আরম্ভ করায় তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প তরঙ্গ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে,—কাজেই শব্দ মোটা হইয়া দাঁড়াইবে। পরীক্ষা করিলে সত্যই এই অবস্থায় গাড়ির শব্দকে মোটা হইতে দেখা যায়।

জলতরঙ্গের উদাহরণ যেমন বায়ুতরঙ্গে প্রয়োগ করায় একই ফল পাওয়া গেল, এখন উহাকে ঈথর-তরঙ্গে প্রয়োগ করিলে কি হয় দেখা যাউক।

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, আমরা যাহাকে আলোক বলি, তাহা সর্ব্বব্যাপী ঈথর নামক এক পদার্থের তরঙ্গ হইতে নাকি উৎপন্ন। ঈথরকে দেখা যায় না, কিন্তু সর্ব্বস্থানে অবস্থান করে। বায়ু কেবল পৃথিবীর উপরেই আছে,—পঞ্চাশ ষাটি মাইল উপরে উঠিলে আর বায়ুর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু ঈথর জিনিষটা সে প্রকার নয়, ইহা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে জুড়িয়া আছে। বায়ুতে বা জলের কোন স্থানে একটু আলোড়ন উপস্থিত হইলে যেমন তরঙ্গাকারে সেই অলোড়ন চারিদিকে ছুটিয়া চলে, ঈথরেও তাহাই হয়। কোটি কোটি মাইল দূরের জ্যোতিষ্কে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ঈথরের যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহা তরঙ্গ পরম্পরায় আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয়, এবং এই ধাক্কাতেই আমরা আলোককে দেখিতে পাই। শব্দ বা ধ্বনির বৈচিত্র্য বায়ুর তরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেকেণ্ডে বারো শত বার বায়ুতরঙ্গের আঘাত পাইলে আমরা যে শব্দ শুনি, দুই হাজার বারের আঘাতে শব্দ তাহা অপেক্ষা অনেক মিহি হইয়া দাঁড়ায়। বায়ু-তরঙ্গের সহিত ঈথর-তরঙ্গের এস্থলেও সাদৃশ্য আছে। সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি ধ্বনির মিহি-মোটাভাব যেমন বায়ু-তরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, রক্ত, পীত, হরিৎ, নীল ইত্যাদি বর্ণের বৈচিত্র্যও ঠিক্ সেই প্রকারে ঈথর-তরঙ্গের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যতগুলি ঈথরতরঙ্গ চক্ষে ধাক্কা দিয়া পীতালোক উৎপন্ন করিতেছে, তাহার সংখ্যা বাড়াইয়া দাও; দেখিবে, এখন তাহাতে আর পীতালোক উৎপন্ন হইতেছে না, পীতালোক হইতে উচ্চ কোনও বর্ণ, হয় ত সবুজ বা নীল ইত্যাদি কিছু, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঈথর-তরঙ্গের সংখ্যা কমাইয়া দাও, দেখিবে এখানে কোনও নীচু রঙ্‌ অর্থাৎ কমলা (Orange) বা লোহিত, এই প্রকার কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি ধ্বনি যেমন বায়ু-তরঙ্গের সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন

হয়, লোহিত, গোলাপী, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি রামধনুর বিবিধ বর্ণও সেই প্রকার ঈথর-তরঙ্গের ধাক্কার সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা আমাদের চক্ষুতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পাঠক রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্রের কথা হয় ত শুনিয়াছেন। এই যন্ত্রটার নাম যতটা বড়, মূল জিনিষটা কিন্তু তত বড় নয়। একটা তে-শিরা কাচ লইয়াই যন্ত্র গঠিত। সাধারণ সূর্য্যালোক যেমন এই প্রকার কাচের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলে, লাল, গোলাপী, পীত, ইত্যাদি বর্ণের এক বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) প্রস্তুত করে, নক্ষত্রের আলোকও সেই প্রকার মৌলিক বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া এক-একটি বর্ণচ্ছত্র প্রস্তুত করে। কঠিন তরল বা অধিক চাপপ্রাপ্ত বাষ্প পুড়িয়া যে-সকল বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করে, সেগুলি সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের ন্যায় অখণ্ড। অর্থাৎ এ গুলিতে লাল, গোলাপী, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি বর্ণ একবারে গায়ে গায়ে লাগা থাকে। কিন্তু সাধারণ বাষ্প পুড়িবার সময় যে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করে, তাহা খণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ইহাতে সকল রঙ্গুলি গায়ে গায়ে লাগা থাকে না। হাইড্রোজেন্ পোড়াইলে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে গোলাপী সবুজ ও নীলের কয়েকটি রেখা প্রকাশ পায়। যখনই হাইড্রাজেনের আলোককে বিশ্লেষ করা যায়, এই কয়েকটি বর্ণরেখা ব্যতীত আর কিছুই বর্ণচ্ছত্রে প্রকাশ পায় না। সেই প্রকার সোডিয়ম্ পোড়াইলে বর্ণচ্ছত্রের পীতাংশে কয়েকটি রেখা দেখা দেয় মাত্র। প্রত্যেক মূল পদার্থের এই প্রকার এক একটি বিশেষ বর্ণচ্ছত্র নির্দ্দিষ্ট থাকায়, আমরা যখন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের রশ্মি বিশ্লেষ করিয়া বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করি, তখন পরিজ্ঞাত পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের সহিত ইহার মিল দেখিয়া, নক্ষত্রে কোন্ কোন্ পদার্থ পুড়িতেছে তাহা বলিয়া দিতে পারি। এই কারণে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের গঠনোপাদান নির্ণয়ের একটি প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক মনে করা যাউক, যেন আমরা রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectroscope) দ্বারা কোন দূর নক্ষত্রের আলোক পরীক্ষা করিতেছি। জ্যোতিষ্কটি যদি আমাদের যুবক সূর্য্যের মত হয়, অর্থাৎ ইহার দেহ যদি জ্বলন্ত কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রক্তপীত হরিৎনীল প্রভৃতি বর্ণ গায়ে গায়ে লাগানো এক অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ হইয়া পড়িবে। জ্যোতিষ্কটি যদি বয়সে সূর্য্যের ছোট হয়, অর্থাৎ যদি এখনো বাষ্পাকারে থাকিয়া উহা আলোক বিতরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে বর্ণচ্ছত্র খণ্ডিত হইয়া দেখা দিবে। ইহাতে তখন লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের স্থানে কতকগুলি স্থূল বর্ণরেখা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইবে না। যদি কেবল হাইড্রোজেন পোড়াইয়াই জ্যোতিষ্কটি দীপ্তিশালী হইয়া থাকে তবে, তাহা হাইড্রোজেনেরই বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ করিতে থাকিবে। যাহা হউক মনে করা যাউক, এই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্বলন্ত বাষ্পময় একটি জ্যোতিষ্ক ভীমবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেই সময়ে আমরা উহার আলোকের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কোন বস্তু নিশ্চল থাকিয়া যে আলোকে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই দর্শকের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকিলে অপর আলোক দেখাইতে আরম্ভ করে। কারণ নিশ্চল অবস্থায় যতগুলি ঈথর-তরঙ্গ দ্রষ্টার চক্ষে আঘাত দেয়, ছুটিয়া অগ্রসর হওয়ায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তরঙ্গ চক্ষে আসিয়া পড়ে। আমাদের চক্ষু এই তরঙ্গমাত্রার পার্থক্য ধরিতে পারে না, কিন্তু রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। জ্যোতিষীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমাদের উদাহৃত সেই রেলের গাড়ি কাছে ছুটিয়া আসিলে যেমন তাহার মোটা সুরটা মিহি হইয়া দাঁড়ায়, এখানেও ঠিক্ সেই রকমে জ্যোতিষ্কের বর্ণচ্ছত্রস্থ নীচু রঙ্‌গুলি ক্রমে উঁচু হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ বর্ণচ্ছত্রে যদি কেবল নীল বা পীত রেখা থাকে, তবে সেগুলি

সরিয়া ভায়লেটের দিকে যাইতে চায়। যে-সকল জ্যোতিষ্ক আমাদের নিকট হইতে দূরে যাইতেছে, তাহাদের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিলে কাজেই সেই উদাহৃত দূরগামী রেলগাড়ির বাঁশির সুরের মত বর্ণচ্ছত্রের "উঁচু" আলো "নীচু" হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ বর্ণচ্ছত্রে যদি হল্‌দে বা নীল প্রভৃতি বর্ণরেখা থাকে, তাহা লালের দিকে সরিয়া যাইতে চাহিবে।

জ্যোতিষ্কের গতি দ্বারা বর্ণচ্ছত্রের রেখার এই বিচলন পরীক্ষা করিয়া আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে যে কত নব নব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তাই হয় না। এই সকল তথ্য যে, কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেকার জ্যোতিষিগণ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, আমাদের পৃথিবী যেমন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকালে একবার ঘুরপাক্ খায়, সূর্য্যও সেই প্রকার এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক-একটা পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করে। কিন্তু পূর্ব্বে আবর্ত্তন-কাল নিরূপণের উপায় ছিল না। এক্ষণে, আবর্ত্তনের জন্য সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রের রেখাগুলির কতটা বিচলন হইল পরিমাপ করিয়া, আবর্ত্তন-কাল নির্ণীত হইয়াছে। নক্ষত্রগুলিকে আমরা আকাশে নিশ্চল দেখি বটে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা গতি আছে। ইহারা পৃথিবী হইতে অতি দূরে অবস্থিত বলিয়া হাজার দুই হাজার বৎসরের পর্য্যবেক্ষণে উহাদের বিচলন চোখে ধরা যায় না, কাজেই গতির পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট ছিল। আজকাল ঐসকল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের কেবল বর্ণচ্ছত্রের বিচলন পরীক্ষা দ্বারা মোটামুটি ভাবে গতি নির্ণয় করা হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ উইলিয়ম্ হগিন্‌স্ (Huggins) কতকগুলি নক্ষত্রকে এই প্রকারে প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়াছেন।

যুগ্ম নক্ষত্রের (Binary Stars) কথা পাঠক হয় 'ত শুনিয়া

থাকিবেন। এই নক্ষত্রগুলি যুগ্ম সূর্য্যবিশেষ। ইহারা জোড়া জোড়া আকাশে অবস্থান করে এবং একটি অপরটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। দূরবীক্ষণ দিয়া এই প্রকার যুগ্ম নক্ষত্র অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অতি দূরের নক্ষত্রগণের যুগ্মতা দূরবীক্ষণ দ্বারা স্থির হয় না। প্রত্যেক দূরবীক্ষণের শক্তির এক-একটা সীমা আছে। এমন শক্তিসম্পন্ন দূরবীণ্‌ নির্ম্মিত হয় নাই, যাহা অতি দূরের নক্ষত্রগুলির যুগ্মতা দেখাইতে পারে। দূরের নক্ষত্রগুলির যুগ্মতা নির্দ্ধারণে বর্ণচ্ছত্রের রেখার বিচলন পরীক্ষাই একমাত্র উপায়। এই পদ্ধতিতে যে কত নক্ষত্রের যুগ্মতা নিরূপিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবল ইহাই নয়, কত বেগে তাহারা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং প্রদক্ষিণ-কালই বা কত তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মনে করা যাউক, অতি দূরে কোন যুগ্ম নক্ষত্র রহিয়াছে; এবং যেন খুব ভাল দূরবীণ্‌ দিয়াও ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানা যাইতেছে না। এখন রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র দ্বারা যদি ইহাদের বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দুইটির জন্য উপর্য্যুপরি দুইটি বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শ্রেণীর নক্ষত্রগণের মধ্যে একটি অপরটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এখন যদি উদাহৃত নক্ষত্র-যুগ্মের মধ্যে একটি আমাদিগের দিকে অগ্রসর হয় এবং অপরটি আমাদের নিকট হইতে দূরে যাইতে থাকে, তাহা হইলে যে কেবল আমরা দুইটি বর্ণচ্ছত্রই দেখিব তাহা নয়; প্রথমের বর্ণচ্ছত্র-রেখা সেই ডপ্‌লারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণচ্ছত্রের বেগুনে রঙের দিকে বিচলিত হইবে এবং অপরটির রেখা লোহিতের দিকে যাইতে চাহিবে। এই প্রকারে কিছুক্ষণ বর্ণচ্ছত্রদ্বয় পরস্পর পৃথক হইয়া আবার ঠিক উপর্য্যুপরি আসিয়া দাঁড়াইবে এবং আবার পৃথক হইয়া পড়িবে। এই উপায়ে নক্ষত্রের যে কেবল যুগ্মতাই জানা যায়, তাহা নয়; বর্ণচ্ছত্রদ্বয় কত সময়ের পরে

এক-একবার উপর্য্যুপরি আসিতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া নক্ষত্রদের পরিভ্রমণ-কালও নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে আমাদের উত্তরাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্রহ্মহৃদয়কে (Capella) যুগ্ম বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ইহার প্রত্যেক নক্ষত্র অপরটিকে ১০৪ বৎসরে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আজকাল যুগ্ম নক্ষত্রের তালিকা এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে, জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, আকাশের অধিকাংশ নক্ষত্রই যুগ্ম ও আমাদের সূর্য্যের ন্যায় একক নক্ষত্র অতি অল্পই দেখা যায়।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, আধুনিক জ্যোতিষিগণ সূর্য্যের বাষ্পাবরণটিতে স্থূলতঃ তিনটি স্তর দেখিতে পাইয়াছেন। সূর্য্যের মূল দেহটি কঠিন, কি তরল, কি বাষ্পাকারে আছে জানা যায় নাই। যদি বাষ্পাকারে থাকে, তাহা হইলে উহা যে অত্যন্ত চাপযুক্ত অবস্থায় আছে, আমরা বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কঠিন, তরল বা চাপযুক্ত বাষ্পের বর্ণচ্ছত্র যেমন অখণ্ড হইয়া প্রকাশ পায়, সূর্য্যের মূলদেহের বর্ণচ্ছত্র ঠিক সেই প্রকার অখণ্ড আকারে দেখা দেয়। যাহা হউক সূর্য্যের যে তিনটি বাষ্পাবরণের কথা বলিতেছিলাম, তাহার প্রথমটিকে জ্যোতিষিগণ আলোকমণ্ডল (Photosphere) বলেন। সূর্য্যের এই যে দীপ্তি, তাহা আলোকমণ্ডল হইতে উৎপন্ন। মূলে এই মণ্ডল প্রজ্বলিত বাষ্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহারই পর সূর্য্যের বাষ্পাবরণের আর যে একটি স্তর আছে তাহাকে বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) বলা হইয়া থাকে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণকালে যখন সৌরবিম্ব কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন এই বর্ণমণ্ডল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। রক্ত, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত বাষ্পরাশি শিখাকারে উপরে উঠিয়া যে অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখায়, তাহা প্রকৃতই দর্শনীয় ব্যাপার। ইহার পরই সূর্য্যের আকাশের যে তৃতীয় স্তরটি আছে, তাহা জ্যোতিষিগণের নিকট ছটামুকুট (Corona) নামে প্রসিদ্ধ।

দূরবীণ্‌ দিয়া এই স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালেই এই স্তর পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। গ্রহণকালে যখন চন্দ্রের কৃষ্ণ বিম্ব সূর্য্যের উজ্জ্বল দেহ ও আলোকমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন সূর্য্যের ঐ তৃতীয় স্তর ছটার মত সূর্য্যকে ঘিরিয়া আছে দেখা যায়। যাহা হউক, ডপলার সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করায় সূর্য্যের বর্ণমণ্ডল এবং এই মণ্ডল হইতে নির্গত বর্ণ-শিখার অনেক নবতথ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে। এইপ্রকার পরীক্ষায় কতকগুলি শিখাকে প্রায় ষাইট হাজার মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে এবং কতকগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত হইতে তিন শত মাইল পর্য্যন্ত বেগে উপরে উঠিতে দেখা গিয়াছে। সূর্য্যের তৃতীয় বাষ্পাবরণ অর্থাৎ ছটামুকুট পরীক্ষাতেও আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্র যথেষ্ট লাভবান্‌ হইয়াছে। এই অংশের বর্ণচ্ছত্রে এমন কতকগুলি বর্ণরেখা দেখা যায়, যাহা আমাদের পরিজ্ঞাত কোন পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের সহিত মিলে না। বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকারে কোরোনিয়ম্‌ (Coronium) নামক একটি নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। হেলিয়ম্‌ (Helium) ধাতুর আবিষ্কারের অনেক পূর্ব্বে সূর্য্যের বাষ্পাবরণে ইহার অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছিল। হেলিয়মের আবিষ্কারক সার্‌ উইলিয়ম র‍্যাম্‌জে (Ramsay) সাহেব এই প্রকারে প্রথমে এই জিনিষটার সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বর্ণচ্ছত্র ও ডপলারের সিদ্ধান্তের সাহায্যে এতগুলি নূতন আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নাই; ইহা লইয়া আজও নানা পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চলিতেছে।

ভূমি-কম্প

আমাদের পৃথিবীকে নানা দৈব উপদ্রব সহ্য করিয়া আসিতে হয়। অতি অল্পকাল মধ্যে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, চিলি, কিংষ্টন্ এবং সুমাত্রাদি স্থানে যে কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা শুনা গিয়াছে, তাহাতে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয়, যেন পৃথিবীর উপর দিয়া এক একটা খণ্ড প্রলয় চলিয়া গিয়াছে।

ভূ-কম্পন পৃথিবীর চিরসঙ্গী। অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী অত্যন্ত উষ্ণাবস্থায় ছিল, বড় বড় ভূমিকম্প তখনকার একটা দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত। বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত ও সাগর মহাসাগর সেই সকল উৎপাতেরই এক একটা মহাকীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন পৃথিবীর আর সে অবস্থা নাই। প্রাচীনকালের অগ্নিময় পৃথিবী তাপ বিকিরণ করিতে করিতে এখন অগ্নিগর্ভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জঠরাগ্নির পরিচয় আমরা কেবল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং মৃদু ভূ-কম্পনে দেখিয়া আসিতেছিলাম। কাজেই গত কয়েক বৎসরের বড় বড় ভূমিকম্পগুলি বৈজ্ঞানিকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক কথা বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে বর্ত্তমান কালের দৈব উপদ্রবগুলির আলোচনা কালে লর্ড কেল্‌ভিন্ (Lord Kelvin) এ সম্বন্ধে যে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছিলেন, সে গুলি বড় সারগর্ভ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচনা করিব।

লর্ড কেল্‌ভিনের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এই জলস্থলময় পৃথিবীর গোড়ার খবর কিছু জানা আবশ্যক। প্রাচীন গ্রীক্ রোমান্ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ইঁহাদের সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিতেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের পৃথিবীর গঠনোপাদান অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর আকারে মহাকাশের কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং প্রত্যেক পরমাণু সমান্তরাল গতিতে (Parallel Motion) ছুটাছুটি করিত। কিন্তু এই সমান্তরাল গতিবিশিষ্ট পরমাণুগুলি যে কি-প্রকারে মিলিত হইয়া, এই পৃথিবীতে বিচিত্র পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহার মীমাংসা করেন নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিতেছেন, পৃথিবীর গঠনোপাদানগুলিকে সমান্তরাল-গতিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিলে জগৎ-রচনার মূল প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মহাকাশে পরিব্যাপ্ত বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলির প্রত্যেকেরই প্রথমে এক একটি কেন্দ্রাভিমুখী গতি ছিল, এবং ইহা দ্বারাই নানা জাতীয় পরমাণু কাছাকাছি হইয়া ও জোট্ বাঁধিয়া নানাপদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে।

জোট্ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেই, তদুৎপন্ন পদার্থের ঘনত্ব জল মৃত্তিকাদির অনুরূপ হয় নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ঐ অবস্থায় পদার্থের গুরুত্ব সম্ভবতঃ জল অপেক্ষাও প্রায় দশ গুণ লঘু ছিল; এবং ইহার পর পরমাণুগুলি আরো কাছাকাছি হইয়া পড়িলে, আমাদের পরিচিত নানা যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বহুযোজনস্থানব্যাপ্ত পরমাণুগুলির প্রত্যেকেই এক কেন্দ্রের দিকে চালিত হইলে, দূরাগত অণুর ধাক্কায় কেন্দ্রে সঞ্চিত অণুগুলির উপর একটা প্রবল চাপ পড়িবার কথা। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই চাপের পরিমাণ তাঁহার হিসাবে দেখাইয়াছেন। চলিষ্ণু পদার্থ কোন স্থানে

আসিয়া প্রবলবেগে ধাক্কা দিলে, প্রথমে আহত স্থান একটি প্রবল চাপ পায়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে পদার্থটি প্রতিহত হইয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, তখন আহত স্থানে আর কোন চাপই থাকে না। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিতেছেন, কেন্দ্রাভিমুখী পরমাণুগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে, কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানের চাপ কিছুকাল ধরিয়া ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তালে তালে বাড়িয়া কমিয়া চলিয়াছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই চঞ্চলতা কত দিন ছিল ঠিক্ বলা যায় না। সম্ভবতঃ পরমাণুগুলি কাল-ক্রমে অণুতে পরিণত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর ঐ অস্থিরতার অবসান হইয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন, এই অবস্থায় পৃথিবী তরল পদার্থময় ছিল, এবং এইখানেই সৃষ্টির আরম্ভ। পৃথিবী সেই সময় সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, এবং তাপ বিকিরণ করিতে করিতে ইহার বহুকাল পরে ভূপৃষ্ঠের উপরটা এক কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন জিনিষকে সঙ্কুচিত করিলে, তাহা দ্বারা জিনিষটিতে তাপের উৎপত্তি হয়। এজন্য পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তাহার ভিতরের তাপ সহসা কমে নাই। সঙ্কুচনের প্রভাবে ভিতরের উষ্ণতা বরং বহুকাল ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল; এবং পরে তাপের মাত্রা চরম হইয়া দাঁড়াইলে, উপরের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরটাও শীতল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তরল পদার্থের উপরের অংশ জমাট বাঁধিয়া ঘনতর ও ভারি হইয়া পড়িলে, উপরকার ভারি জিনিষগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নীচে নামিয়া পড়ে। কেল্‌ভিন্ অনুমান করিতেছেন, পৃথিবীর কঠিন আবরণের ঐ প্রকার ভাঙ্গাচোরা এককালে পৃথিবীতে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং ইহাতে পৃষ্ঠদেশ হইতে আগত বৃহৎ বৃহৎ কঠিন স্তূপগুলি ভিতরকার উত্তপ্ত তরল পদার্থে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,

বর্ত্তমান কালে ভূগর্ভ কখনই নিছক্ তরল পদার্থময় নয়। উপরকার গুরুভারবিশিষ্ট কঠিন আবরণ গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাতে নিমজ্জিত থাকায় এখন ভূগর্ভ কঠিন ও তরল উভয় পদার্থময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গামে ভূমিকম্প

ভূপৃষ্ঠের জমাট্ অংশের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাঙ্গাচোরাকে লর্ড কেল্‌ভিন্ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমন ও ভূ-কম্পনের কারণ বলিয়া প্রচার

করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, কালক্রমে পৃথিবীর কঠিন আবরণটি খুব গভীর হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভাঙ্গাচোরার কাজ এখনো পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। কাজেই ভূপৃষ্ঠের গভীর অংশের মাটিপাথর যখন ভাঙ্গিয়া ভূগর্ভস্থ দ্রবপদার্থে ডুবিতে আরম্ভ করে, তখন সেই দ্রবপদার্থ উছলিয়া বহির্গত হইবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করে। বড় বড় আগ্নেয়গিরির গহ্বরগুলি ভূগর্ভের খুব গভীর অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কাজেই ঐ সকল ছিদ্রপথে সেই উচ্ছলিত গলিত ধাতু যে, বাহির হইয়া ভূপৃষ্ঠকে প্লাবিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম। লর্ড কেল্‌ভিন্ ভূ-কম্পনকেও ঐ আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ ভূপৃষ্ঠের গভীর স্থানের মৃত্তিকা-প্রস্তরাদি যখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূগর্ভে পতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই আন্দোলনে পৃথিবী কম্পিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

পৃথিবী কালক্রমে শীতল হইয়া পড়িতেছে, কাজেই উহার ভিতর-কার দ্রবপদার্থ যে, শীতল হইয়া এককালে কঠিন হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দূরভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্তটা জমাট বাঁধিয়া গেলে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূ-কম্পন কি বন্ধ হইয়া যাইবে?

লর্ড কেল্‌ভিন্ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভবিষ্যতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণ নিশ্চয়ই লোপ পাইবে। অতি প্রাচীনকালে ভূপৃষ্ঠে অনেক বড় বড় আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু পৃথিবী শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিতে আর বড় অগ্নির চিহ্ন দেখা যায় না। সুতরাং বিসুভিয়স্ প্রভৃতি যে কয়েকটি সজীব আগ্নেয়গিরি আছে, তাহারাও যে কালক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভূমিকম্পের লোপ-সম্বন্ধে কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিন্ বিশেষ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার

মত এই যে, ভূগর্ভস্থ সমগ্র গলিত পদার্থ শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া গেলেও, ভূগর্ভের আকুঞ্চন রোধ পাইবে না। তখন পৃথিবীর ভিতরে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হইতে থাকিবে এবং সময়ে সময়ে উপরকার মাটি পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই সকল গহ্বর পূর্ণ করিতে থাকিবে। কাজেই এই প্রকার ভাঙ্গাচোরার দ্বারা পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্ণমাত্রাতেই চলিতে থাকিবে।

ভূপৃষ্ঠের মাটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভূগর্ভস্থ গহ্বর পূর্ণ করিতে থাকিলে যে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, কয়েকটি আধুনিক ভূমিকম্পের কার্য্য আলোচনা করিলে, আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। সুমাত্রা দ্বীপে যে বৃহৎ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠ অনেকটা নীচু হইয়া একটি সহরের কতক অংশকে প্রায় সমুদ্রতলশায়ী করিয়াছে। গত ১৮৯৭ সালের বাঙ্গালা দেশের বৃহৎ ভূমিকম্পের কথা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। ইহাতেও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানকে উচুনীচু হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি জাপানে যে এক ভূমিকম্প হইয়াছে, তাহাতে তথাকার একটি স্থান প্রায় ২০ ফুট নীচু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভূমিকম্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে লর্ড কেল্‌ভিনের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটি যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিম্ব

জলবিম্ব যদিও আমাদের অনেকের নিকট পার্থিব ব্যাপারের ক্ষণ-স্থায়িত্ব ও অসারবত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অনেকদিন অবধিই ইহা গভীর চিন্তা ও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। অনেকানেক বিখ্যাত পণ্ডিত অসার জলবিম্বের উৎপত্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিম্বের প্রকৃতি ও পদার্থভেদে ইহার স্থায়িত্বের পরিবর্ত্তন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ বেশ সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন নাই।* বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত লর্ড র‍্যালে, পূর্ব্বতন বৈজ্ঞা-নিকগণের মত আলোচনা ও বিষয়টির নানারূপ পরীক্ষাদি করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে বিম্বোৎপত্তি সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ও সারগর্ভ বিবরণ প্রচার করিয়াছিলেন। নানা তর্কবিতর্কের পর র‍্যালের প্রচারিত মতটি আজকাল সত্যমূলক বলিয়া পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে।

পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, পরিষ্কার ও অকলুষিত তরল পদার্থে প্রায়ই বুদ্বুদ্ লক্ষিত হয় না। পরিষ্কৃত জল ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া বহু চেষ্টা করিলেও, তাহাতে স্থায়ী বুদ্বুদ উৎপন্ন হয় না এবং অবিমিশ্র আল্‌কোহল বা ঈথরেও বিম্ব দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বোক্ত পরিষ্কার জল ও আল্‌কোহল্ যে কোন পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিলে বহু পরিমাণে স্থায়ী বুদ্বুদ উঠিতে থাকে—কর্পূরযুক্ত জলেও অনায়াসে এই প্রকার অনেক বিম্ব উত্থিত হইতে দেখা যায়। বুদ্বুদ-সম্বন্ধে এই সকল সহজসাধ্য পরীক্ষা এবং আরও অনেক উদাহরণাদি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—বিজাতীয়

* See Proceedings of the Royal Institute of Great Britain, March 1890.

পদার্থের সংমিশ্রণ ব্যতীত, কোনও তরল পদার্থে বিম্বোৎপত্তি হইতে পারে না। পানীয় জলাদি বিজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে কলুষিত কি না, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্বুদ পরীক্ষা দ্বারা সহজে মোটামুটি স্থির করা যাইতে পারে। মৃদু সঞ্চালনে জল হইতে স্থায়ী বুদ্বুদ উত্থিত হওয়া ইহার কলুষতার একটি প্রধান লক্ষণ। আমরা সমুদ্র ও নদী-জলে যে সকল স্থায়ী বিম্ব ভাসমান দেখি, তাহাও ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাবানের ন্যায় স্থায়ী বিম্বোৎপাদক নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ নদীজলে সর্ব্বদাই মিশ্রিত থাকে, ইহারই ফলে জল ফেনিল দেখায়। সমুদ্র জলে লবণ মিশ্রিত আছে জানিয়া লবণের অস্তিত্বই বুদ্বুদোৎপত্তির কারণ বলিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, বুদ্বুদোৎপত্তি-বিষয়ে লবণের কিছুই সহায়তা নাই, সমুদ্রজ শৈবালজাতীয় উদ্ভিজ্জের গলিতাংশ হইতে বিম্বোৎপত্তি হয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

তরল পদার্থে বিজাতীয় বস্তুর অস্তিত্বই যদি বিম্বোৎপত্তির কারণ হইল,—কি প্রকারে এই কার্য্য হয়, তাহা এখন আলোচ্য। সকলেই দেখিয়াছেন, বিম্বমাত্রই সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; পরিষ্কার জল ও ঈথরের নিমেষকাল-স্থায়ী বিম্ব এবং সাবানের স্থায়ী বুদ্বুদেও উক্ত আবরণ দৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম আবরণ যতই দৃঢ় ও চাপসহনশীল হইবে, বিম্বের স্থায়িত্বও তত অধিক হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, তরল পদার্থের সূক্ষ্মাবরণের প্রকৃতিগত বৈষম্যই, বিম্বোৎপত্তি ও তাহার স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ।

তরল পদার্থমাত্রেরই মুক্তাংশের উপরিভাগ পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এই আবরণের একটি বিশেষ গুণ আছে; এক খণ্ড রবার টানিয়া ধরিলে যেমন ইহা সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করে—তরল পদার্থের সূক্ষ্মাবরণেরও এই প্রকার একটি আকুঞ্চনপ্রবণতা

দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট তরল পদার্থে, এই গুণ সর্ব্বদাই সম পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহার অস্তিত্ব নানা সহজসাধ্য উপায়ে বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। সাবানজলস্থ একটি বুদ্বুদ মধ্যে, ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম কাচের নল প্রবিষ্ট করিলে বিম্বস্থ বায়ু নলের মুক্ত প্রান্ত দিয়া সবেগে বহির্গত হয়; ইহা দেখিলে জলাবরণের যে একটি আকুঞ্চনগুণ আছে তাহা বুঝা যায় এবং ইহা দ্বারাই যে বিম্বস্থ বায়ু সবেগে নিষ্কাশিত হইল তাহাও সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ বিম্বাবরণের বহিঃস্থ' ও মধ্যস্থ উভয় অংশেরই অল্পাধিক আকুঞ্চন ক্ষমতা আছে—জলবিন্দু বা পাত্রস্থ স্থির তরল পদার্থাদিতে, আবরণের কেবল মাত্র বহিরংশেই আকুঞ্চনশক্তি দৃষ্ট হয়।

কোন নির্দ্দিষ্ট তরল পদার্থে সকল সময়ে যে, কেবল একটি-মাত্র আবরণ থাকে তাহা নয়: অপর পদার্থ সংমিশ্রণে, পৃথক্ আকুঞ্চনগুণসম্পন্ন একাধিক আবরণও থাকিতে পারে। জলে ভাসমান তৈলবিন্দুতে ইহার একটি বেশ উদাহরণ পাওয়া যায়। তৈল জল ও বায়ু এই পদার্থত্রয়ের সম্মিলনে, ভাসমান তৈলবিন্দুর বহির্ভাগে, তৈল ও বায়ু মধ্যে, ইহার নিম্নে জল ও তৈল মধ্যে এবং বাহিরে জল ও বায়ু মধ্যে, পৃথক্ গুণসম্পন্ন তিনটি আবরণ দৃষ্ট হয়। এই আবরণত্রয়ের আকুঞ্চন-শক্তি, যখন তৈলবায়ু ও তৈলজলের মধ্যস্থ আবরণদ্বয়ের আকুঞ্চন-শক্তির সমষ্টির সহিত সমান বা তদপেক্ষা অধিক হয়, তখন ইহা ক্ষুদ্র লেন্সের আকারে জলে ভাসিতে থাকিবে। কিন্তু সাধারণতঃ পরিষ্কার জল ও বায়ুমধ্যস্থ আবরণের আকুঞ্চনশক্তি অপর দুই আবরণের সমবেত শক্তি অপেক্ষা প্রায়ই অধিক দেখা যায়, এজন্য জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে প্রথমোক্ত আবরণ, শক্তির আতিশয্যবশতঃ তৈলবিন্দুকে টানিয়া, সমগ্র জলে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, কাজেই ইহা একস্থানে স্থির থাকিয়া ভাসিতে পারে না। তবে আমরা যখন

ক্ষুদ্র তৈলবিন্দুকে জলের অত্যল্পস্থান অধিকার করিয়া ভাসিতে দেখি, তখন তাহার অপর কারণ থাকে। সমগ্র জল তৈলাচ্ছাদিত না হইয়া, কেবল একস্থানে তৈল ভাসিতে দেখা, পরিষ্কার জলে কিছুতেই সম্ভব নয়। যে জল পূর্ব্বে বিজাতীয় পদার্থযুক্ত বা তৈল সংমিশ্রিত হইয়া, উপরিস্থ আবরণের আকুঞ্চন ক্ষমতা কমাইয়া তাহাকে তৈলবিন্দুস্থ আবরণদ্বয়ের সমবেত শক্তির সহিত সমান করিয়াছে, তাহাতেই কেবল তৈলবিন্দু ব্যাপ্ত না হইয়া ভাসিতে পারে। কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাগণ একটি ক্ষুদ্র পাত্রে জল রাখিয়া অনায়াসে ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন।

এখন পূর্ব্ববর্ণিত সহজ পরীক্ষা এবং আরো অনেক উদাহরণ দ্বারা দেখা যায় যে,—বিজাতীয় পদার্থ দ্বারা কলুষিত হইলে, তরল পদার্থের আবরণের স্বাভাবিক আকুঞ্চনশক্তি অনেক হ্রাস হয় এবং ইহারই ফলে বিম্বোৎপত্তির অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ আকুঞ্চনশক্তি হ্রাস হওয়ায়, বিম্বাবরণে অধিক টান থাকে না, কাজেই ইহা চাপসহনশীল হইয়া উঠে এবং সহজে ছিন্ন হয় না।

বিজাতীয় পদার্থ সংযোগে, সূক্ষ্মাবরণের আকুঞ্চনশক্তির বৈলক্ষণ্যের আরো দুই একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, প্রশস্ত পাত্রস্থ নির্ম্মল জলে, কর্পূর নিক্ষেপ করিলে, ভাসমান কর্পূর-কণা জীবন্ত কীটের ন্যায় নানা গতিতে সবেগে জলের উপরে বিচরণ করিতে থাকে,—অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে ইহা কর্পূর সংযোগে জলাবরণের আকুঞ্চনশক্তির হ্রাসের ফলমাত্র। প্রশস্ত পাত্রের সর্ব্বাংশে কর্পূর পরিব্যাপ্ত হইতে না পাইয়া, ইহা কেবল নিকটস্থ জলভাগের আকুঞ্চনশক্তি হ্রাস করে, কাজেই দূরস্থ জলাবরণের শক্তির আধিক্যপ্রযুক্ত টান পাইয়া সেগুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। জলকে কোন প্রকারে কলুষিত বা তৈলাক্ত করিয়া তাহার আকুঞ্চন শক্তির হ্রাস করিলে, কর্পূরের গতি এককালে বন্ধ হইয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত ঝটিকাকালে সমুদ্রজলে তৈল নিক্ষেপ দ্বারা স্রোতের প্রকোপ প্রশমিত করিয়া, ঝটিকার অনিষ্টকারিতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আজকাল যে একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাও *জলাবরণের উপর, তৈলের প্রভাবের ফল বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। ঝটিকাকালীন উদ্বেলিত সমুদ্রজলে তৈল নিক্ষেপ করিলে ইহা চতুর্দ্দিকে* বিস্তৃত হইয়া, আবরণের আকুঞ্চন শক্তি দ্বারা, তৈলব্যাপ্ত জলে এক প্রকার টান উৎপাদন করে, এবং ইহারই ফলে জল সম্পূর্ণ স্থির হইয়া এক সমতলে থাকিবার জন্য চেষ্টা করে। কাজেই এই টানের বিরুদ্ধে প্রবল বায়ুবেগও সহসা স্রোত উৎপন্ন করিতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কলুষিত তরল পদার্থে, আবরণের আকুঞ্চন শক্তি হ্রাস হওয়ায়, বিম্বাবরণে টান থাকে না, এইজন্য সহজে বিম্বোৎপত্তি হয় ;—ইহা বিম্বোৎপত্তি ও তাহার স্থায়িত্বের কারণ বটে, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, এতদ্ব্যতীত আরো কারণ আছে। কলুষিত তরল পদার্থ বা সাবানজলের সর্ব্বাংশে আকুঞ্চনশক্তি সমান থাকে না, এজন্যই বিম্ব অধিক কাল স্থায়ী হয়। আবরণের আকুঞ্চনশক্তি সর্ব্বাংশে সমান থাকিলে, ইহা বিম্বাকারে কিছুতেই শূন্যে দাঁড়াইতে পারিত না, স্বীয় ভারে আপনিই জলে লীন হইয়া যাইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ ভেদে, তরল পদার্থের আবরণের আকুঞ্চন-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে ; একই পদার্থের যে অংশ বিজাতীয় পদার্থ যোগে অধিক কলুষিত, তাহার সেই অংশের আকুঞ্চনশক্তি অপরাংশ অপেক্ষা অনেক কম। বিম্বাবরণের ঊর্দ্ধাংশ অপেক্ষা, অধোভাগে বিজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। এ জন্য তাহার নিম্নাংশ অপেক্ষা, অল্প কলুষিত ঊর্দ্ধাংশের আকুঞ্চনশক্তি অধিক হইয়া পড়ে এবং ইহারই ফলে বিম্বও অধিক কাল স্থায়ী হয়।

লর্ড কেল্‌ভিন্‌

লর্ড কেল্‌ভিন্

মানুষ কখনই চিরজীবী হয় না। সুতরাং অশীতিপর বৃদ্ধ লর্ড কেল্‌ভিন্ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও অপরিমেয় শক্তিকে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া জীবনের সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন মৃত্যু যদি তাঁহাকে তাহার শান্তিময় উদার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভের কারণ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, ডারুইন, ম্যাক্সওয়েল, হক্সলি ও টিনডাল্‌ প্রভৃতির মৃত্যুর পরও অতীত ও বর্ত্তমানের চিন্তা ও ভাবের মধ্যে যে নিগূঢ় বন্ধন রক্ষা হইয়া আসিতেছিল, লর্ড কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে বুঝি বা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। নানা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিজ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যেমন এক মহাদোষ, বাহিরের নানা অবান্তর ব্যাপার ও আবর্জ্জনাকে তাহার ভিতরে স্থান দেওয়াও ততোধিক মহাদোষ। লর্ড কেল্‌ভিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত নিষ্কলুষ ছিল। এই মহারথীর অভাবে সার্ অলিভার লজ্ প্রমুখ নব্য নেতাদিগের দ্বারা ইংলণ্ডের পরীক্ষাগারে মার্কিনভূতের আবির্ভাব অসম্ভব হইবে না। এই ভৌতিক নৃত্যে নিউটন্ হার্সেলের কর্ম্মক্ষেত্র ইংলণ্ডের পূর্ব্ব পবিত্রতা ও মহিমা কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা এখন নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

রাজার মৃত্যুতে রাজসিংহাসন শূন্য থাকে না, এবং ব্যূহবদ্ধ সমাজে অধিনায়কের অভাব হইলে, অধিনায়ক আপনা হইতে আসিয়া শূন্যস্থান অধিকার করে। কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিনের মত রাজা ও অধিনায়ক

কোথায়? যে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার অপূর্ব্ব সম্মিলন লর্ড কেল্‌ভিন্‌কে বৈজ্ঞানিকসমাজের নেতৃত্ব দিয়াছিল, ইংলণ্ডে কোন পণ্ডিতেই ত তাহা দেখা যাইতেছে না। আধুনিক বিজ্ঞানকে যাঁহারা নিজের হাতে গড়িয়া মহিমাময় করিয়াছেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা তাঁহাদের তিন চারিটিকে হারাইয়াছি। রসায়নবিৎ মেণ্ডেলিফ্ এবং ফরাসী পণ্ডিত কোরি ও বাঁৎলোর মৃত্যুতে য়ুরোপের বিভিন্ন দিক্ হইতে সত্যই এক একটি দিক্‌পালের পতন হইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে য়ুরোপের আর এক দিক্ হইতে যে, আর একটি দিক্‌পালের পতন হইল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

লর্ড কেল্‌ভিন্ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতাও একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুকাল গণিতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ইনিও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই প্রকার পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পুত্র যে সুশিক্ষিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেল্‌ভিন্ দশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসরে কেম্‌ব্রিজের শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বহু সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জড়তত্ত্বের গবেষণার উপযোগী ভাল পরীক্ষাগার ইংলণ্ডে মোটেই ছিল না। কেম্‌ব্রিজের অবস্থা তখনো খুব শোচনীয়। নিউটনের সময়ে পরীক্ষাগারের অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহার তখনকার অবস্থা প্রায় তদ্রূপই রহিয়া গিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিতদিগের সুযশ এই সময়ে জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক কেল্‌ভিন্ তাঁহার সেই অদম্য জ্ঞানলিপ্সায় চালিত হইয়া বিজ্ঞানের সেই কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক রেনো (Regnault) তখন পূর্ণ উদ্যমে জলীয় বাষ্পের তাপরক্ষার ব্যাপার লইয়া গবেষণায় নিরত। লর্ড

কেল্‌ভিন ইহাঁরি অধীনে কিছুদিন পরীক্ষাগারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে তাঁর আর অধিক দিন থাকা হইল না। এক বৎসরেরর মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসরকাল লর্ড কেল্‌ভিন্ ঐ অধ্যাপকের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন, এবং যে সকল মহাবিষ্কার ইঁহাকে অমরত্ব দিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তিনি গ্লাস্‌গোর অধ্যাপকের আসন হইতে জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। গত অৰ্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এক কেল্‌ভিনেরই জন্য গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক জগতের এক মহাতীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিন্ অধ্যাপকজীবনের প্রারম্ভেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণ ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর বয়ঃকাল নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইতেছিলেন, পৃথিবী সহস্র কোটী বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই গণনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাপক্ষয় দ্বারা এখনকার শীতল অবস্থায় আসিতে পৃথিবী কত বৎসর অতিবাহন করিয়াছে তাহা স্থির করিবার জন্য গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গণনায় পৃথিবীর বয়স দশকোটী বৎসরের অধিক হইল না। এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত লর্ড কেল্‌ভিনের অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এবং শেষে কেল্‌ভিন্‌ই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে বুঝিয়াছিল, লর্ড কেল্‌ভিন্ সাধারণ অধ্যাপক নহেন!

তাপ ও কার্য্যের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ (Thermodynamics) আজ বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত, লর্ড কেল্‌ভিন্‌ই তাহার

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মেয়ার, জুল ও কার্নো (Carnot) প্রভৃতির সহিত লর্ড কেল্‌ভিন্‌ও এই আবিষ্কারে সমান যশোভাক্‌ বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া তাপসম্বন্ধীয় আরো অনেক গবেষণা ও আবিষ্কারে ইনি অসাধারণ প্রতিভার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। ১৮৫৫ সালে যখন সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার কল্পনা চলিতেছিল, লর্ড কেল্‌ভিন সেই সময়ে গণনা করিয়া দেখাইলেন, তারের দৈর্ঘ্য যতই অধিক হয় সঙ্কেত চলাচলে ততই বিলম্ব আসিয়া পড়ে। গণনার ফলে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ কেল্‌ভিনের গণনার প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেল্‌ভিন কাহারো কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তড়িৎপ্রবাহের অত্যল্প পরিবর্ত্তন ধরিবার উপযোগী কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অতি অল্পদিন মধ্যে বার্ত্তাবহনের উপযোগী ভাল তার, এবং অতি সূক্ষ্ম তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র (Mirror Galvanometer) উদ্ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপারে বার্ত্তাবহন যাহারা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, কেল্‌ভিনের কৃতকার্য্যতায় তাঁহারা অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই সময়ে লর্ড কেল্‌ভিন কর্ত্তৃক বিদ্যুৎ ও চুম্বক-সম্বন্ধীয় আরো অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অপর কোনও নূতন যন্ত্র অদ্যাপি সেই সকল পুরাতন যন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে নৌচালনার উপযোগী ভাল দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের বড় অভাব ছিল, এবং অভ্রান্তরূপে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এই দুইটি ব্যাপার লইয়া অনেক পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন। শুনা যায় এক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রটিকেই নির্ভুল ও সুব্যবস্থিত করিতে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল! কিন্তু ইহার ফলে

যে নূতন যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। চলিষ্ণু জাহাজ হইতে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের উপযোগী যন্ত্রও এই সময়ে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি এই দুই যন্ত্র প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ডাল্‌টন্ (Dalton) কর্ত্তৃক আণবিক-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে, পদার্থবিশেষে অণুগুলি কি প্রকারে সজ্জিত থাকে এবং অণুর পরস্পর ব্যবধানই বা কি, জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় খুঁজিয়া পান নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্ এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় বাইশ বৎসর হইল এই গবেষণার ফল প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু আজও তাহার বিবরণী পাঠ করিলে কেল্‌ভিনের অত্যাশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শন ও অসাধারণ গণিতজ্ঞান দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকা যায় না। ঈথর-সাগরে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ তুলিয়া আলোক যখন কাচ বা অপর কোনও স্বচ্ছপদার্থের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তখন তাহার গতির দিকের পরিবর্ত্তন (Refraction) ঘটে। পদার্থস্থ অণুগুলিই বাধা দিয়া ঈথরতরঙ্গকে এই প্রকারে বাঁকাইয়া দেয় বলিয়া জানা ছিল। লর্ড কেল্‌ভিন আলোকবিশেষের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং তাহার গতির দিক্ পরিবর্ত্তনের মাত্রা অতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করিয়া, পদার্থের অণুর আয়তন নির্দ্ধারণের এক সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তা' ছাড়া কৈশিকাকর্ষণের (Capillary Attraction) সাহায্য লইয়াও তিনি অণুর আয়তন নির্দ্ধারণের আর একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক ইঞ্চিকে আড়াই লক্ষ সমানভাগে বিভক্ত করিলে যে এক অতি সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, এই হিসাবে পদার্থের অণুগুলির ব্যাস তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিনের এই সূক্ষ্ম গণনা লইয়া অনেকে পরবর্ত্তী কালে অনেক নাড়া-

ছাড়া করিয়াছেন, কিন্তু গণনার অণুমাত্র ভুল পাওয়া যায় নাই। এ সকল দেখিয়া মনে হয়, এ প্রকার সূক্ষ্ম গণনা কেল্‌ভিনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁহার অসীম অধ্যবসায় ও অত্যাশ্চর্য্য গণিতজ্ঞান তাঁহার প্রত্যেক গবেষণাকে সাফল্য দিয়াছে।

লর্ড কেল্‌ভিনের প্রধান গবেষণাগুলির মধ্যে কেবল দুই একটি উল্লেখ করা গেল মাত্র। ইহা ছাড়া তিনি আরো যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ও সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। পঞ্চাশ বৎসরে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রায় তিনশত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন! বলা বাহুল্য, প্রত্যেক প্রবন্ধই এক এক নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিত। জড়বিজ্ঞানের কোন শাখাই তাঁহার গবেষণা হইতে বাদ পড়ে নাই। জড়ের উৎপত্তিতত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন গাণিতিক ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া জলের কল প্রস্তুত করা প্রভৃতি ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। সকল বিজ্ঞানেই তিনি এ প্রকার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আর মুছিবার নহে। বিধাতা যেমন তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদগুলি দ্বারা ভূষিত করিয়া কেল্‌ভিন্‌কে জগতে পাঠাইয়াছিলেন, জগতের লোকও সেই সকল আশীর্ব্বাদের সমুচিত সম্মান দেখাইতে ভুলে নাই। মান ও ঐশ্বর্য্য অযাচিতভাবে তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিল। দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেশবিদেশের বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজমাত্রেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপাধিগুলি কেল্‌ভিন্‌কে দান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার আপনা হইতেই আমাদের নজরে পড়ে। মনে হয়, অনেক প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে

মানুষের প্রাত্যহিক কার্য্যে লাগাইতে যেন ঘৃণা বা অপমান জ্ঞান করিতেন। বড় বড় প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের জীবনের নানা কার্য্যে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা হাতেকলমে কাজ করার কৌশল তাঁহারা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। সুতরাং ঐ ভাবটা তাঁহাদের বুদ্ধির জড়িমাপ্রসূত নয়। কাজেই স্থানকালপাত্রের এক অদ্ভুত সম্মিলনজাত ঘৃণা বা অপমান-বোধকেই তাহার উৎপত্তি বলিতে হয়। কথিত আছে মার্সিলসের (Marcellus) এর নৌবাহিনী সিরাকিউসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে জানিয়া, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তুলনায় নৌবাহিনীর ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ। বলা বাহুল্য আর্কিমিডিসের নৌ-চালনযন্ত্র তখন প্রস্তুতই হয় নাই, কেবল কাগজেকলমে তাহার উপযোগিতা দেখিয়া, তিনি মার্সিলসের নৌবাহিনীকে অকিঞ্চিৎকর সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহারি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানকে কাজে লাগাইবার জন্য রাজা হায়রোকে (Hiero) কত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, পাঠক তাহার গল্প অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইউডক্সস্ (Eudoxus) ও আকাইটাস্ নামক দুইজন প্রাচীন পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে জ্যামিতিকে ব্যাবহারিক জ্যামিতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই জ্যামিতিকে পুঁথির পাতা হইতে বাহির হইয়া মুটে মজুর ও কলকারখানার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো তখন জীবিত ছিলেন। এ পর্য্যন্ত যে শাস্ত্র কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীরই সম্পত্তি ছিল, তাহার এই দুর্দ্দশা তাঁহার সহ্য হয় নাই। প্লেটো পরুষ ভাষায় ঐ স্বেচ্ছাচারীদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনে এই দুঃসহ পাণ্ডিত্যাভিমান এখন আর মোটেই নাই। ইঁহারা একাধারে কঠোর তপস্বী ও অক্লান্তকর্ম্মী।

লর্ড কেলভিনের জীবনে বৈজ্ঞানিকদিগের এই আধুনিক আদর্শটি সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জড়তত্ত্বের অতি গূঢ়রহস্যের সুমীমাংসার জন্য তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন মুনির ন্যায়ই গবেষণানিরত দেখা যাইত, এবং স্বাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে সাংসারিক কাজে লাগাইবার সময় তিনি সাধারণ শ্রমজীবীরই মত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। বাঁৎলো, ল্যাংলে ও টিন্‌ডাল্ প্রভৃতি অনেক স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে স্বহস্তে নানা কার্য্যে লাগাইয়া মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় কেহই লর্ড কেল্‌ভিনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। নব নব যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া ইনি জগতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়।

আত্মশক্তির উপর সন্দেহ ও বিশ্বাসের শিথিলতা মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায়। ইহারা ঘাড়ে চাপিলে মানুষ কোনক্রমে মাথা তুলিতে পারে না। লর্ড কেল্‌ভিনের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি এই দুই শত্রুকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন, এবং জয় করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। ছাত্রগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় লর্ড কেল্‌ভিন শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কোন ছাত্র তাঁহার কোন উক্তিতে অবিশ্বাস করিলে তিনি বোর্ডের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিতেন,—"এই উক্তি আমার নয়, যে শাস্ত্রকে মানুষ প্রথম জ্ঞানোন্মেষের দিন হইতে অভ্রান্ত বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, সেই গণিতশাস্ত্রই তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে।"

আজ কয়েক বৎসর হইল, কোন বৈদ্যুতিক গবেষণা করিতে গিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ দেখিয়াছিলেন যে, যে তড়িৎপ্রবাহের স্পর্শে প্রাণীর জীবন সংশয় হয়, অবস্থাবিশেষে দেহের ভিতর দিয়া তাহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রবাহ চালাইলে প্রাণীর কোনই অনিষ্ট হয় না।

এই প্রকার একটা ব্যাপারে তিনি প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনঃপুনঃ গণনা করিয়া যখন হিসাবের ভুল বাহির হইল না, তখন আর তিনি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ছাত্রমণ্ডলীকে ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু এই জীবনসংশয় পরীক্ষার জন্য কেহই প্রস্তুত হইতে পারিলেন না। শেষে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া অবিচলিত চিত্তে নিজের শরীরের ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইয়া দিলেন! প্রবাহ তাঁহার শরীরে একটুও বেদনা দিল না। ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"তোমরা কখনো বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব ও গণিতের মূলসূত্রগুলিতে অবিশ্বাস করিও না। এই অবিশ্বাসই কৃতিত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়।" এই অটল বিশ্বাসই কেল্‌ভিনকে এত বড় করিয়াছিল।

মনুষ্যসৃষ্টি

মানুষ যে হঠাৎ একদিন তাহার হস্তপদ ও জ্ঞানবুদ্ধি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। যে দিন বিধাতার অনন্ত শক্তির এক ক্ষুদ্র কণা জড়ে প্রবিষ্ট হইয়া নির্জীবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই মনুষ্যসৃষ্টির আরম্ভ। কত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকারে জীবের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন বটে, কিন্তু পৃথিবীর শৈশব জীবনেরই কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে প্রাথমিক জীবের স্বেচ্ছা সঞ্চলনে যে, ধরাবক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রাথমিক জীবকেই মনুষ্যের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং সেই জড়বৎ জীব কোন্ ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া বৃক্ষলতা পশুপক্ষী এবং নরবানর ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাথমিক জীবের সৃষ্টিকে মনুষ্যসৃষ্টির প্রারম্ভ বলা অসঙ্গত নয়।

জীবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, বাহিরের নানা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজেকে ঠিক্ রাখাই জীবের প্রধান ধর্ম্ম। তাপ, আলোক, বায়ুর চাপ, ভূমধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নানা প্রবল প্রাকৃতিক শক্তি পদার্থের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়। গোড়ার খবর লইলে বলিতে হয়, ইহারাই নানা আকারে কাজ করিয়া পৃথিবীকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সদ্যসৃষ্ট জীবটির উপর যখন এই সকল প্রাকৃতিক শক্তি প্রবলভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন টিকিয়া

থাকিবার জন্য যে, জীবাঙ্কুরটিকে বহু চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু সেই জড়যুগে আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র জীবগুলির হাতে কোন্ অস্ত্র দিয়া নিজের পথ নিজে কাটিয়া লইবার পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। এই সময়ের সন্ধিবিগ্রহের ইতিহাস চিরদিনই আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে।

দেশের প্রাচীন ইতিহাস যখন লোপ পাইয়া যায়, চতুর ঐতিহাসিক পণ্ডিত অস্পষ্ট শিলালিপি এবং জীর্ণ মন্দিরের স্থাপত্যনৈপুণ্য পরীক্ষা করিয়া ইতিহাসহীন যুগের অনেক তত্ত্বের উদ্ধার করিয়া থাকেন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণও এই উপায়ে তামসাচ্ছন্ন জড়যুগের এক ইতিহাস দাঁড় করাইয়াছেন। তখনকার প্রাকৃতিক অবস্থার কথা মনে রাখিয়া এবং ভূপ্রোথিত শিলাময় জীবকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া ইঁহাদিগকে জীবের পুরাতত্ত্ব লিখিতে হইয়াছে। আধুনিক মানুষ প্রাকৃতিক উপদ্রবকে কৃত্রিম উপায়ে দমন করিয়া চারিদিকটাকে তাহার জীবনের এত অনুকূল করিয়া রাখিয়াছে যে, এখন একবার মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে জীবনটা শেষ পর্য্যন্ত বেশ সহজেই কাটিয়া যায়। ইতর জীবগণ জীবনরক্ষার এই সুবিধাটুকু হইতে বঞ্চিত। তাই বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেই ইহাদের জীবনের অনেকটা সময় ব্যয়িত হইয়া যায়। প্রাথমিক জীবগণ আধুনিক ইতর জীবের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ছিল, সুতরাং ইহাদিগকেও যে, বাহিরের শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। এই অবস্থায় অনুকূল শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিষ্ঠুর প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করা ব্যতীত আর উপায় থাকে না। প্রাথমিক জীবের জীবনের অনেক সময় এই প্রকার সংগ্রামেই কাটিয়া গিয়াছিল। তার পরও শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার নাই দেখিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষার
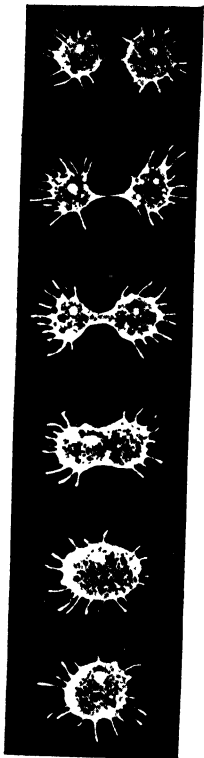
প্রাথমিক প্রাণী আমিবা

আদিম সমুদ্রচর প্রাণী

কোন স্থায়ী উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা করিতে হইয়াছিল। প্রবল শত্রুপক্ষের বাণবর্ষণে যখন যোদ্ধার ধনু ভগ্ন হইয়া যায় এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায় তূণীর শূন্য হইয়া পড়ে, তখন নিজের দেহপ্রাণ অক্ষত রাখিবার জন্য তাহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। পার্শ্বচর শরীররক্ষকের স্কন্ধে যে কঠিন বর্ম্ম সঙ্কটকালের জন্য রাখা হইয়াছিল, তাহার প্রতি তখন যোদ্ধ্‌বরের দৃষ্টি পড়ে। সেই কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া দাঁড়াইলে বিপক্ষের বাণ বর্ম্মে ঠেকিয়া শতধা হইয়া পড়িয়া যায়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির নিষ্ঠুরতার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জীবকে ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বর্ম্ম প্রস্তুত ছিল না, নিজের শরীরকে রূপান্তরিত করিয়া ইহারা বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাইত। এক কোষময় প্রাথমিক জীব দ্বিধা খণ্ডিত হইতে হইতে যে অসংখ্য সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিত তাহাদের মধ্যে সকলগুলিই মূলজীবের ছাঁচে না জন্মিয়া নানাকারণে বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিত। এই বিকলতা মহাভারতের বীর কর্ণের সহজ কবচের ন্যায় কার্য্য করিলে প্রাকৃতিক উপদ্রব তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না। জীবনসংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া যে সকল জীব নানাযুগে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মহাবীর কর্ণের ন্যায়ই সহজ কবচধারী হইয়া জন্মিতে হইয়াছিল।

জীবের এই ক্রমপরিবর্ত্তন পৃথিবীর কেবল শৈশবজীবনেরই ঘটনা নয়, বাহিরের প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, জীবও সেইপ্রকার নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া জাতির পর জাতি সৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও এই পরিবর্ত্তনের ধারার বিরাম নাই। ইহার অন্ত কোথায়, এবং ইহা কোন্ দিক্ লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।

ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার হওয়ার পর শত্রুকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জীবকে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই। এই স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই মনুষ্য প্রভৃতি উন্নত প্রাণী কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিয়া এখন সহস্র প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতেছে। প্রাচীন জীবের এই ইচ্ছাশক্তির লেশমাত্র ছিল না। বাহিরের উদ্দাম প্রকৃতির চালনায় শরতের মেঘের ন্যায় তাহাকে নানা আকার পরিগ্রহ করিতে করিতে লক্ষ্যহীন অবস্থায় চলিতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যাহারা ঘটনাবৈচিত্র্যে কুপথ অবলম্বন করিয়াছিল, মৃত্যুর গ্রাস হইতে তাহারা রক্ষা পায় নাই। ভাগ্যক্রমে যাহারা সুপথের পথিক হইয়াছিল, কেবল তাহারাই ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক মানবজাতি সেই আদিম জীবের কোন এক সুপথগামী বংশধর হইতেই জন্মিয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া জড়বৎ অপকৃষ্ট জীব শেষে মানবের ন্যায় উন্নত প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্র।

আদিম জীবের উৎপত্তির পর তাহার বংশধরগণ দুইটি পৃথক জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন যুগের আকাশ এখনকার মত পরিষ্কার ছিল না। তখন এখনকার তুলনায় আকাশে অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত। এক জাতি কেবল অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিয়া শরীর পোষণ করিত, এবং অপরটি অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিত। অঙ্গারক বাষ্পে অঙ্গার ও অক্সিজেন যুক্তাবস্থায় থাকে। উভয়ই জীবদেহ গঠনের খুব উপযোগী হইলেও, মুক্ত অক্সিজেন জীবকে যেমন কর্ম্মকুশল করে, অঙ্গারক বাষ্প সেপ্রকার করে না। অঙ্গারক বাষ্পগ্রাহী জীবের এইখানেই উন্নতির পথ রোধ হইয়া পড়িয়াছিল। অক্সিজেনগ্রাহী জীব যখন উন্নতির পথে চলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের অঙ্গারকবায়ুভোজী সহোদরগণ

ঠিক একস্থানে দাঁড়াইয়া কিপ্রকারে বহু অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিতে হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিল।

অক্সিজেনভুক জীব বহুকাল একই আকারে থাকিতে পারে নাই। বহিঃপ্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া ইহারা সমেরুদণ্ড ও অমেরুদণ্ড (Vertebrate and Invertebrate) এই দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক যুগে এই দুই জাতির মধ্যে অমেরুদণ্ড জীব পৃথিবীতে খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মাকড়সা মধুমক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি তাহাদেরি বংশধর। ইহারা বহিঃপ্রকৃতির সহিত নিজেদের মিলাইয়া যেমন অনায়াসে চলাফেরা করে, অপর কোন জীবই সেপ্রকার পারে না। সমাজবন্ধনের কৌশলে ইহারা সমগ্র ইতর জীবের শীর্ষ-স্থানীয়। এই সকল আলোচনা করিলে বলিতে হয় যে, যে সমেরুদণ্ড জাতি হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এককালে উন্নতির পর্য্যায়ে অমেরুদণ্ডজাতির অনেক নীচে ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও আজকাল এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতেছেন।

অমেরুদণ্ডজাতি প্রথমে দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে চলিয়া শেষে তাহাদের সমেরুদণ্ড ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে নাই। মেরুদণ্ডের অভাবে দেহের চর্ম্মকে ইহারা ইন্দ্রিয়াদি রক্ষার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়া একটা মহা ভুল করিয়াছিল, এবং এই ভুলই তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিপথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্থূলচর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকায় আকারে বৃহত্তর হইবার চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাদিগকে সেই আবরণকে বিদীর্ণ করিতে হইত। অদ্যাপি কাঁকড়া চিংড়ি মাছ প্রভৃতি অমেরুদণ্ড জীব এইপ্রকারে চর্ম্মবিদীর্ণ করিয়াই বাড়িয়া থাকে। সমেরুদণ্ড জীবের দেহস্থ অস্থি যে কাজ করে, অমেরু-দণ্ড প্রাণিগণ তাহাদের দেহের কঠিন আবরণ দ্বারা ঠিক সেই কাজ করাইয়া লয়। দেহের প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলি ঐ আবরণে

আবদ্ধ থাকে ; কাজেই চর্ম্মত্যাগ করার পর নূতন চর্ম্ম বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। বৎসরে দুই তিনবার করিয়া যদি মানুষকে দেহের অস্থি ত্যাগ করিতে হইত, এবং নূতন অস্থিগুলিকে অঙ্কুরিত ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য যদি দুই তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিতে হইত, তাহা হইলে মানুষ কখনই এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। অমেরুদণ্ড জীব দৈহিক উন্নতির জন্য চর্ম্মত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া, ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইহারা যে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিত, লুপ্তচর্ম্ম হইয়া পড়িলে অনভ্যাসে তাহার প্রায় সকলি নষ্ট হইয়া যাইত।

অমেরুদণ্ডজাতির মধ্যে কতকগুলি জীব চর্ম্মত্যাগের পূর্ব্বোক্ত অসুবিধাটা বুঝিয়া উন্নতির আশায় চর্ম্মত্যাগ হইতে বিরত হইয়াছিল। কিন্তু এই সুবুদ্ধিও তাহাদের ভবিষ্যৎ পথ নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চর্ম্মত্যাগ অভ্যাস পরিহার করায়, ইহাদের সকলকেই অল্পায়ু ও ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট হইয়া জন্মিতে হইত, এবং যাহারা জোর করিয়া দেহের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা করিত তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনটা পুনঃপুনঃ দেহের পরিবর্ত্তন করিতেই কাটিয়া যাইত।

আধুনিক রেসমকীট এবং নানা জাতীয় পতঙ্গগুলিই পূর্ব্বোক্ত জীবের বংশধর। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উন্নতির পথ নির্ব্বাচনে যে ভ্রম করিয়াছিল, তাহারি ফলে অদ্যাপি ইহারা ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট ও অল্পায়ু হইয়া জন্মিতেছে, এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই দেহপরিবর্ত্তন করিয়া কাটাইতেছে। বলা বাহুল্য এই প্রকার ক্ষুদ্র জাতি কখনই বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধির জন্য বৃহৎ মস্তিষ্কের প্রয়োজন। ক্ষুদ্রদেহে সে প্রকার মস্তিষ্কের স্থান নাই। পিপীলিকার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের

শক্তি বৃহৎ মানবমস্তিষ্কের তুলনায় হীন নয় বলিয়া একটা কথা আছে। একথাটা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তাহা নানা পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

বংশানুক্রমে বহুকাল একই কার্য্য অবিচ্ছেদে করিতে থাকিলে, কাজের ভিতরকার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিবার শক্তি সেই বংশের একটা বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। নানা জাতীয় জীবের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি এবং জ্ঞান ঠিক এই প্রকারের ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া শেষে সেগুলি জাতিগত সম্পদ্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জীবকে তাহার ক্ষুদ্রজীবনে দুই তিনবার দেহপরিবর্ত্তন করিতে হয়, সে কখনই অবিচ্ছেদে কোন একটা কার্য্য করিবার অবসর পাইতে পারে না। কাজেই ইহাতে তাহার বুদ্ধিও স্ফূর্ত্তি পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। পরিবর্ত্তনশীল দেহ লইয়া পতঙ্গজাতিকে ঠিক এই কারণেই অল্পবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হইয়াছে। রেসমের কীট যখন সুঁয়োপোকার আকারে থাকে, তখন তাহাকে কেবল বৃক্ষপত্র আহার করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয়। এই অবস্থায় ইহারা নানাশত্রুর গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুস্বাদু পত্র উদরস্থ করিবার কৌশল শিখিয়া ফেলে। কিন্তু সেই পোকাগুলিই যখন সুদীর্ঘ নিদ্রার পর গুটি কাটিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের পূর্ব্বের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কোন কাজেই লাগে না। এই অবস্থায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নূতন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া নূতন উপায়ে আহার সংগ্রহের জন্য শিক্ষা করিতে হয়। [illegible] পূর্ব্বাপর জীবনের কোন অভ্যাসই তাহাদের [illegible] প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিকে উন্নত করিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত বি[illegible] অমেরুদণ্ড জীব প্রথমে তাহা[illegible]য়া শেষে নিজেই

পিছনে পড়িয়াছিল, তাহারা আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার যে কয়েক উপায় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কোনটিই উহাদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর করে নাই। যে সকল প্রাণী কোমলদেহে কঠিন মেরুদণ্ড পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষে কেবল তাহারাই জয়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

সমেরুদণ্ড জীব বহুকাল জলচর প্রাণীর আকারে সমুদ্রে বিচরণ করিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে ইহাদেরি কতকগুলি স্থলচর হইয়া দাড়াইয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই পরিবর্ত্তনের নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে চন্দ্রের আকর্ষণকে যাহারা প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদেরি কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ইহারা বলেন, অতি প্রাচীনকালে যখন চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে ছিল, তখন তাহার প্রবল টানে সমুদ্রজলে অত্যন্ত অধিক জোয়ার-ভাঁটা হইত। এই জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জলচর জীব স্থলে উঠিত, ভাঁটার জলের সঙ্গে তাহাদের সকলগুলিই সমুদ্রে পড়িত না। এই প্রকারে কতকগুলি জীবকে প্রতিদিনই দুইবার করিয়া স্থলবাসী হইতে হইত। হঠাৎ প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়া পড়িলে, প্রতিকূলতাকে অনুকূল করিয়া লওয়াই জীবের জীবত্ব। কাজেই সাধারণ জলচর জীব যে শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে জলের ভিতরকার অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকিত, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে স্থলে আসিয়া পড়িলে তাহা দ্বারা বায়ুর অক্সিজেন সংগ্রহ করা যাইত না। এই প্রয়োজনেই জলচরের ফুল্‌কোকে (Gill) অলস করিয়া রাখিয়া নূতন শ্বাসযন্ত্র [illegible] ([illegible]) উৎপত্তি করিয়াছিল।

সমেরুদণ্ড জলচর জীব [illegible] প্রকারে স্থলচর জীবে পরিণত হইয়া ক্রমোন্নতির [illegible]া, এখন আলোচনা করা যাউক। জলচর জ[illegible]ল প্রথমেই তাহার

মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা আমাদের চোখে পড়ে। এই অসম্পূর্ণতার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। যে জাতি আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ হাতের

স্থলচর প্রাথমিক প্রাণী

গোড়ায় পাইয়া একঘেয়ে জীবন অতিবাহন করে, তাহার মস্তিষ্কের বিকাশ কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। সর্ব্বদাই প্রায় সমোষ্ণ জলে বিচরণ করিয়া জলচরগণ জীবনকে খুবই একঘেয়ে করিয়া তুলিয়াছিল। শীতাতপ ঝড়বৃষ্টির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদিগকে মোটেই বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হইত না, এবং আহার্য্যও প্রচুর পরিমাণে হাতের গোড়ায় সঞ্চিত থাকিত। কাজেই জলকে স্থায়ী আবাসস্থান রূপে নির্ব্বাচন করাই ইহাদের সর্ব্বনাশের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদেরি যে সকল বংশধর হঠাৎ স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল, উন্নতি কেবল তাহাদেরি নিকট সুলভ হইয়া আসিয়াছিল।

স্থলচর হইয়া জীবগণ বহুদিন একভাবে চলিতে পারে নাই। শীঘ্রই আর এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। স্থলচরগণ অবস্থাবিশেষে পড়িয়া পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এই দুই পৃথক্ জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জাত্যন্তর পরিগ্রহের কারণ নির্ণয় করিতে

গেলে, রক্তসঞ্চলন-পদ্ধতি ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তন অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ স্থলচরদিগের মধ্যে যাহাদের হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের আয়তনও প্রসারিত হইয়াছিল, তাহারা আর পূর্ব্বের প্রকৃতি রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে নাই। বৃহৎ ফুস্‌ফুসের সাহায্যে পরিষ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ রক্ত সর্ব্বদাই তাহাদের ধমনীতে চলিত। তা'ছাড়া দেহাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের যোগে প্রবলভাবে রাসায়নিক কার্য্য সুরু হওয়ায়, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের তুলনায় তাহাদের শরীরের তাপও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছিল। এই প্রকারে নবশক্তিযুক্ত হইয়া নূতন জীবগণ অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই। সেই সময়ে সমগ্র ভূভাগ জলচর জীব হইতে উৎপন্ন মহাকায় সরীসৃপ (Reptiles) দ্বারা আকীর্ণ ছিল। ইহাদেরি সহোদরগণ যখন নূতন শক্তি এবং উন্নত প্রকৃতি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিল, তখন নূতন পুরাতনে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। নূতন জীব প্রচুর অক্সিজেন দেহস্থ করিয়া যে শক্তির সঞ্চয় করিত, তাহাই উহাদিগকে মহাকায় সরীসৃপদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিত। ক্ষিপ্রতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিযোগিতায় পুরাতন নূতনকে পরাভব করিতে পারিত না। ইহা ছাড়া এই সময়ে নূতন জাতিতে আর যে একটি শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পুরাতনকে আরো পশ্চাতে রাখিয়াছিল। পুরাতন জীবগণ বংশবিস্তারের জন্য অণ্ড প্রসব করিত, তাহাদেরি সন্তানদিগের শরীরে যখন উষ্ণ শোণিতধারা বহিতে লাগিল, তখন এই সৌভাগ্যবান্ বংশধরগণ অণ্ড প্রসব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া জীবন্ত শাবক প্রসব করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারটি নূতন জীবগুলিকে মনুষ্যত্বের দিকে এত অধিক অগ্রসর করিয়াছিল যে, মূল জীবের মনুষ্যত্বলাভের আশায় এখানেই জলাঞ্জলি পড়িয়াছিল।

নূতন জীব নিঃসহায় শিশুসন্তানগুলিকে প্রসব করিয়া প্রথম প্রথম বড়ই গোলযোগে পড়িত। শাবকগুলিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করা তাহাদের জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইত। জীব-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, সন্তানরক্ষার এই চেষ্টাই জীবগণকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। অনেক সময় দেখা যায়, কোন বিশেষ উন্নতির জন্য যখন সকল অবস্থাই অনুকূল, তখন প্রকৃতি সেই উন্নতিপথ রোধ করিবার জন্য মোহিনী বেশে আসিয়া জীবকে বিপথগামী করিয়া দেয়। নিঃসহায় শাবকগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য যখন জীবগণ ব্যস্ত, তখন কাহারো উদরের নিম্নে চর্ম্মপুট নির্ম্মাণ করিয়া বা কাহারো লাঙ্গুলে শাবক ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং প্রকৃতি জীবগণের চিন্তা দূর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাঙ্গারু প্রভৃতি জীব প্রকৃতির এই অযাচিত দান গ্রহণ করিয়া চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অপর জীবগণ মোহিনী প্রকৃতির মায়ায় ধরা দেয় নাই। ইহারা নৈসর্গিক উপায় ত্যাগ করিয়া, স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে শাবকরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল।

শাবকদিগকে স্তন্যদান করিলেই পিতামাতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। শিক্ষা-প্রদানেরও প্রয়োজন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বংশ-ধরদিগকে জানাইবার যে, একটুও আবশ্যক আছে, ইহার পূর্ব্বে কোন জীবই তাহা ভাল করিয়া অনুভব করে নাই। নিঃসহায় শিশুসন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি জীবগণ এই ব্যাপারটির প্রয়ো-জনীয়তা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই জ্ঞান এবং পূর্ব্বোক্ত স্বাধীন চিন্তার চেষ্টা স্তন্যপায়ীদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে জাতি বা যে ব্যক্তি জীবনের সমগ্র

আবশ্যক সামগ্রী সর্ব্বদাই সম্মুখে প্রস্তুত দেখিতে পায়, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা অতি অল্পই থাকে। পক্ষিজাতি ও স্তন্যপায়িগণ একই মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল, এবং উষ্ণ শোণিত-ধারায় উভয়েরই দেহ শক্তিশালী হইত। সুতরাং এই অবস্থায় উভয়েরই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইবারই কথা। কিন্তু পক্ষিজাতি উন্নতির পথ ধরিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত বিঘ্নটি আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহারা অতি অল্পকাল মধ্যে শরীরের অনেক উন্নতি করিয়াছিল। অদ্যাপি ইহাদের উন্নতদেহের নিকট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকেও পরাভব মানিতে হয়। কিন্তু শরীররক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার সকলি সম্মুখে প্রস্তুত পাইয়া তাহারা বুদ্ধিচালনার সুযোগই পায় নাই। ইহাই মনুষ্যত্বের সোপানে উঠিবার পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছিল। দৈহিক পূর্ণতার সহিত কোন প্রকারে যদি বুদ্ধির পূর্ণতা আসিয়া যোগ দিত, তাহা হইলে পক্ষিজাতি যে কি আশ্চর্য্য জীবে পরিণত হইত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

যাহা হউক সুপথগামী স্তন্যপায়িগণ ইহার পর কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে আরো অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। এই পথ আবিষ্কারের জন্য আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্গণকে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছিল। গবেষণাকারীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন একবাক্যে বলিতেছেন, মহাকায় সরীসৃপ দ্বারা আচ্ছন্ন পৃথিবীতে ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হইলে, ঐ সকল বৃহৎ জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্তন্যপায়ীদিগকে নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। সে সময় বৃহৎ বৃক্ষের অভাব ছিল না। জীবতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবই আধুনিক অপোসম্ (Opossum) প্রভৃতি প্রাণীর আকার ধারণ করিয়া বৃক্ষচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূ-তত্ত্ববিদ্-

গণও এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতেছেন। অতি প্রাচীন শিলাস্তরে যে সকল জীবের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলিকেই বৃক্ষচর বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষচর প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করিলে, গাছ আঁক্‌ড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহাতে কেবল দুইটিমাত্র সুব্যবস্থা দেখা যায়। কতকগুলি প্রাণী তাহাদের দীর্ঘ নখ দিয়া শাখাপ্রশাখা আঁক্‌ড়াইয়া বৃক্ষে বাস করে। অপর কতকগুলি তাহাদের অঙ্গুলিগুলিকে দীর্ঘ করিয়া ডাল ধরিবার সুবিধা করিয়া লয়। কোন্ প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া সাধারণ স্তন্যপায়ী জীব ক্রমে দীর্ঘনখী বা দীর্ঘাঙ্গুলি প্রাণীতে পরিণত হইয়াছিল তাহা এখন স্থির করিবার উপায় নাই। তবে সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতেই যে, উক্ত দুই শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত, এবং প্রতিযোগিতায় নখিগণকে পরাস্ত করিয়া অঙ্গুলিযুক্ত বৃক্ষচরগণই যে, মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও স্থির।

নখীদিগের নখই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। নখ দ্বারা ভাল করিয়া বৃক্ষশাখা আঁক্‌ড়াইয়া ধরা বড়ই কষ্টকর। দেহ পুষ্ট হইলে এই কার্য্য একেবারে অসম্ভবই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বৃহৎ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণী যতই পুষ্টাবয়ব হউক না কেন, অঙ্গুলি দ্বারা শাখা ধরিয়া সে অনায়াসে বৃক্ষে বিচরণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নখের এই অনুপ-যোগিতাই বৃক্ষচারী নখিগণকে ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া রাখিয়াছিল। অপর-দিকে দীর্ঘ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণিগণ ক্রমে দেহের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট করিয়া উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যে সকল মানসিক শক্তি মনুষ্যকে ইতরপ্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলির আলোচনা করিতে গেলে গণনাশক্তির কথা সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়িয়া যায়। পাঁচটি জিনিষের সহিত আর পাঁচটি জিনিষ যোগ করিলে, এই নূতন জিনিষগুলি যে পূর্ব্বের দ্বিগুণ হইয়া

পড়িবে, তাহা ধারণা করিবার শক্তি কেবল মনুষ্যজাতিরই নিজস্ব। এই জ্ঞানের উন্মেষতত্ত্ব লইয়া ডাক্তার ওয়ালেস্ ও ডারুইন্ প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। দুই একটি নব্য পণ্ডিত এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিতেছেন, পুষ্টাঙ্গ স্তন্যপায়িগণ যখন শাখী হইয়া বৃক্ষে বিচরণ করিতেছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়েই ইহাদের মস্তিষ্কে গণনাশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। শাখীপ্রাণিগণ যখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া পড়িত, তখন তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দূরত্বের একটা নির্ভুল হিসাব মনে স্থির রাখিতে হইত। এই হিসাবের ভুলে হয়ত প্রথমে অনেক প্রাণীকে ভূপতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহারা আর সে প্রকার ভুল করিত না। ইহা ছাড়া হস্ত পদের পেশীগুলিকে কত সঙ্কুচিত করিলে এক লম্ফে কতদূর পৌঁছান

মনুষ্য এবং বানরজাতীয় প্রাণীর অঙ্গুলির পার্থক্য

যায়, শাখী স্তন্যপায়ীদিগকে তাহারও একটা হিসাব করিতে হইত, শেষে হয়ত এই হিসাবগুলি তাহারা যন্ত্রবৎ করিত, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলিই যে স্তন্যপায়ীদিগের গণিত-জ্ঞানের উন্মেষ করাইয়া দিয়াছিল তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

যখন কোন প্রাণী একটি বিশেষ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, প্রায়ই অপর আর একটি শক্তি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র শক্তিসমষ্টিকে

পূর্ণ রাখে। ইহা একটা পরীক্ষিত প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্ধের শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং বধিরের দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকে মনে রাখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন মানবের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ স্তন্যপায়ীর আকারে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছিল, তখন সেই সকল প্রাণীতে আরো কতকগুলি মনুষ্যসুলভ শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। অনেক ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত অল্প! বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মানবের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ যখন শাখীর আকারে ছিল, তখন ধরাতলবিহারী প্রাণী-দিগের ন্যায় তাহাদের ঘ্রাণ বা দৃষ্টিশক্তির চালনা করিতে হইত না। কাজেই ব্যবহারের অভাবে এগুলি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া গিয়া অপর শক্তির উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই দুর্ব্বলতা বৃক্ষচর প্রাণীকে মনুষ্যত্বের দিকে যে, কত অগ্রসর করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ইহারা যখন কুকুরের মত গন্ধগ্রহণ করিয়া আহার্য্য অনুসন্ধানাদি করিতে পারিত না, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাবে দূরস্থ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যখন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আত্মরক্ষার অন্য উপায় না থাকায় বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এই পরিবর্ত্তনই ইহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধি-পরিচালনার কৌশল লইয়াই প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষবিহারী প্রাণী হইতে যখন হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্যাকৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন উহাদিগকে পশুপক্ষী বধ করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত। বলা বাহুল্য এই কার্য্য তাহাদের বুদ্ধিবিকাশের খুবই সাহায্য করিত। সমস্ত বৎসর ধরিয়া কোন স্থলেই হাতের গোড়ায় শিকার পাওয়া যায়

না। কাজেই বুদ্ধিমান্ শিকারীকে ভবিষ্যতের চিন্তা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। যাহারা এই চিন্তায় অনভ্যস্ত ছিল ক্ষুৎপিপাসা ও অনাহারে তাহাদের সকলকে সবংশে মৃত্যুমুখে পড়িতে হইত। এই প্রকারে কেবল একটিমাত্র উন্নতবুদ্ধি নরাকৃতি জাতি পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। ইহাকেই আধুনিক মানবজাতির পিতামহ বলা যাইতে পারে। এই অসম্পূর্ণ মানবই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া আধুনিক মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মনুষ্যসৃষ্টির ঠিক্ পূর্ব্বেকার ব্যাপারগুলি আলোচনা করিলে মনে হয়, অসম্পূর্ণ মানব কতকগুলি প্রাকৃতিক দানকে অব্যবহারে কার্য্যের অনুপযোগী করিয়া নিজের উন্নতি খুব দ্রুত করিয়া তুলিয়াছিল। এই স্বেচ্ছাকৃত নিঃসহায়তা মানুষকে ঘেরিয়া না দাঁড়াইলে, সেই মানুষ কখনই এতদিনে এখনকার মানুষে পরিণত হইতে পারিত না। সেই নিঃসহায়তাই মানুষকে গৃহবস্ত্র ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের কৌশল শিখাইয়াছে। মানুষ যদি পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতিদত্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত রাখিত, এবং তাহাদের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট হইয়া যথেচ্ছা গমনাগমন করিয়া সহজে আহার্য্য সংস্থান করিতে পারিত, তবে আজ আমরা মনুষ্যজাতিতে আধুনিক সভ্যতার লেশমাত্র দেখিতাম না, এবং উড়িবার কল আবিষ্কারের জন্য দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে চিন্তাকুল দেখিতাম না। প্রকৃতির বৈরিতাই পশুত্বে মনুষ্যত্বের আরোপ করিয়াছে।

জীবনটা কি ?

প্রবন্ধ-শীর্ষের এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়া পণ্ডিত-মূর্খ দার্শনিক-অদার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক কত লোকে যে, কত কথা বলিয়াছেন তাহার সীমা নাই। বোধ হয় যে দিন চিন্তা করিবার শক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই প্রশ্নটির সদুত্তরের জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজও তাহার উত্তর মিলিল না। ঘোর দার্শনিক তাঁর পাঁজি পুঁথি খুলিয়া হয় ত গম্ভীরভাবে বলিবেন, এই যে তুমি, আমি, ঘটপট যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই মায়ার রচনা। রসিক কবি হাস্যমুখে বলিবেন,

"নাঃ জীবনটা কিছু না,
একটা ইঃ একটা উঃ একটা আঃ"

কিন্তু ইহাতে ত মন বুঝে না। এই সংসারটা না হয় মায়াই হইল, এবং জীবনটা না হয় একটা ইঃ একটা উঃ এবং আর একটা আঃ হইয়া সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানটুকু দিয়া মনকে ত শান্ত করা যায় না। যে সকল জিনিষ জড়, কি প্রকারে তাহারা চেতনা পায় এবং কি প্রকারে তাহাদের ভিতরে জীবনের নানা অদ্ভুত কার্য্য চলিতে থাকে, মন তাহাই জানিতে চায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া প্রশ্নটা আসিয়া পড়িল বিজ্ঞানে। আধুনিক বিজ্ঞানে ইহার কি প্রকার উত্তর পাওয়া যায়, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আভাস দিব।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রশ্নটির উত্তর চাহিলে তাঁহারা

বলেন, দুগ্ধে 'দম্বল' অর্থাৎ দধিবীজ দিলে তাহা যেমন গাঁজিয়া উঠিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার রূপান্তর পাইয়াই জীবনের কার্য্য চলে। দুগ্ধে দধিবীজ দেওয়াই গাঁজানো বা মাতানোর (Fermentation) একমাত্র উদাহরণ নয়। ময়দা বা সুজীতে খামী দিয়া যখন আমরা পাঁউরুটি প্রস্তুত করি, ভাতে জল দিয়া আমরা যখন পান্তাভাত প্রস্তুত করি, তখনো আমরা ঐসব জিনিষকে গাঁজাই। বিজ্ঞানের মতে আমরা যাহাকে জীবন বলি, তাহা এই প্রকারের নানা গাঁজানো বা মাতানো লইয়াই চলে। কথাটা হঠাৎ শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার এত প্রমাণ আছে যে, ইহাকে সত্য বলিয়া মানিতেই হইতেছে।

কখনই কোন বৃহৎ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা একদিনে এবং এক জনের চেষ্টায় হয় নাই। কেহ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ সেগুলিকে একত্র করিয়াছেন, কেহ বা তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যুগযুগান্তের চেষ্টায় এই প্রকারেই এক একটি সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া যায়। আমরা যে সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহারও প্রতিষ্ঠা ঐ প্রকারে ধীরে ধীরে হইতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বহু শারীরতত্ত্ববিদের হস্তচিহ্ন ইহাতে ধরা পড়ে। যাঁহারা ইহার গোড়া পত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে, প্রথমেই ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত পাষ্টুরের (Pasteur) কথা মনে আসে। দুগ্ধে দধিবীজ দিলে বা ময়দায় খামী দিলে সেগুলি কেন গাঁজিয়া রূপান্তরিত হয়, ইহা লইয়া তিনি এক সময় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে জানিয়াছিলেন, এক প্রকারে অতিক্ষুদ্র জীব দুগ্ধে বা ময়দায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা যখন দধি প্রস্তুত করিবার জন্য দুগ্ধে 'দম্বল' দিই, তখন সেই জীবাণুরই কতকগুলি দুগ্ধে ছাড়িয়া দিই, তার পর সেগুলি বংশবিস্তার করিয়া সমস্ত দুগ্ধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে দুগ্ধ দধির

মূর্ত্তি গ্রহণ করে। কেবল ইহার নহে,—ওলাউঠা ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি *নানা রোগের মূলেও তিনি ঐকার জীবাণুর কার্য্য দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল রোগের জীবাণু মানুষ বা অপর প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ* করিয়া বংশবিস্তার করিতে থাকিলেই যে, প্রাণীর দেহে ঐ বিশেষ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। তা ছাড়া প্রাণীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখাতেও তিনি বিশেষ বিশেষ জীবাণুর কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পাষ্টুর পরম বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং রসায়নবিদ্যাতেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, জীবাণু দ্বারা মানুষের দেহে বা নানা জড়পদার্থে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। কিন্তু এই কথা প্রকাশ করিবার পাপ তিনি নিজস্কন্ধে লইতে সাহস করেন নাই। জীবনের কার্য্যের সঙ্গে যে, রাসায়নিক কার্য্যের কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা প্রকাশ করা সত্যই সে সময়ে পাপের বিষয় ছিল। খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণও তখন জীবনের কার্য্যকে একটা সৃষ্টিছাড়া রহস্য বলিয়া মনে করিতেন! পরীক্ষাগারে নানা পদার্থের যোগবিয়োগে আমরা যে-সকল ঘটনা ঘটিতে দেখি এবং যে প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষাৎ পাই, তাহা জীবশরীরের কার্য্যে কখনই চলে না, এই এক সংস্কার তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই প্রাণিদেহে জীবাণুর কার্য্য সম্পূর্ণ জৈব কার্য্য বলিয়াই স্থির হইয়া রহিল, ইহার সহিত রাসায়নিক কার্য্যের যে, কোন যোগ থাকিতে পারে তাহা আর কাহারও মনে হইল না।

পাষ্টুরের মৃত্যুর পর জর্ম্মানীতে বুক্‌নার (Büchner) নামক এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার স্বাধীন চিত্ত সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই। জীবাণুর কার্য্য গোড়ায় জৈব কার্য্য হইলেও তাহা যে, রাসায়নিক কার্য্য

তাহা তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল প্রচার করা নয়, হাতে হাতে তাহা দেখাইতেও লাগিলেন। 'দম্বল' বা অপর কোন খামী (Yeast) লইয়া তিনি সেগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; খামীর কোষগুলি (Cells) ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেগুলি হইতে এক প্রকার রস নির্গত হইতে লাগিল। বুক্‌নার এই রস পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, তাজা জীবাণুযুক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলে দুগ্ধ বা চিনির রস প্রভৃতিতে যে পরিবর্ত্তন হয়, ঐ সকল জীবকোষের রস দিয়াও অবিকল সেই পরিবর্ত্তনই সুরু হয়। লোকে বুঝিতে লাগিল জীবাণুর কার্য্যে জীবনীশক্তি নামক কোন রহস্য জড়িত নাই। ইহাতে জীবাণুগণ তাহাদের দেহে কি প্রকারে রস প্রস্তুত করে তাহা স্থির হইল না বটে, কিন্তু সেই রসই যে, নানা পদার্থের সহিত মিলিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া চালায় তাহাতে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। পাষ্টুর সাহেব, যে 'জীবনীশক্তি'র ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন নাই, তাহার ভিত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহার অব্যবহিত পরে বারট্রাণ্ড (Gabriel Bertrand) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাতে ইনি যে ফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের কার্য্য ও রাসায়নিক কার্য্যের একতা আরো সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। জীবনী-শক্তি ও রাসায়নিক শক্তির একতার কথা ইতিপূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লাভোসিয়ার দেখাইয়াছিলেন। পরীক্ষাগারে অক্সিজেন্ সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা যেমন কখন কখন বায়ুর নাইট্রোজেন্‌কে বর্জ্জন করিয়া অক্সিজেন্ গ্রহণ করি, প্রাণীর ফুস্‌ফুস্‌ও যে ঠিক সেই প্রকারেই অক্সিজেন্ সংগ্রহ করিয়া জীবনের কার্য্য চালায়, তাহা বহু-পূর্ব্বে এই লাভোসিয়ার সাহেবই প্রচার করিয়াছিলেন। বারটাণ্ড সাহেব দেখাইতে লাগিলেন, প্রাণীর ফুস্‌ফুসে এমন একটি জিনিষ আছে,

বায়ু হইতে অক্সিজেন্ সংগ্রহ করাই যাহার কাজ। তাপপ্রয়োগে তাহা নষ্ট হয়, এসিড্ বা বিষের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া লোপ পায়। ইহার প্রত্যেক কার্য্য পাষ্টুরের আবিষ্কৃত সেই খামীর (Yeast cells) কার্য্যের সহিত অবিকল মিলিয়া গেল। বারটাণ্ড সাহেব এই জিনিষটাকে (Oxydase) নামে অভিহিত করিলেন।

এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ও শারীরবিদ্‌গণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাষ্টুরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছিলেন, সদ্য অঙ্কুরিত বীজে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা বীজের শ্বেতসারকে (Starch) বিশ্লিষ্ট করিয়া অপর কতকগুলি নূতন পদার্থে রূপান্তরিত করে। প্রাণীর মুখের লালাতেও যে, ঐ প্রকার একটা পদার্থ মিশ্রিত আছে তাহাও সকলে জানিয়াছিলেন। তার পর প্রাণীর পাকাশয়ে পেপ্‌সিন্ (Pepsin) নামক একটা পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জিনিষটার গুণেই যে প্রাণীরা মাংস বা ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য আহার করিয়া হজম করিতে পারে, তাহাও সকলে দেখিয়াছিলেন। যকৃৎ হইতে প্রাণীর দেহে, যে পিত্ত-রস (Bile) নির্গত হয়, তাহা কি প্রকারে তৈলময় খাদ্যকে শরীরের কাজে লাগায় তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাকাশয়ের অপর রসগুলির কার্য্যের লক্ষণও বৈজ্ঞানিকদিগের জানা ছিল। পাষ্টুরের আবিষ্কার ও বারটাণ্ডের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে, কাজেই এই সকল তথ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। জীবদেহের নানারসের কার্য্যের সহিত পাষ্টুরের আবিষ্কৃত 'খামী'র কার্য্যের একতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু তথাপি 'খামী'র সজীব জীবাণু ও প্রাণিদেহের নানা রসের মধ্যে পার্থক্য রাখিবার জন্য, দেহ-রসগুলিকে নানা লোকে

নানা নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কেহ সেগুলিকে Enzymes কেহ বা তাহাদিগকে Zymases বলিতে লাগিলেন।

যখন পাষ্টুরের আবিষ্কৃত জীবাণুর কার্য্যের সহিত নানা শারীরিক কার্য্যের এই প্রকার ঐক্য একে একে ধরা পড়িতেছিল, তখন এক অভাবনীয় বাধা আসিয়া গবেষণার গতি রোধ করিয়া দিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, পাষ্টুরের সেই জীবাণুর কাজ কেবল জিনিষকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন শর্করায় আমরা বিশেষ জীবাণুযুক্ত খামী নিক্ষেপ করি, তখন শর্করা ভাঙ্গিয়া গিয়া মদ্য (Alcohol) এবং অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic Acid) উৎপন্ন করিতে থাকে। পাকাশয়ের পেপ্‌সিন্ নামক রসও ঠিক ঐ প্রকারেই উদরস্থ খাদ্যের মাংস ইত্যাদিকে ভাঙ্গিয়া নানা নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। কিন্তু জীবদেহে ভাঙ্গার সহিত অবিরাম যে গড়ার কাজও চলিতেছে তাহার ব্যাখ্যান কোথায়? কেবল ভাঙ্গা লইয়াই ত জীবন নয়,—ভাঙ্গা ও গড়ার অপূর্ব্ব যোগেই জীবনের কার্য্য। সুতরাং গাঁজানো (Fermentation) লইয়াই জীবন, এই কথা বলিয়া যাঁহারা জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইলেন, তাঁহাদিগকে কিছুদিনের জন্য নীরব থাকিতে হইল।

কিন্তু গবেষণার বিরাম হইল না,—নানা দেশে নানা বৈজ্ঞানিক গাঁজানোর কার্য্যে কোন নূতন জিনিষ গঠিত হয় কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত জিনিষে কত প্রকার খামী দিয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই সংগঠন দেখা গেল না। শেষে ইংরাজ রসায়নবিৎ হিল্ সাহেব (Croft Hill) এক পরীক্ষায় খামী দ্বারা প্রকৃত সংগঠন দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। শ্বেতসারে (Starch) খামী দিলে তাহা চিনি প্রভৃতি পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শ্বেতসারের এক কণিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ এই

পরিবর্ত্তনের বিরাম হয় না। শ্বেতসার নিঃশেষিত হইলে এই কার্য্যের লোপ ঘটে, এবং নূতন শ্বেতসার দিলে পুনরায় ঐ বিশ্লেষণ সুরু হয়। হিল্ সাহেব একটি পাত্রে শ্বেতসারের সহিত খামী (Malt Enzyme) মিশাইয়া, তাহাকে নিঃশেষে বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, এবং পরে তাহাতে ধীরে ধীরে চিনি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে দেখা গিয়াছিল, চিনির যোগে শ্বেতসারের আবার পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই পাষ্টুরের গাঁজানোর কার্য্যে যেমন পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটে, তাহাতে সেই প্রকারে নূতন পদার্থের যে সংগঠনও হইতে পারে, তাহা বুঝা গেল।

হিল্ সাহেবের এই আবিষ্কার অতি অল্প দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে, বোধ হয় দশ বারো বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু একমাত্র উদাহরণে বৈজ্ঞানিকগণ সন্তুষ্ট হইলেন না, নানা দেশের পণ্ডিতগণ নূতন উদাহরণ সংগ্রহের জন্য গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জর্ম্মানীর জনৈক খ্যিাত রসায়নবিৎ ইমারলিঙ্ সাহেব (Emmerling) আর একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ইনি বাদামের তৈলে একপ্রকার খামী দিয়া সেটিকে চিনি এবং হাইড্রোসাইনিক্ এসিড্ (Hydrocyanic Acid) নামক এক বিষ-পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পরেই তাহাতে আর একপ্রকার খামী (Malt Ferment) দিবামাত্র সেটি আবার বাদামের তৈলে পুনর্গঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই আবিষ্কারের পর হইতে প্রতি বৎসরেই খামীর যোগে আরো নূতন নূতন জিনিষের উৎপত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাষ্টুরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব পদার্থের বিশ্লেষণেই যে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, এক খামীর যোগে যেমন আমরা শ্বেতসারকে ভাঙ্গিয়া চিনি ইত্যাদিতে

বিশ্লিষ্ট করি এবং তার পর অপর কিছুর যোগে তাহাকে আবার শ্বেতসারে পুনর্গঠিত করি, প্রাণিদেহে অবিকল সেই প্রকারেই ভাঙ্গাগড়া অবিরাম চলিতেছে! কোন দেহজ খামী উদরস্থ আমিষ খাদ্যকে ভাঙ্গিতেছে, কেহ তৈলময় খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করিতেছে। তার পরে আর এক নূতন খামী ঐগুলির সঙ্গে মিশিয়া হয় ত এমন কতকগুলি জিনিষের গঠন করিতেছে, যাহা স্থায়িরূপে দেহেরই অংশ হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল আবিষ্কার দ্বারা শারীরতত্ত্ব যেন নূতন জীবন-লাভ করিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে যতই গবেষণা করিতেছেন, নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। আধুনিক শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, দেহের সূচ্যগ্র-প্রমাণ স্থানে কোটি কোটি জীবকোষ (Cells) অবস্থান করিতেছে। ইহাদের এক একটি কোষ এক একটি বৃহৎ বিজ্ঞানাগার বিশেষ। একই বিজ্ঞানাগারে বসিয়া যেমন বহু লোকে নানা পদার্থ প্রস্তুত করেন,—ঐ এক একটি কোষের ভিতরেই দশ বারোটি প্রকোষ্ঠে দশ বারো রকম খামী (Ferment) আপনা হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রয়োজন বুঝিয়া এই সকল রসই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে যোগ দেয় এবং জীবনের কার্য্য দেখায়। প্রাণীর যকৃতের এক একটি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম কোষে যে সকল খামী প্রস্তুত হয়, সেগুলির মধ্যে
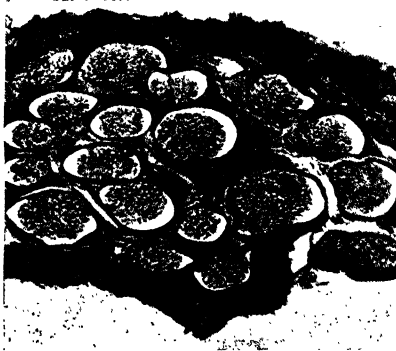
প্রাণিদেহের কোষ

কোনটি ইউরিয়া (Urea), কোনটি পিত্তরস এবং কোনটি নানাপ্রকার রঙ্ উৎপন্ন করিতে ব্যস্ত থাকে। আবার কতকগুলি দেহস্থ বিষ-পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে থাকে, কতকগুলি হয় ত পাকাশয়ে উৎপন্ন অম্লকে অপর পদার্থের সহিত মিশাইতে ব্যাপৃত থাকে। কেবল যকৃতে নয়, প্লীহা, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি দেহের সকল অংশে কোটি কোটি জীবকোষের এই প্রকার কার্য্য নিয়তই চলিতেছে। এমন কি মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুমণ্ডলীতেও এই প্রকার বিশেষ খামী জন্মিয়া ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া জীবনের কার্য্য দেখাইতেছে। সুতরাং দম্বলে দধির উৎপাদন এবং জীবনের কার্য্য একই বলিয়া আমরা প্রবন্ধারম্ভে যে-কথাটার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা যে নিরর্থক নয় এই সকল পরীক্ষা-দৃষ্ট ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে,—আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ জীবদেহের যে সকল খামীকে জীবনীশক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই Enzymes or Zymases জিনিষটি কি ? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু ইহার যথার্থ উত্তর দেওয়াই আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের সাধনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কত দেশে কত বৈজ্ঞানিক যে, নীরবে গবেষণা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। কোন্ শুভদিনে ইঁহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ঠিক্ বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাসায়নিক প্রথায় বিশ্লেষ করিলে সেই হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ এবং অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই ঐ সকল পদার্থে ধরা পড়ে না। কি প্রকারে এই সকল সুপরিচিত পদার্থ সংযুক্ত হইয়া জীবনীশক্তির প্রকাশ করে তাহাই বিজ্ঞানের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রসায়নবিদ্‌গণ যেমন অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্‌কে একত্র করিয়া

পরীক্ষাগারে জল প্রস্তুত করিতে পারেন, সেই প্রকারে যে দিন তাঁহারা অঙ্গার হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদিকে মিলাইয়া এক বিন্দু খামী (Ferment) বা একটি জীবকোষ প্রস্তুত করিতে পারিবেন সেই দিনই বিজ্ঞান ধন্য হইবে।

প্রাণিদেহের উত্তাপ

দেহকে উত্তপ্ত রাখা প্রাণীর একটা বিশেষত্ব। উদ্ভিদের দেহেও তাপ আছে, কিন্তু প্রাণিদেহে ইহা যেমন সুস্পষ্ট, উদ্ভিদের দেহে তেমন নয়। সাধারণ নির্জীব বস্তুকে কোন স্থানে রাখিলে, সেখানকার উষ্ণতা সে গ্রহণ করে। লৌহ-গোলককে রৌদ্রে রাখিলে সেটি রৌদ্রের উষ্ণতাই গ্রহণ করে; বরফে ডুবাইয়া রাখিলে বরফের উষ্ণতাই গোলকটির উষ্ণতা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ চারিদিকের বায়ু-মৃত্তিকার ন্যায় উষ্ণ হইবার একটা চেষ্টা নির্জীব পদার্থমাত্রেই আছে। সজীব বস্তু তাপের গ্রহণ-বর্জ্জনে এই নিয়ম মানিয়া চলে না। নানাজাতীয় প্রাণীর মধ্যে প্রত্যেকেরই দেহে এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা আছে। সেই উষ্ণতাকে রক্ষা করিয়া যখন চলা-ফেরা করিতে পারে, তখনি প্রাণী সুস্থ থাকে। কোন কারণে উষ্ণতার ন্যূনাধিক্য ঘটিলেই বুঝিতে হয়, তাহারা অসুস্থ। সুস্থ মানুষের দেহের উষ্ণতার মাত্রা ফার্ণহিটের যন্ত্রের প্রায় সাড়ে আটানব্বুই ডিগ্রি। খুব শীতল বা গরম স্থানে রাখিলেও সুস্থ মানবদেহের উষ্ণতা এই সীমার উপরে উঠে না এবং নীচেও নামে না। যদি সেই সাড়ে আটানব্বুই কখন নিরানব্বুই হইয়া দাঁড়ায়, তখন বুঝিতে হয় মানুষ অসুস্থ। সুস্থ মানবদেহেরই যে, উষ্ণতার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নয়, আণুবীক্ষণিক জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অতিকায় হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি সকল জীবেরই দৈহিক তাপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রাণিদেহের তাপরক্ষার বিষয়টা প্রাচীন পণ্ডিতদিগেরও দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছিল। জলস্থল ও আকাশের কোন স্থূল ঘটনাই মহাপণ্ডিত আরিষ্টটলের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। সেই অবৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনারই তিনি এক একটা সহজ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেন। প্রাণিদেহের উষ্ণতা-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, কাঠ পোড়াইয়া বা কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া আমরা যে তাপ উৎপন্ন করি, তাহা শারীরিক তাপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাকাশের অধিবাসী জ্যোতিষ্কগণ যে অগ্নি ধারণ করিয়া আছে, তাহারি দুই এক স্ফুলিঙ্গ প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়াই তাহা এত উষ্ণ। মহাকাশের জ্যোতিষ্কদিগের অত্যাশ্চর্য্য গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আরিষ্টটল্ তাহা-দিগকে বুদ্ধিমান্ জীবের পর্য্যায়ে ফেলিতেন।

এই ত গেল দেহতাপের পুরাবৃত্তের কথা। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অক্সিজেনের অস্তিত্ব জানিতেন না। কাঠ ও কয়লা ইত্যাদির দহনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, ইঁহারা বায়ুতে মিশ্রিত কোন এক দাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতেন এবং তাহাই কাঠ ও কয়লাকে পোড়ায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। প্রাণিদেহের তাপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিতেন, সাধারণ দাহ্য পদার্থ যেমন বায়ুতে পুড়িয়া তাপের উৎপত্তি করে, বায়ুতে মিশ্রিত সেই অজ্ঞাত পদার্থ ভুক্তদ্রব্যকে দেহের অভ্যন্তরে পোড়াইয়া সেই প্রকারে দেহকে উষ্ণ রাখে। প্রিষ্ট্‌লি ও ল্যাভোসিয়ার্ কর্ত্তৃক অক্সি-জেনের আবিষ্কার হইলে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, বায়ুর অক্সিজেনই দাহ্য-পদার্থের অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইবার সময়, যে তাপের উৎপত্তি করে তাহাই অগ্নির তাপ। অগ্নি-তাপের এই ব্যাখ্যানে দেহ-তাপেরও উৎপত্তি নির্ণীত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিক-গণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাধারণ দাহ্যবস্তুর উপাদান যেমন

বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া তাপের উৎপত্তি করে, ভুক্তদ্রব্যের অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্ ঠিক্ সেইপ্রকারে অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া দেহ-তাপের সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অক্সিজেনের আবিষ্কার হইলে দেহজ তাপের এই সিদ্ধান্তটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও মূলে ইহাকে স্বীকার করিতেছেন। ল্যাভোসিয়ার সাহেব বলিতেন, প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রই তাপের উৎপত্তি-স্থান; শোণিতের সহিত সেই তাপ সর্ব্বাঙ্গে চালিত হইলে দেহ উত্তপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, তাপোৎপত্তির স্থান-সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তটিকে এখন আর কেহ স্বীকার করেন না। মাংসপেশী (Muscles) এখন শারীরিক তাপের কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে; এবং তন্মধ্যে হৃৎপিণ্ড যকৃৎ প্রভৃতির পেশীতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই পরিমাণে অধিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও যে, রক্তহীন মাংসপেশী তাপের উৎপত্তি করে, জর্ম্মান্ পণ্ডিত হেলম্‌হোজ্ একাধিক পরীক্ষায় তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। ভেকের দেহ হইতে নিঃশেষে সমস্ত রক্ত বহির্গত করিয়া, শিরায় উপশিরায় লবণের জল চালাইতে থাকিলে, দেহের উষ্ণতা কমে না; সুস্থ অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যেমন অঙ্গারক বাষ্প বাহির হয়, এখানেও তাহা সেই প্রকারেই বাহির হইতে থাকে। রক্তের সহিত যে দেহের উষ্ণতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তাহা এই পরীক্ষায় বেশ বুঝা যায়।

দেহের উষ্ণতা লইয়া প্রাণিজাতিকে উষ্ণশোণিত (Homoiothermic) এবং শীতলশোণিত (Poikilothermic) নামক যে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যে-সকল প্রাণী চারিপার্শ্বের উষ্ণতা অনুসারে দেহের উষ্ণতাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, সেগুলি শীতলশোণিত প্রাণী নামে পরিচিত।

সর্প, সরীসৃপ, ভেক, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। স্তন্য-পায়ী প্রাণী বা পক্ষিজাতি খুব ঠাণ্ডা বা গরমে পড়িলেও দেহের উষ্ণতাকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে বা নীচে যাইতে দেয় না। এই জন্য ইহারা উষ্ণশোণিত প্রাণী বলিয়া পরিচিত। কেবল দেহের উষ্ণতা দেখিয়া প্রাণিজাতির এই শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত থাকিলেও, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আজকাল এ বিভাগকে বিজ্ঞানসম্মত বলিতে চাহেন না। মধুমক্ষিকা পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত। উত্তাপ পরীক্ষা করিলে ইহা-দিগকে শীতলশোণিত প্রাণীর দলে ফেলিতে হয়। কিন্তু ঘোর শীতের সময়েও মৌ-চাকের ভিতরকার উষ্ণতাকে বাহিরের উষ্ণতা অপেক্ষা প্রায় সত্তর ডিগ্রি অধিক দেখা যায়। ভেক বা মৎস্যকে ঈষদুষ্ণ জলে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের দেহের উষ্ণতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জলের অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভেক, সর্প প্রভৃতি যেমন শীতকালে মৃতবৎ হইয়া নিদ্রা যায়, শীতপ্রধান দেশের অনেক স্তন্যপায়ী সেই প্রকার দীর্ঘ শিশিরসুপ্তি (Hibernation) উপভোগ করে। উষ্ণশোণিত প্রাণী হইলেও, এই সময়ে ইহাদের দেহের উষ্ণতা স্পষ্ট কমিয়া বাহিরের বায়ুর উষ্ণতার সমান হইয়া দাঁড়ায়। তা' ছাড়া মানবশিশু পক্ষিশাবক প্রভৃতিও যে শীতলশোণিত প্রাণীর ন্যায় দেহ-তাপকে নিয়মিত করিতে পারে তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কাজেই সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়া শীতলশোণিত ও উষ্ণশোণিত এই দুই ভাগে প্রাণীকে ভাগ করা চলে না; করিতে গেলেই সঙ্কটে পড়িতে হয়।

যাহা হউক কি প্রকারে প্রাণিদেহে তাপের উৎপত্তি হয় এখন আলোচনা করা যাউক; এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেহকে একটা যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কাঠ বা কয়লার যে শক্তি সুপ্তাবস্থায় (Latent) থাকে, বাষ্পযন্ত্রের চুল্লীতে

পোড়াইতে আরম্ভ করিলে তাহাই জাগ্রত তাপ-শক্তিতে পরিণত হইয়া কলকে চালায়। প্রাণিদেহের ভিতরে পড়িয়া ভুক্ত দ্রব্যের সুপ্ত শক্তিও ঠিক সেই প্রকারে জাগিয়া উঠে এবং দেহকে উত্তপ্ত করিয়া ও শরীরের পেশীগুলিকে চালাইয়া উদাহরণের কয়লার শক্তির ন্যায়ই আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করে। বাষ্পযন্ত্র ও দেহযন্ত্রের আকার প্রকার ও গঠনোপাদানে অসাদৃশ্য অমিল থাকিলেও, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে উভয়ই যন্ত্র।

আমাদের টাকাকড়ির জমাখরচে, জমার অঙ্ক কখন কখন খরচের অঙ্ক অপেক্ষা ছোট হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতির জমাখরচে এই ফাজিল হিসাবের স্থান নাই। যে শক্তি লইয়া হিসাব পত্তন করা হয়, খরচের খতিয়ানে তাহার কড়াক্রান্তির অমিল দেখা যায় না। যে পরিমাণ শক্তি কয়লায় সুপ্ত থাকে, পোড়াইবার সময় ঠিক তাহাই তাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শক্তিতে পরিণত হয়। জমাখরচে সুপ্ত ও জাগ্রত শক্তির মধ্যে একটুও অমিল দেখা যায় না। কোন ক্ষুদ্র প্রাণীকে তাপ-পরিমাপক (Calorimeter) যন্ত্রের ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া সেটি ঘণ্টায় কত তাপ উৎপন্ন করিতেছে হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, পরীক্ষা-কালে সে যতটা ভুক্ত দ্রব্য হজম করে, তাপের পরিমাণও সেই অনুসারে বাড়িয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাঠ বা কয়লাকে কলে ফেলিয়া জ্বালানো ও খাদ্যদ্রব্যকে উদরে ফেলিয়া হজম করা একই ব্যাপার। দাহ্য বস্তুতে যে শক্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে, পোড়াইতে গেলে যেমন তাহার অধিক এক কণা শক্তিও প্রকাশ পায় না, তেমনি ভুক্ত দ্রব্যের যে অংশটাকে পরিপাক করা হয় তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির অধিক এক কণাও দেহে উৎপন্ন হয় না। কয়লার দহন ও খাদ্যের হজম, এই দুয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, দহনে দাহ্য বস্তুর সুপ্তশক্তি অতি অল্পকাল মধ্যে জাগ্রত হইয়া পড়ে, হজমে ভুক্ত দ্রব্যে সেই শক্তি বন্ধনমুক্ত হইতে অধিক সময় লয়। এই জন্যই

পোড়াইবার সময় সমগ্র শক্তিকে অল্পকাল মধ্যে একত্র পাইয়া আমরা তাপের মাত্রাকে অধিক দেখি এবং জঠরানলে বহুক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া ভুক্ত দ্রব্য যে তাপ বাহির করে তাহার পরিমাণকে অল্প মনে করি। খাদ্য হজম করিবার কলটিকে প্রকৃতিদেবী যদি বাষ্পযন্ত্রের চুল্লীর মত করিয়া গড়িতেন, তবে ভুক্ত দ্রব্য উদরে পড়িয়া কয়লার মত অল্প সময়ের মধ্যে পুড়িয়া ভয়ানক তাপের উৎপত্তি করিত। তখন মানুষ, গরু, ঘোড়া এবং ছাগল প্রত্যেকেই এমন এক একটা বিকট জীব হইয়া দাঁড়াইত যে, খাবার হজমের সময়ে তাহাদের নিকটে দাঁড়ানো দায় হইত।

বাষ্পযন্ত্রকে চব্বিশ ঘণ্টা অবিরাম চালাইলে তাহা কয়লা পোড়াইয়া যত তাপ উৎপন্ন করিল, তাহা গণনা করা যায়। ভুক্ত দ্রব্য অক্সিজেন ইত্যাদির সহিত মিশিলে হজমের সময় যে দহন আরম্ভ হয়, তাহাতে কত তাপ উৎপন্ন হয় তাহা স্থির করাও কঠিন নয়। এক সের জলকে সেণ্টিগ্রেডের এক ডিগ্রী পরিমাণে উষ্ণ করিতে যে তাপের প্রয়োজন তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, সুস্থ মানুষ চব্বিশ ঘণ্টায় দেহে যে তাপ উৎপন্ন করে, তাহাতে তিন হাজার সের, (পঁচাত্তর মণ) জলকে অনায়াসে এক ডিগ্রী পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ত্রিশ সের বরফের ন্যায় শীতল জলকে ঐ তাপে ফুটাইতে পারা যায়। কোন কারণে যদি দেহের সমবেত তাপের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহা দ্বারা শরীরের কার্য্য চালানো দায় হয়; মাল গাড়ীর এঞ্জিনের মত তখন দেহ-যন্ত্রটা কোন গতিকে চলাফেরা করে মাত্র।

কলের চুল্লীতে যত ভাল কয়লা পোড়ানো যায়, কাজও তত ভাল হয়। অল্প ছাই রাখিয়া যাহা প্রায় নিঃশেষে পুড়িয়া যায়, তাহাই ভাল কয়লা। পাথর ও নানা আকরিক পদার্থ মিশানো কয়লা পুড়িবার

সময়ে অতি অল্প তাপ উৎপন্ন করিয়া স্তূপীকৃত ভস্মে পরিণত হয়। নিকৃষ্ট কয়লার এক মণে যে কাজ পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট কয়লার আধ মণেই হয় ত সেই কাজ হয়। দেহের কলে তাপ উৎপন্ন করিবার জন্য আমরা খাদ্যাকারে যে ইন্ধন যোগাই, তাহারো ভালমন্দ আছে। অর্দ্ধসের চাউলের দাহনে দেহ-যন্ত্রে যে তাপের উৎপত্তি হয়, অর্দ্ধ ছটাক ভাল খাদ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তাপ জন্মাইতে পারা যায়। কোন্ খাদ্য হজম হইবার সময়ে কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে, তাহার একটা হিসাব স্থির করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাবে জানা গিয়াছে, পনর গ্রেণ ওজনের মাংস হজম হইবার সময়ে যে তাপ নির্গত করে, তাহাতে প্রায় দুই সের ওজনের জলকে সেণ্টিগ্রেডের এক ডিগ্রী পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঠিক্ সেই পরিমাণ ঘৃত বা চর্ব্বি হজম করিলে তাপের পরিমাণ উহার দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমাদের প্রধান আহার্য্যগুলির এই প্রকার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে, সুগৃহিণীগণ স্বাস্থ্যবিধানের উপরেও একটু দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

কোন্ খাদ্য হইতে কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, তাহা মোটামুটি স্থির থাকিলেও খুঁটিনাটিতে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ লিবিগ্ (Liebig) সাহেব আমাদের সাধারণ খাদ্যকে মাংসবর্দ্ধক ও তাপবর্দ্ধক এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করিতেন। এই বিভাগ অনুসারে আমিষ খাদ্য মাংসবর্দ্ধক এবং শ্বেতসার (Starch) চিনি ও তৈল ঘৃতাদি তাপবর্দ্ধক বলিয়া আজও স্বীকৃত হইতেছে। তবে লিবিগ্ সাহেব আমিষ খাদ্যকে কেবলি মাংসবর্দ্ধক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করিতেছেন না। ইঁহাদের মতে, আমিষের কোন অংশই বৃথা যায় না। ইহাতে যে নাইট্রোজেন্ থাকে তাহা দেহের ক্ষয় পূরণ করে এবং তার পরে

নাইট্রোজেন্-বর্জ্জিত যে অংশটা অবশিষ্ট থাকে উহা তাপোৎপত্তির কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

আমাদের দেহে নিয়ত যে তাপের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার কত ভাগ কি প্রকারে দেহ হইতে নির্গত হয়, ইহারও একটা মোটামুটি হিসাব করা হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায়, সমবেত তাপের শতকরা ৭৩ ভাগ দেহ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পার্শ্বের বায়ুকে উত্তপ্ত করে এবং ২২ ভাগ শ্বাসযন্ত্র ও চর্ম্মের জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করে। ইহার পর যে পাঁচ ভাগ অবশিষ্ট থাকে, কেবল তাহাই প্রশ্বাসের বায়ু ও মলমূত্রাদিকে গরম করিতে ব্যয়িত হয়। কম্বল বা অপর পশমী বস্ত্র গায়ে জড়াইলে কেন উষ্ণতা অনুভূত হয়, দেহনির্গত তাপের কথা মনে করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। পশমী বস্ত্র তাপের পরিচালক নয়; কাজেই এই প্রকার কাপড়ে শরীর আবৃত রাখিলে পূর্ব্বোক্ত শতকরা ৭৫ ভাগ তাপ দেহ ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে পারে না;—শরীরের চারি পাশের বায়ুতেই তাহা আবদ্ধ থাকে। এই কারণেই পশমী কাপড় গরম কাপড় নামে খ্যাত।

সভ্য মানুষ এত শিল্পকুশলী হইয়াও শিল্পনৈপুণ্যে অদ্যাপি প্রকৃতির সমকক্ষ হয় নাই। প্রাণীর দেহ কেবলমাত্র যন্ত্র নয়, এপ্রকার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আর একটি যন্ত্র ইউরোপ বা আমেরিকার কোন কারখানায় মেলা ভার। আজকাল আমরা যে-সকল বাষ্পযন্ত্রকে খুব ভাল বলি, তাহাতে কয়লা পোড়াইলে কয়লার শক্তি শতকরা বারো ভাগ মাত্র চাকা ইত্যাদি ঘুরাইয়া কাজ করে, অবশিষ্ট ৮৮ ভাগ তাপ ইত্যাদির আকার গ্রহণ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই অপচয় বড় কম নয়। প্রকৃতির স্ব-হস্তনির্ম্মিত যন্ত্রে যে অপব্যয় নাই, একথা বলা যায় না; কিন্তু বাষ্প-যন্ত্রের অপচয়ের তুলনায় ইহার পরিমাণ অনেক অল্প। হিসাব করিলে দেখা যায়, খাদ্য দ্রব্য হইতে দেহে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহার

শতকরা পঁচিশ ভাগ প্রকৃত কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ দেহকে গরম করিয়াই ব্যয়িত হয়। কিন্তু এই গরম করা ব্যাপারটাকে কোনক্রমে অনাবশ্যক কাজ বলা যায় না। দেহ সামগ্রী Protoplasm দ্বারা কাজ চালাইতে হইলে, তাহাকে উষ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং দেহ-শক্তির যে শতকরা ৭৫ ভাগ তাপে পরিণত হয় তাহাকে কোন ক্রমে অপব্যয় বলা চলে না। কিন্তু বাষ্প-যন্ত্রে সেই ৮৮ ভাগের সত্যই অপব্যয় হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শারীরিক উষ্ণতাকে নির্দ্দিষ্ট রাখা এক শ্রেণীর প্রাণীর প্রধান ধর্ম্ম। মানুষ এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। অতি গরমে মানবদেহের সেই সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রি উষ্ণতার কখনই পরিবর্ত্তন হয় না। যে প্রক্রিয়ায় দৈহিক উষ্ণতা এই প্রকার চির-নির্দ্দিষ্ট থাকে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহারো সন্ধান পাইয়াছেন। ইঁহারা এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যানে বলেন, উন্নত প্রাণীর দেহকে যে স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous System) আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহাই দৈহিক উষ্ণতাকে স্থির রাখে। মনে করা যাউক, যেন কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী বা মানুষকে বরফ-গলা জলে ডুবাইয়া তাহার তাপ হরণ করা যাইতেছে। কিয়ৎকালের জন্য তাহার দেহের তাপ অবশ্যই কমিয়া আসিবে; কিন্তু শেষে দেখা যাইবে, বরফ-জল স্থায়িভাবে দেহতাপকে কমাইতে পারিতেছে না। জল যেমন তাপ হরণ করিতেছে, তেমনি কোথা হইতে নূতন তাপ আসিয়া ক্ষয়ের পূরণ করিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিতেছেন, গাত্রের উষ্ণতা কমিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুজাল তাপ-হরণ-সংবাদ স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছাইয়া দেয়। স্নায়ুকেন্দ্র এই দুঃসংবাদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; সর্ব্বাঙ্গের পেশীগুলি যাহাতে সঙ্কুচিত হইয়া যথাবিধি তাপ উৎপন্ন করে, তাহার জন্য সমগ্র দেহে উত্তেজনা প্রেরণ করে। স্নায়ুর আদেশকে

অবহেলা করার সামর্থ্য কোন অঙ্গেরই নাই। কাজেই স্নায়বিক উত্তেজনায় পেশী সঙ্কুচিত হইয়া তাপ উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং এই তাপই ক্ষয় পূরণের পক্ষে প্রচুর হয়। অধিক শীতে দেহের যে কম্পন হয়, তাহা ঐ স্নায়বিক উত্তেজনাজাত পেশীর সঙ্কোচ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে যখন বৃদ্ধি দেখা যায়, হিসাবী লোককে ইহার দুই প্রকার কারণ উল্লেখ করিতে দেখা যায়। খরচের পরিবর্ত্তন না করিয়া জমার ঘরে নূতন কিছু যোগ করিতে থাকিলে জমার বৃদ্ধি হয়; তা' ছাড়া খরচ কমাইতে থাকিলেও জমার অঙ্ক বাড়িয়া চলে। নানাপ্রকার ব্যাধিতে আমাদের দৈহিক উত্তাপের যে বৃদ্ধি দেখা যায় তাহাতে খরচ কমা ও জমা বাড়া এই দুইয়েরই কার্য্য ধরা পড়িয়াছে। সুস্থ মানুষের দেহের উষ্ণতা প্রায় সাড়ে আটানব্বুই ডিগ্রি, কিন্তু জ্বর হইলে তাহা বাড়িয়া কখন কখন একশত ছয় বা সাত হইয়া দাঁড়ায়। সত্য সত্য তাপ বাড়িয়া এই উষ্ণতা প্রকাশ করে, কিংবা অসুস্থ মানুষ তাপ-বিকিরণ করিতে না পারিয়া কি প্রকারে স্বাভাবিক তাপকে জমাইয়া এই বৃদ্ধি দেখায়, শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু চেষ্টাতেও নিঃসন্দেহে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। বিখ্যাত ইংরেজ শারীরবিৎ ডাক্তার হোয়াইট্ (Dr. Hale White) সম্প্রতি এসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই এখন যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। ইনি বলিতেছেন, নিউমোনিয়া অর্থাৎ শ্বাস-যন্ত্রের প্রদাহ এবং রিসিপেলাস্ প্রভৃতি রোগে দেহতাপের যে বৃদ্ধি হয়, তাহা প্রকৃতই তাপবৃদ্ধির ফল। এই অবস্থায় দেহে সত্যই তাপের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খরচ পূর্ব্বের মতই চলে; সুতরাং দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ হইয়া পড়ে। শরীরের কোন অংশে পূঁজের সঞ্চয় হইতে থাকিলে যে তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ উহারি ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ এই অবস্থায় তাপের উৎপত্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলে, কিন্তু

শরীরের তাপ-বিকিরণশক্তি কমিয়া আসে বলিয়া, উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরে দৈহিক উষ্ণতার যে আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহার কারণটা কিছু স্বতন্ত্র। বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত-উত্তেজনা পাইলেই জীবদেহের আহত অংশ সহজে উত্তেজিত হইয়া পড়ে; কিন্তু মৃত বা নির্জীব পদার্থে আঘাত দিলে, তাহা ঐ প্রকারে সাড়া দেয় না। সজীব পদার্থের এই সাড়া দেওয়া ব্যাপারে একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন, আঘাতে উত্তেজিত হইয়া পড়া জীবনীশক্তিরই প্রধান লক্ষণ এবং উত্তেজিত হইয়া সাড়া দেয় বলিয়াই আহত অংশ আঘাতের অপকারিতা হইতে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং সবল রোগীর দেহে ম্যালেরিয়ার সেই কোটি কোটি জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যখন দেহ-কোষগুলিতে আঘাত দিতে থাকে, তখন সেই আহত কোষগুলি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না; অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা আপনা হইতেই চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ করিয়া দেয়। কাজেই ইহাতে দেহে তাপের মাত্রা বাড়িয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধারণ জ্বরে দেহের যে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, তাহা ব্যাধি নয়, বরং ব্যাধি প্রশমনেরই একটা উপায়। কিছুদিন পূর্ব্বেও চিকিৎসকগণ নানা ঔষধ প্রয়োগে জোর করিয়া জ্বরের তাপ কমাইবার চেষ্টা করিতেন। আজকাল এই চিকিৎসা-পদ্ধতির বড় প্রচলন দেখা যায় না। যে সকল ঔষধ জীবাণু-নাশ করিয়া উত্তেজনার মূল কারণটিকে উন্মূলিত করে, সাধারণ জ্বরের চিকিৎসায় এখন তাহাদেরি আদর বাড়িতেছে। কুইনিন্ জ্বরের তাপকে কমায় না, যে সকল জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাপের উৎপত্তি করে তাহাদিগকে নষ্ট করে বলিয়াই উহার এত আদর।

জ্বরে যে তাপের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা দেহরক্ষার জন্যই হয় সত্য,

কিন্তু তাই বলিয়া অত্যধিক তাপ যে স্বাস্থ্যের হানিকর নয়, এ কথা কখনই বলা যায় না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে মানব-দেহের উষ্ণতা কোন ক্রমে দীর্ঘকালের জন্য ১০৮^{0} ডিগ্রি হইয়া দাঁড়াইলে মস্তিষ্ক স্থায়িরূপে বিকৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। তার পরে যদি উষ্ণতা বাড়িয়া ক্ষণিকের জন্যও ১১৬^{0} ডিগ্রি হইয়া দাঁড়ায়, তবে আর কোন ক্রমে নিস্তার থাকে না। সর্দ্দি-গরমি (Sun Stroke) পীড়াটা মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই ফল। পক্ষান্তরে কোন কারণে যদি দেহের উষ্ণতা দীর্ঘকালের জন্য সেই সাড়ে আটানব্বুইয়ের নীচে নামে তাহা হইলেও জীবন রক্ষা দায় হয়। অধিক শীত দেহের সর্ব্বাংশকে ধীরে ধীরে নির্জীব করে। কিছুকালের জন্য শারীরিক উষ্ণতা আশী ডিগ্রির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলে, মানুষের মৃত্যু প্রায়ই অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

আলোক ও বর্ণজ্ঞান

অক্ষি-যবনিকায় (Retina) বিস্তৃত দৃষ্টিনাড়ীর (Optic Nerve) প্রান্তে বাহিরের আলোক পড়িলে তাহা কি প্রকারে মস্তিষ্কে চালিত হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করে, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অদ্যাপি কেহই তাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। বিষয় যতই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হউক না কেন, আজকালকার দিনে কোন ব্যাপারেরই ব্যাখ্যানের অভাব হয় না। শারীরতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এজন্য আজকাল এ সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা স্থান পাইয়া গিয়াছে। কেবল পুস্তক পড়িয়া এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে গেলে জ্ঞানলিপ্সুর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রসিদ্ধ শারীরতত্ত্ববিৎ হালিবার্টন্ সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, আলোক অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িয়া যে পরিবর্ত্তন করে, সেটা সম্ভবতঃ নিছক্ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। যবনিকায় যে জীবসামগ্রী (Protoplasm) বিস্তৃত থাকে, তাহার উপর আলোক পড়িলেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনই দৃষ্টিনাড়ীর প্রান্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। কিন্তু ইহার পর উত্তেজনাটা মস্তিষ্কে পরিবাহিত হইয়া যে কি প্রকারে দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করায়, হালিবার্টন সাহেব তৎসম্বন্ধে কোন

কথাই বলেন নাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে, এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করা সত্যই অসম্ভব।

আলোক পদার্থ-বিশেষের উপর পড়িয়া তাহাকে যে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করে, ইহাতে আর এখন অবিশ্বাস করা চলে না। শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় আলোকের রাসায়নিক কার্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ক্লোরিন্ (Chlorine) ও হাইড্রোজেন (Hydrogen) বায়ুকে একটি কাচপাত্রে মিশাইয়া অন্ধকার ঘরে রাখিলে, উভয় বায়ু কেবল মিশিয়া থাকে মাত্র। এ অবস্থায় তাহাদের কোনই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পাত্রটিকে কিছুক্ষণ সূর্য্যালোকে রাখিয়া দিলে আলোকের স্পর্শে হাইড্রোজেন্ ও ক্লোরিন্ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ উৎপন্ন করে। ফোটো-গ্রাফের কাচের উপরকার প্রলেপ আলোক পাইলেই যে কালো হইয়া যায় তাহাও আলোকের রাসায়নিক কার্য্যের একটি উদাহরণ। বৃক্ষের পত্রাদিতে যে-সকল সবুজবর্ণের অণু পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহারাই বাতাসের অঙ্গারক বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অঙ্গার উৎপন্ন করে, এবং তাহাই দেহস্থ করিয়া উদ্ভিদ্ পরিপুষ্ট হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের আলোকই উদ্ভিদের হরিদণুগুলিকে সক্রিয় করায়। সুতরাং অক্ষি-যবনিকায় পড়িলে তদ্দ্বারা জীবসামগ্রীর পক্ষে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হওয়ারই যে সম্ভাবনা অধিক, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নাই, অক্ষি-যবনিকার কোষগুলি প্রায় সর্ব্বদাই একপ্রকার রঙিন্ পদার্থে পূর্ণ থাকে, এবং তা'ছাড়া দণ্ডাকৃতি ও মোচাকারের (Rods and Cones) কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ উহার সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, আলোক পাইলেই কোষমধ্যস্থ বর্ণকণিকাগুলি চঞ্চল হইয়া

জর্ম্মান মহাপণ্ডিত হেলম্‌হোজ

পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মোচাকার জিনিষগুলাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ভেক প্রভৃতি কতকগুলি ইতর প্রাণীর অক্ষিযবনিকায় যে দণ্ডাকৃতি পদার্থ থাকে, সেগুলিকে প্রায়ই একপ্রকার বর্ণরসে (Visual Purple) পূর্ণ দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে,
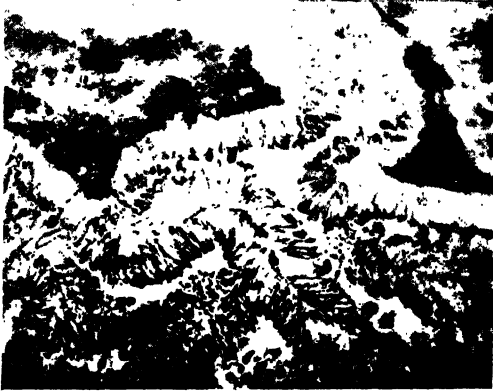
মানবের অক্ষি-যবনিকায় দণ্ড ও মোচাকার কোষ

অন্ধকারে ঐ রসের কোন বিকার হয় না, কিন্তু আলোক পাইলেই তাহা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। কাজেই আলোক চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিলে যে সত্যসত্যই রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়, তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

অক্ষিযবনিকায় বিস্তৃত দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির উপরে আলোকের পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণজ্ঞান-উৎপত্তির সহিত ইহার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মনে হইয়াছিল, এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হেরিং ও হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব বর্ণজ্ঞান-সম্বন্ধে দুইটি পৃথক্ সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন।

হেরিং সাহেব বলেন, ভেকের অক্ষিযবনিকাস্থ কোষে যেমন একপ্রকার বর্ণরস দেখা যায়, মানবের চক্ষু-যবনিকায় সম্ভবতঃ সেই প্রকার তিনজাতীয় বর্ণরস বর্ত্তমান আছে, এবং এই রসগুলির প্রত্যেকেই এক বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট। লালসবুজ, পীতনীল এবং শ্বেতকৃষ্ণ এই তিন জোড়া বর্ণের আলোক ঐ তিনজাতীয় বর্ণরসের এক একটিকে নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য করে। অর্থাৎ লালসবুজ আলোক যে বর্ণরসের উপর কার্য্য করে, নীলপীত বা শ্বেতকৃষ্ণালোক তাহার কোনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

লালসবুজ ইত্যাদি যে তিন জোড়া বর্ণের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকের দুই দুইটি বর্ণ পরস্পরের বিরোধী। অর্থাৎ লালসবুজ এই বর্ণযুগ্মের লালে সবুজের কোনই উপাদান নাই, এবং এই দুই বর্ণ পরস্পরের বিরোধী বলিয়া ইহাদের মিশ্রণে অপর কোন বর্ণ উৎপন্ন হয় না। শ্বেতকৃষ্ণ এবং নীলপীতের দুই দুইটি বর্ণের মধ্যেও ঠিক ঐ প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান। হেরিং সাহেব বলেন, এই তিন জোড়া আলোকের প্রত্যেক জোড়া সাড়া দিবার উপযোগী বর্ণ-রসের উপর আসিয়া পড়িলে, অবস্থা বিশেষে সেই পদার্থের ক্ষয় বা বৃদ্ধি আরম্ভ করে, এবং এই ক্ষয় বৃদ্ধির দ্বারাই একই বর্ণরসের সাহায্যে দুই দুইটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অক্ষি-যবনিকার সেই তিন জাতীয় বর্ণরসের মধ্যে যেটি কেবল লালসবুজে সাড়া দিতে পারে, তাহার উপর কোন আলোক পড়িয়া যদি পদার্থের পরিমাণকে বাড়াইয়া দেয়, তবে দ্রষ্টা ইহার ফলে কেবল লাল বর্ণই দেখিতে পাইবে; এবং অপর কোন আলোক দ্বারা যদি সেই পদার্থেরই ক্ষয় আরম্ভ হয়, দর্শকের চক্ষে তবে তাহা সবুজ আলোক হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন হেলম্‌হোজ্‌ বর্ণজ্ঞান-সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক।

তিন জোড়ার ছয়টি মূলবর্ণের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, এবং অক্ষি-যবনিকার বর্ণরসের তিনটি পৃথক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব প্রথমেই ঐ প্রকার ছয়টি মৌলিক বর্ণের অস্তিত্বে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মতে, লাল সবুজ ও বেগুনিয়া এই তিনপ্রকার বর্ণ ব্যতীত আর কোন বর্ণই আমাদের চক্ষু দেখিতে পায় না। আমরা যে এগুলি ছাড়া আরো শত শত বর্ণ দেখি, তাহা ঐ তিন বর্ণেরই বিচিত্র সংমিশ্রণের ফল। হেরিং সাহেবের সিদ্ধান্তের সহিত হেলম্‌হোজের মতবাদের ইহাই একমাত্র অনৈক্য নয়। হোলম্‌হোজ্‌ সাহেব আরো বলিয়াছেন, দৃষ্টিনাড়ীগুচ্ছের প্রান্তে যে-সকল দণ্ড ও মোচাকার কোষ দেখা যায়, তাহারাই আলোকে উত্তেজিত হইয়া চক্ষুতে বর্ণ দেখায়। বাহিরে এই দণ্ড ও মোচাকার কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা যায় না বটে, কিন্তু মূলে তাহারা তিন জাতীয় বিধর্ম্মী জিনিষ। লাল সবুজ বেগুনিয়া এই তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোক ঐ তিনজাতীয় কোষের উপর একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না, এক একটি আলোক ঐ তিন শ্রেণীর কোষের এক একটিকে বাছিয়া লইয়া উত্তেজিত করে, এবং সেই উত্তেজনা দৃষ্টিনাড়ী দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জন্য লোহিতালোক উৎপাদক কোষগুলি যে আলোক দ্বারা উত্তেজিত হয়, তাহাকে আমরা লোহিতালোক রূপেই দেখি। অপর দুই জাতীয় কোষ এই আলোকে মোটেই সাড়া দিবে না।

আমাদের চক্ষু কেবল লাল সবুজ ও বেগুনিয়া এই তিন মৌলিক বর্ণ দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় না; শত শত আলোক চক্ষে পড়িয়া সর্ব্বদাই শত শত বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি করে। এই প্রসঙ্গে হেলম্‌হোজ্‌ সাহেব বলেন, কোনও মিশ্র আলোক অক্ষি-যবনিকায় পড়িয়া যদি পূর্ব্বোক্ত তিন

জাতীয় কোষকে একসঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত করে, তবে ইহার ফল লাল সবুজ ও বেগুনিয়া এই তিনটি মৌলিক বর্ণের মিশ্রণের ফলের অনুরূপ হয়। কাজেই মূলে তিনটি মাত্র বর্ণ থাকিলেও আমরা এই প্রকারে নানা বর্ণের আলোক দেখিতে আরম্ভ করি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে হেলম্‌হোজের মতে, সেই দণ্ডাকৃতি ও মোচাকার তিন জাতীয় কোষের বিচিত্র উত্তেজনাই বর্ণ-বৈচিত্র্যের মূল কারণ। যদি কোন আলোক কেবল এক জাতীয় কোষকেই উত্তেজিত করে, তবে এই কোষের জাতি হিসাবে আমরা লোহিত সবুজ বা বেগুনিয়া বর্ণের মধ্যে কেবল মাত্র একটিকেই দেখিতে আরম্ভ করিব।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি পৃথক সিদ্ধান্তের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল হেলম্‌হোজের উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সহস্র সহস্র বর্ণের মধ্যে ইনি কেবল লাল সবুজ ও বেগুনিয়াকে কি কারণে মৌলিক বর্ণ বলিয়া স্থির করিলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপযোগী নয়। চক্ষুর উপর সুকৌশলে নানা বর্ণের আলোকপাত করিয়া হেলম্‌হোজ্ সাহেব অক্ষি-যবনিকাকে কেবল লাল সবুজ ও বেগুনিয়া বর্ণেই অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার আরো অনেক পরীক্ষার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ই যে মৌলিক বর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়াছিল। হেরিং সাহেবের ন্যায় নিছক্ কল্পনার উপর দাঁড়াইয়া হেলম্‌হোজ্ সাহেব কোন কথাই বলেন নাই, যাহা বলিয়াছেন হাতে হাতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বোধ হয় এইজন্যই আজ হেলম্‌হোজের সিদ্ধান্তটির এত আদর।

ঘ্রাণতত্ত্ব

ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কি প্রকারে গন্ধ অনুভব করি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। গন্ধপ্রদ পদার্থ কি প্রকার অবস্থায় নাসিকায় পৌঁছিলে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

অভিধানকারকে ঘ্রাণের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন,—কোন বস্তু হইতে নির্গত হইয়া যাহা আমাদের ঘ্রাণোত্তেজক স্নায়ুকে (Olfactory Nerve) আঘাত দেয়, তাহাই ঘ্রাণ। বলা বাহুল্য, এটা ঘ্রাণের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা হইল না। গন্ধপ্রদ পদার্থ হইতে যে-সকল অংশ নির্গত হইয়া নাসা-বিবরে প্রবেশ করে, তাহার অবস্থাটা যে কি, সংজ্ঞা হইতে তাহা জানা যায় না। নাকের নিকট চন্দন রাখ, তাহার মৃদু গন্ধ অনুভব করিতে থাকিবে। এখানে চন্দন বায়বীয় বা তরল অবস্থায় নাসিকায় প্রবেশ করে, কি কঠিনাবস্থায় থাকিয়াই ধূলিকণার ন্যায় নাসারন্ধ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, অভিধানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

পদার্থের নানা অবস্থার নানা গুণের আলোচনা করা জড়বিজ্ঞানের কার্য্য। এই জন্য ঘ্রাণতত্ত্বের আলোচনা কালে, ঘ্রাণ জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চাপা দিয়া রাখিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে একটা স্পষ্টাপষ্টি জবাব দিতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, গন্ধোৎপাদক পদার্থের অতি ক্ষুদ্র কণা কঠিনাকারে থাকিয়া আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করে, এবং নাসিকাস্থ ইন্দ্রিয়বিশেষ তাহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়া গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন করে। উদাহরণ স্বরূপ ইঁহারা বলিয়া থাকেন,—বৃহৎ ঘরের কোন স্থানে রতিপ্রমাণ মৃগনাভি লুক্কায়িত রাখ,

ইহারি গন্ধে ঘরটি বহু বৎসর পরিপূর্ণ থাকিবে। অথচ এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মৃগনাভিটুকু স্বদেহের অণুগুলিকে গন্ধাকারে ছাড়িয়া, ওজনে অধিক কমিবে না। গন্ধপ্রদ জিনিষের কণাগুলি এতই সূক্ষ্মাকারে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে!

অধিকাংশ পদার্থে প্রচুর উত্তাপ দিলে, তাহারা খুব সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এই প্রকারে বিভক্ত জিনিষকে আমরা বাষ্প বলি। ইহা পদার্থের একটা বিশেষ রূপ। তরল বা কঠিনাকার ত্যাগ করিয়া পদার্থ ঐ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু নিজের রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মৃগনাভি ইত্যাদি গন্ধপ্রদ দ্রব্য যে, পূর্ব্বোক্তপ্রকার অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পারে তাহা জানা ছিল না। বৈজ্ঞানিকগণ অণু-পরমাণু প্রভৃতি আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা যখন ঘ্রাণোৎপত্তির মূলে ঘ্রাণপ্রদ জিনিষের অতিক্ষুদ্র কঠিন কণার কার্য্য দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকলেই স্বীকার করিলেন, দ্রব্যের অতি সূক্ষ্ম অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলে গন্ধ-জ্ঞান জন্মায়।

এই সিদ্ধান্তের পোষক নানা উদাহরণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। স্থির হইল, শিকারের দেহনিঃসৃত মলাদি অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শিকারী কুকুর নাসিকার সাহায্যে সেই কণাপ্রবাহের দিক্ নির্ণয় করিয়া, শিকারকে আক্রমণ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একজাতীয় প্রজাপতিকে ধরিয়া কোন দূরস্থানে লুক্কায়িত রাখিলে, সহচর প্রজাপতিগুলি অতি অল্পকাল মধ্যে ধৃত সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করে। ইহার ব্যাখ্যানে সকলে বলিতে লাগিলেন,—প্রজাপতির দেহনিঃসৃত কোন দ্রব্যের ক্ষুদ্রকণা ছড়াইয়া পড়িয়া পরস্পরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করে। এইজন্য কোন্ পথ ধরিয়া

কণাপ্রবাহ চলিতেছে তাহা ঠিক্ করিয়া, ধৃত সঙ্গীর সন্ধান করা উহাদের পক্ষে কঠিন হয় না।

ঘ্রাণতত্ত্বের ঐ পুরাতন সিদ্ধান্তটিকে বিজ্ঞানের নূতন আলোকে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার কথা, এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকেরই মনে স্থান পায় নাই। ডাক্তার এট্‌কিন্ (Dr. John Aitkin) এখনকার একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। ইনি ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়্যাল্ সোসাইটির জনৈক পুরাতন সভ্য। তা'ছাড়া কয়েকটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগারের পরিচালন ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। ঘ্রাণতত্ত্ব লইয়া অধ্যাপক মহাশয় সম্প্রতি অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে যাহা জানা যাইতেছে, তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, কোন দ্রব্য যখন বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে, আমরা তখনি তাহার গন্ধ অনুভব করি। পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া নাসিকায় পৌঁছিলে গন্ধজ্ঞান হয় না, বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার এট্‌কিনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র অনুমানমূলক নয়। প্রত্যক্ষ ও সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইনি নিজের প্রত্যেক কথার সমর্থন করিয়াছেন।

পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, কোন বায়বীয় জিনিষকে জমাট বাঁধাইতে ধূলিকণাদির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন জড়কণা অনেক সাহায্য করে। দুইটি একই আকারের পরিষ্কার কাচপাত্রে কেবল মাত্র জলীয় বাষ্প আবদ্ধ রাখিলে, জল যতক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাষ্পাকারে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে জল বলিয়া চেনা যায় না। কিন্তু একটি পাত্রে কিছু ধূলিকণা ফেলিয়া, পরে উভয় পাত্রস্থ বাষ্পকে জমাইবার চেষ্টা করিলে, ধূলিযুক্ত পাত্রটির বাষ্পকে সর্ব্বাগ্রে জমাট বাঁধিতে দেখা যায়। পূর্ব্বের স্বচ্ছ বাষ্পপূর্ণ পাত্রে, কুয়াশার ন্যায় অস্বচ্ছ জলকণার সঞ্চার হইতে

থাকিবে। বড় বড় সহরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় যে একপ্রকার কুয়াশা দেখা যায়, তাহা বাতাসে উড্ডীয়মান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও ধোঁয়ার কণারই কাজ বলিয়া স্থির হইয়াছে। সহরের বায়ুতে ধূলিকণা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশানো থাকে। কাজেই ঐ সকল স্থানের জলীয় বাষ্প ঐ কণাগুলির চারিপাশে জমাট বাঁধিয়া কুয়াশার উৎপত্তি করে।

বায়বীয় পদার্থের মধ্যস্থিত কঠিন জড়কণার এই কার্য্যটির সাহায্যে এট্‌কিন্ সাহেব তাঁহার নূতন সিদ্ধান্তটির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। ইনি দুইটি পরিচ্ছন্ন কাচপাত্র লইয়া, উভয়েই প্রথমে ধূলি বা অপর কোনও জড়কণা বর্জ্জিত জলীয় বাষ্প রাখিয়াছিলেন, এবং পরে একটি পাত্রে কিছু মৃগনাভি ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গন্ধটা যদি সত্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে মৃগনাভি হইতে বাহির হইত, তবে ঐ সকল কণাকে অবলম্বন করিয়া পাত্রটির জলীয় বাষ্প নিশ্চয়ই জমাট হইয়া পড়িত। কিন্তু পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় নাই। মৃগনাভির গন্ধপূর্ণ পাত্রটি, অপর পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছই রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই মৃগনাভির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কঠিনাকারে থাকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে গন্ধের উৎপত্তি হয় বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার অমূলকতা এই সহজ পরীক্ষায় বেশ বুঝা গিয়াছিল।

কাচের নলের মধ্যে পরিষ্কার তূলা রাখিয়া, সাধারণ অপরিষ্কৃত বায়ুকে সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইতে থাকিলে, বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া নল হইতে বাহির হয়। কারণ এখানে বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণাদি তূলায় বাধা পাইয়া আটকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটি বায়ুশোধন করিবার একটি সুন্দর উপায়। এট্‌কিন্ সাহেব মৃগনাভি ইত্যাদি দ্বারা গন্ধযুক্ত বায়ুকে কাচনলের ভিতর দিয়া চালাইয়া শোধন করিয়া লইয়াছিলেন। পদার্থের সূক্ষ্ম কণা দ্বারা গন্ধের উৎপত্তি হইলে, শোধিত বায়ুতে গন্ধের লেশমাত্র থাকিত না। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় নাই।

সুতরাং গন্ধটা যে পদার্থের সূক্ষ্ম কণা দ্বারা উৎপন্ন হয়, এই পরীক্ষাটির দ্বারাও তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ডাক্তার এট্‌কিন্ কর্পূর, ন্যাপ্‌থালিন, আতর ইত্যাদি নানা ভালমন্দ গন্ধদ্রব্যের উপর পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষা করিয়া, সকল পরীক্ষাতে একই ফল পাইয়াছেন। কাজেই ঘ্রাণতত্ত্বের মূল ব্যাপারে যে পুরাতন বিশ্বাস ছিল, তাহা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। গন্ধপ্রদ দ্রব্য হইতে গন্ধটা তরল বা কঠিন আকারে আসিয়া নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে, পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িত। সুতরাং দ্রব্যের বাষ্পীয় অবস্থাতেই যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, একথা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই।

নানা আবর্জ্জনাপূর্ণ ড্রেন্ বড় বড় সহর মাত্রেরই নানা অংশে বিস্তৃত থাকে। এই সকল পয়ঃপ্রণালী দ্বারা কি প্রকারে সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন ইংরাজ স্বাস্থ্য-রক্ষক আলোচনা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, পয়ঃপ্রণালী হইতে উদ্গত দুষ্ট বাষ্প স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর এবং বিশেষ ক্ষতিকর ড্রেনের গন্ধ। গলিত আবর্জ্জনার কণাসকল গন্ধের আকারে আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করে, এবং নানা ব্যাধির জীবাণু সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া আনিয়া অধিবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য, গন্ধোৎপত্তির পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষকগণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু গন্ধ যে, কেবল বায়বীয় পদার্থময়, ডাক্তার এট্‌কিনের পরীক্ষায় তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নানা ভয়াবহ পীড়ার বাহক বলিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ড্রেনের গন্ধের উপর যে অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন, এই নবাবিষ্কারে নিশ্চয়ই তাহার ক্ষালন হইবে বলিয়া আশা হয়। এখন ব্যাধি-জীবাণুর সংক্রমণের কারণান্তর অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে।

ঘ্রাণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় এই নূতন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অদ্যাপি কোনও

কথা শুনা যায় নাই। এট্‌কিন্ সাহেব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথাই বলেন নাই। অতি সহজ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হঠাৎ দাঁড়াইয়াই যে কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা আমাদের মনে হয় না।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ

উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর উপর মানুষ যে কত অত্যাচার করে তাহার সীমা নাই। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ ও শূকরাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ঘোটক এবং উষ্ট্রও মনুষ্যের খাদ্য। পক্ষীদের ত কথাই নাই। তা'র পর ইঁদুর, সাপ, গো-সাপ, কাঠবিড়াল, ফড়িং প্রভৃতি পতঙ্গজাতিও মানুষের কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। উদ্ভিদের উপর মানুষ এতটা অত্যাচার করিতে পারে না, সকল গাছ-পাতা বা ফলমূল স্বাদু নয়, কাজেই উদ্ভিদ্‌গুলির মধ্য হইতে অনেক দেখিয়া শুনিয়া মানুষ খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করে। কিন্তু আমিষ-খাদ্য-নির্ণয়ে এ প্রকার বিচার করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না; সভ্য মানুষ আম-মাংস ভোজন করে না; যদি কোন প্রাণীর মাংসে কোন প্রকার অস্বাদুকর জিনিষ থাকে সিদ্ধ করিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলমূল ও অনেক শাকসব্‌জি অপক্কাবস্থাতেই মানুষ আহার করে, কাজেই অগ্রে স্বাদুতা স্থির করিয়া পরে আহার্য্য বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। আবার অধিকাংশ উদ্ভিদেরই দেহে যে বিস্বাদজনক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহা সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয় না,—কাজেই সিদ্ধ করিলে যেমন সকল প্রাণীর মাংসই খাদ্য হইয়া দাঁড়ায় উদ্ভিদ্ তেমনটি হয় না। নচেৎ মানুষের অত্যাচারে হয় ত, ভূমণ্ডলের গাছপালাও বিরল হইয়া আসিত।

শাস্ত্রে বলে, "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা"। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য পরীক্ষা করিলে শাস্ত্রের উক্তির সহিত ঘোর অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের যজ্ঞের আহুতির জন্যই দুর্ব্বল ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঘ ভালুকের তীক্ষ্ণ নখদন্ত, সজারুর গায়ের কাঁটা, কচ্ছপ ও শম্বুকজাতীয় প্রাণীর কঠিন দেহাবরণ, গো, মেষ ছাগাদির শৃঙ্গ, বোল্‌তা ও মধুমক্ষিকার হুল, এবং সাপের বিষদন্ত সকলই আত্মত্রাণের মহা অস্ত্র। কীট-পতঙ্গ অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী, ইহাদের ধারালো হুল নাই, কিন্তু কেহ কেহ দেহ হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত রস নিঃসৃত করে যে, তাহাতে শত্রু উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় পায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার রাত্রিতে আলো জ্বালিয়া বসিলে, এই প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত বহু কীট-পতঙ্গ দেখা গিয়া থাকে। বেঙ্‌ অতি নিরীহ প্রাণী, ইহাদের শিং নাই, ধারালো দাঁত বা হুল নাই, কিন্তু ইহারা লম্বা লম্বা লাফ দিতে পারে, তাহাই আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়। গেছো এবং সেপো বেঙের লাফও খুব বড় এবং সঙ্গে আবার ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার বিষও বাহির হয়, এই বিষের একটু পরিচয় পাইলেই কোন শত্রু ইহাদের নিকটবর্ত্তী হয় না। কয়েক জাতীয় গিরগিটিও এই প্রকারে দেহ হইতে বিষ নির্গত করিয়া আত্মরক্ষা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃতিদেবী তাঁর এই অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বল সন্তানগুলিকে এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ভূতলে ছাড়িয়া দিয়াছেন, অপর বলবান্ প্রাণীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখুক্ ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উদ্ভিদ্‌গণ ইতর প্রাণী অপেক্ষা আরো দুর্ব্বল ও নিঃসহায়, বেঙ্‌ বা হরিণের মত লম্বা লম্বা লাফ দিয়া যে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবে, তাহার সাধ্য ইহাদের নাই। কাজেই একস্থানে দাঁড়াইয়া যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ইহাদের দেহে রাখিতে

হইয়াছে। এই জন্যই কাহারো গায়ে কাঁটা, কাহারো পাতায় সুঁয়ো, কাহারো ফলে, ফুলে, মূলে ও পাতায় বিষ। প্রবল ইতরপ্রাণীরা

ময়না গাছ সূচমুখী

এই সকলের ভয়ে উদ্ভিদের অনিষ্ট করিতে পারে না, অতি বুদ্ধিমান্ মানুষও ইহাদের নিকট হার মানিয়া যায়। নিম, নিসিন্দা, মাখাল ফল তাহাদের দেহকে অতি বিস্বাদ রসে পূর্ণ রাখিয়া কেমন আত্মরক্ষা করে! মানুষ কোন দিন যে এগুলির দ্বারা রসনাতৃপ্তিকর ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা যাইতেছে না।

যাহা হউক, দুর্ব্বল জীব কি প্রকারে আত্মরক্ষা করে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে যে বিষ সঞ্চিত থাকে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

প্রথমে উদ্ভিদের বিষের কথাই আলোচনা করা যাউক। খেজুর বা কুলের কাঁটা গায়ে লাগিলে আমরা বেদনা পাই, কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী হয় না। বিছুটি বা আল্‌কুশীর সুঁয়ো গায়ে ঠেকিলে যে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তাহা সত্যই বিষের জ্বালা। উদ্ভিদের বিষের ইহা একটি সুপরিচিত উদাহরণ। ছোটখাটো অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে বিছুটির সুঁয়োকে নিরেট্ দেখায় না। এগুলির আগাগোড়া নলের মত ফাঁপা। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এই শূন্যস্থানে এক প্রকার জলবৎ স্বচ্ছ রসও দেখা যায়। এই রসই বিছুটির বিষ। নলাকার সুঁয়োগুলি প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে, আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং নলের ভিতরকার রস শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষের কার্য্য দেখাইতে আরম্ভ করে। বিছুটির বিষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিতেছেন। পিপীলিকার বিষে যে ফরমিক্ এসিড্ (Formic Acid) নামক দ্রাবক মিশানো থাকে, বিছুটির রসের অধিকাংশই সেই দ্রাবকে গঠিত। তা' ছাড়া সাপের বিষের মত এক প্রকার রসও অল্পমাত্রায় উহাতে মিশ্রিত দেখা যায়। বিছুটির জ্বালা-পোড়ার কারণ এই বিষ। সুতরাং অচল উদ্ভিদ্‌কে যদি সচল সাপের সহিত তুলনা করা যায়, তাহাতে অন্যায় হয় না।

আলকুশীর সুঁয়োর বিষ আরো ভয়ানক। বিষের পরিমাণ ইহাতে বিছুটির তুলনায় অধিক। মানুষ বা গোরু প্রভৃতি প্রাণীর দেহে আল্‌কুশী লাগিলে আর নিস্তার নাই। অধিক পরিমাণে সুঁয়ো গায়ে লাগিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

ফুলের উগ্র গন্ধ নির্গত করিয়াও কতকগুলি উদ্ভিদ্‌কে আত্মরক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃতি যে-সকল বেশভূষায় সাজাইয়া প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে পৃথিবীতে ছাড়িয়া দেন, কেবল স্বভাবের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাই তাহার উদ্দেশ্য নয়, পত্রপুষ্পের বিচিত্র বর্ণ এবং তাহাদের

বিচিত্র গঠনের মূলে এক একটা শুভ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। যে সুগন্ধ লইয়া পুষ্প জন্মগ্রহণ করে, তাহা কখনই মানুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য নয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফল প্রসব করিয়া নিজের বংশ অক্ষুণ্ণ রাখাই উদ্ভিদ্‌-জীবনের সার্থকতা। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ বলেন, ফুলের গন্ধ এই কার্য্যেরই সহায়তা করে। উদ্ভিদ্ পুষ্প-পুটে মধুভাণ্ড সজ্জিত রাখিয়া গন্ধের দ্বারা দূরের প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গকে আমন্ত্রণ করে। প্রজাপতি পুষ্পের মধুপান করিতে বসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পরাগ গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিয়া ফলের গঠন সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু আমরা উদ্ভিদের যে তীব্র দুর্গন্ধের কথা বলিতেছি, তাহা পতঙ্গের আমন্ত্রণের জন্য নহে। যাহাতে অনিষ্টকর প্রাণী কাছে আসিতে না পারে তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। লিলি জাতীয় কতকগুলি ফুলের গন্ধ যে মানুষ সহ্য করিতে পারে না, এবং এই গন্ধে যে নানা প্রকার পীড়া দেখা দেয়, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের চাঁপা ফুলের গন্ধে মাথা ধরার কথাটাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ্ ছাড়িয়া এখন প্রাণীর কথা আলোচনা করা যাউক। আত্ম-রক্ষার জন্য এবং কখনো কখনো আহার্য্য সংগ্রহের জন্য যে কত প্রাণীর দেহে কত রকম বিষ আছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। ইহারা সাধারণ উদ্ভিদের মত দেহকে বিস্বাদ করিয়া আত্মরক্ষা করে না, কাজেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী করাইবার জন্য প্রকৃতি ইহাদের দেহেই নানা বিষদিগ্ধ অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক প্রাণীর বিষগুলি পরীক্ষা করিলে, দেহে উহাদের দুইপ্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বিষ রক্তের সহিত যুক্ত না হইলে দেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সাপের বিষ, বিচ্ছুর বিষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর কতকগুলি, রক্তের সহিত মিশিবার

জন্য প্রতীক্ষা করে না, খাদ্যপানের সহিত উদরস্থ হইলেই ইহারা বিষের কার্য্য দেখাইতে সুরু করে। মাকড়সা প্রভৃতির বিষ বোধ হয় এই শ্রেণীভুক্ত। কেবল সাপ ও বিচ্ছুর বিষই যে দেহপ্রবিষ্ট হইলে অনিষ্ট করে তাহা নয়। ভেকের গাত্র হইতে যে ঘর্ম্মবৎ রস নির্গত হয়, তাহা মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইল্ অর্থাৎ বাইন জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের (Eel) রক্ত যে-কোন প্রাণিদেহে প্রবেশ লাভ করিলেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ করে। কয়েক জাতীয় মৎস্য এবং গিরিগিটির মুখের লালাও রক্তের সহিত যুক্ত হইলে বিষের কার্য্য দেখাইতে আরম্ভ করে। শিশুর মুখের লালায় যে বিষ আছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন; এক মাস দেড় মাস বয়সের শিশুর লালা সংগ্রহ করিয়া খরগোস ইত্যাদি প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে, বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু এই সকল বিষ খাওয়াইলেই কোন প্রাণীতে অসুস্থতার চিহ্ন দেখা যায় না।

বিষদাঁতযুক্ত প্রাণীর দেহে কোথায় বিষের উৎপত্তি হয় তাহার অনুসন্ধান হইয়াছে। ইহার ফলে জানা গিয়াছে, যাহাদের বিষ-দাঁত আছে, তাহাদের দাঁতের মূলে এক একটি ক্ষুদ্র কোষ থাকে। এই কোষই বিষভাণ্ড। সাপের বিষদন্তে যেমন এক একটা খাঁজ কাটা থাকে, বিষদন্তযুক্ত অপর প্রাণীর দাঁতেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। ইচ্ছা করিলেই দন্তমূলের কোষস্থ বিষ ইহারা দাঁতের খাঁজের ভিতর দিয়া আনিয়া শত্রুকে দংশন করিতে পারে। মাগুর বা শিঙ্গি মৎস্যের কাঁটায় বিষ আছে, ইহারা হাতে পায়ে কাঁটা ফুটাইলে বেশ যাতনা হয়। এই শ্রেণীর অনেক মাছের কাঁটার মূলে এই প্রকার বিষকোষ ধরা পড়িয়াছে, এবং ইহাদের কাঁটাগুলিতে সাপের বিষদন্তের মত খাঁজ কাটাও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁটা হানিয়া বা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া প্রাণীরা যে বিষ শত্রুর দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বিছুটি প্রভৃতি উদ্ভিদের বিষে যে ফরমিক্ এসিড দেখা গিয়াছে, ইহাতেও তাহাই ধরা পড়িয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলীকে অসাড় করিয়া দেওয়া ফরমিক্ এসিডের একটা প্রধান কার্য্য। বিষের সহিত এই জিনিষটা মিশ্রিত থাকায় দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে শিকার করার কার্য্যে ইহা খুবই সাহায্য করে। ক্ষুদ্র কাঁচপোকা যখনি বৃহৎ আরস্থলাকে শিকার করিতে যায়, তখন কোন গতিকে আরস্থলার গায়ে একবার হুল ফুটাইতে পারিলেই সেটি ঐ ফরমিক্ এসিড দ্বারা পক্ষাঘাতের রোগীর মত অবশাঙ্গ হইয়া পড়ে। তা'র পর কাঁচপোকা উহার সুঁয়ো ধরিয়া অনায়াসে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে পারে।

মৌমাছি ও ভীমরুলের ন্যায় বিচ্ছুর বিষও তাহাদের পুচ্ছে থাকে। ইহাদের সম্মুখের দুটা দাড়া এবং দাঁত একেবারে নির্ব্বিষ। পুচ্ছের প্রান্তস্থিত ধারালো হুল এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষকোষই ইহাদের আত্ম-ত্রাণের মহা অস্ত্র। সূক্ষ্মাগ্র হুলটিকে ইহারা অতি সাবধানে কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠাইয়া রাখে, তা'র পর শত্রুপক্ষ সম্মুখে আসিলেই তাহা দেহে বিদ্ধ করিয়া দেয়।

জেলি মৎস্য (Jelly fish) নামক এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর দেহেও বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের হুল বিষদন্ত বা শিঙ্গি মাছের মত বিষময় কাঁটা কিছুই নাই। দেহ হইতে মাকড়সার সূত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বিষপূর্ণ সুঁয়ো বাহির করিয়া ইহারা শত্রুকে আঁকড়াইয়া ধরে। সুঁয়োর বিষে শত্রুর দেহে বিছুটির মত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই জন্য জেলি-মৎস্য সামুদ্রিক বিছুটি (Sea Nettles) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গ জাতির দেহে যত বিষ দেখা যায়, বোধ হয় অপর কোন জাতির মধ্যে সে প্রকার দেখা যায় না। মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, পিপীলিকা সকলেই বিষাক্ত এবং ইহাদের সকলেরই বিষ পুচ্ছদেশে রক্ষিত দেখা যায়। কেবল সুঁয়ো পোকা ও মশক তাহাদের বিষ পুচ্ছে রাখে না। সুঁয়ো পোকার বিষ তাদের চুলে এবং মশকের বিষ তাহাদের মুখে থাকে। মাকড়সা-জাতীয় পতঙ্গ তাহাদের পায়ের নখে রাখে। নখের মূলেই ইহাদের বিষ-স্থালী। আমাদের তেঁতুলে-বিছের বিষ তাহাদের দাঁতে থাকে, দন্তমূলে যে বিষস্থালী থাকে তাহা হইতে ইচ্ছামত বিষ নির্গত করিয়া শত্রুকে দংশন করিতে পারে। পতঙ্গের সংখ্যা যেমন অধিক, ইহাদের শত্রুও তেমন অনেক। অনেক পক্ষীর পতঙ্গই প্রধান আহার। তা ছাড়া টিক্‌টিকি, গিরগিটি, এমন কি আমাদের সেই অতি নিরীহ ভেকগুলি সম্মুখে পতঙ্গ পাইলে, সিংহের মত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পতঙ্গের গায়ে, মুখে, লেজে, দাঁতে, নখে, বিষ রাখিতে হইয়াছে।

বড় আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের কাঁক্‌ড়াগুলির বড় বড় দাড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিষ নাই। চিংড়িমাছেরও সেই দশা। খুব লম্বা লম্বা দাড়া আছে, কিন্তু সেগুলি একবারে নির্ব্বিষ। পক্ষীদের পায়ের নখ ও ঠোঁট খুব ধারালো, কিন্তু সেগুলিতেও বিষের চিহ্ন দেখা যায় নাই।

যে-সকল প্রাণীর দেহে কোন প্রকার বিষযুক্ত অঙ্গ নাই, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলির মাংসে বিষের লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তশীল বৈজ্ঞানিক ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব (Sir Ray Lankester) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অন্ততঃ শতকরা দশজন লোক ইচ্ছা করিলেও মৎস্য মাংস আহার করিতে পারে না; জোর করিয়া

খাওয়াইলে নানাপ্রকার পীড়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ইহা দেখিয়া ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব বলিতেছেন,—মৎস্য-মাংসাহারে এই অসুস্থতার লক্ষণ বিষেরই পরিচায়ক। বিষ খাইলেই সকলে অসুস্থ হয় না,—এমন বিষ অনেক আছে, যাহা একজনের শরীরে যে ফল দেখায় অপরে তাহা দেখায় না। একই খাদ্য আহার করিয়া এবং একই জল পান করিয়া এক ব্যক্তি পীড়িত হইল এবং অপর ব্যক্তি খাদ্যস্থ বিষ হজম করিয়া সুস্থ থাকিল, এ প্রকার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এই সকল কথা মনে করিয়া ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব বলিতেছেন, নিরামিষাহারিগণ মৎস্য মাংস খাইলেই যে অসুস্থতা বোধ করেন, তাঁহাদের এই অসুস্থতার কারণ মৎস্য-মাংসের বিষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা যথেষ্ট মাংস আহার করিতে পারেন, কিন্তু মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারেন না। চিংড়ি মৎস্য বা কাঁকড়া খাইলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন, এ প্রকারও অনেক লোক দেখা গিয়াছে। রন্ধন করিলেও মৎস্য মাংসে মৃদু বিষ থাকিয়া যায়, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ল্যাঙ্কেষ্টার্ সাহেব নিরামিষাহারীর রুচি অরুচির ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সাপ প্রভৃতির যে তীব্র বিষের বিন্দুমাত্র রক্ত স্পর্শ করিলে বৃহৎ প্রাণীরও মৃত্যু হয়, তাহা উহাদের নিজের দেহে প্রবেশলাভ করিলে কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। একটি সর্প আর একটিকে দংশন করিলে আহত সর্পের যে, কোন অনিষ্টই হয় না, তাহা একাধিক পরীক্ষায় সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কয়েক জাতীয় সর্পকে রাগাইলে তাহারা নিজেদের গায়ে নিজেরাই কামড় দিতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজের বিষে ইহাদের কেহই নিজে মরে না। সম্প্রতি এই ব্যাপার লইয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা গবেষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বসন্তের বা ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজ অল্পমাত্রায় দেহস্থ করিলে যেমন এই সকল রোগের তাজা বিষ

আর মানুষকে পীড়িত করিতে পারে না, সেইপ্রকার সর্প প্রভৃতির দেহেই বিষ-কোষ আছে বলিয়া সেই বিষে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের শান্তির জন্য যেমন আমরা ক্ষিপ্ত কুকুরের মৃদু বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকি, সাপগুলিও ঠিক সেই প্রকার যেন নিজের বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। তাই পরস্পর কামড়াকামড়ি করিলে বা নিজের দেহে নিজের বিষ ঢালিয়া দিলে ইহাদের কোনই অনিষ্ট হয় না।

অমৃত ও গরল

কলিযুগে অমৃত কোথায় আছে জানি না, কিন্তু গরলের সন্ধান করিবার জন্য একটুও কষ্টস্বীকার করিতে হয় না। সাপের মুখে গরল, কুকুরের দাঁতে গরল, ডাক্তারের শিশিতে গরল, কবিরাজের পুঁটুলিতে গরল, দোকানের খাদ্য পানীয় ত একবারে গরলেই ভরা। 'অমৃতং বাল-ভাষিতম্' এই বাক্যটির যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তবে বুঝিতে হয় এক ছোট ছেলেমেয়ের ফাঁকা কথাতেই এখন অমৃত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,—কিন্তু জিনিষটা একবারেই ফাঁকা; ধরিয়া ছুঁইয়া পাইবার উপায় নাই। কাজেই ইহাকে লইয়া আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা চলে না। তার পর যদি গৃহের অপর প্রান্ত হইতে কোন ক্ষীণতর কণ্ঠের গরলময় শব্দস্রোত আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে এই গরল-প্লাবনে "বালভাষিতম্" নিঃশেষে neutralised হইয়া যায়,—সুতরাং "বাল-ভাষিতের" অমৃত লইয়া পরীক্ষাই বা চলে কি প্রকারে ?

সত্যযুগের মানুষ কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত, পাঁজিতে তাহার সন্ধান পাইলাম না,—হয় ত অমৃতই তাহাদের আহার্য্য ছিল। কিন্তু পাঁজিতে দেখিতেছি "কলৌ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ", কাজেই কলিতে অন্নাদি খাদ্যই অমৃতের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। তা' ছাড়া,

"দুগ্ধং শর্করাচৈব ঘৃতং দধি তথা মধু।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়সর্ব্বকর্ম্মসু" ॥

এই বচনও ত আজকাল মানিয়া চলিতে হইতেছে। কাজেই পঞ্চামৃতের

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি সকলই কলিকালে অমৃত। অতএব সুখাদ্যমাত্রকেই যদি অমৃত বলা যায়, তাহা হইলে ভুলের মাত্রা খুবই কমিয়া আসে।

শুনিয়াছি অন্ততঃ কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পাহাড়-পর্ব্বতের নিভৃত স্থানে এমন সাধু-সন্ন্যাসী প্রায়ই দেখা যাইত, যাঁহারা মহাদেবের ন্যায় বিষ খাইয়া হজম করিয়া ফেলিতেন; ইঁহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, গরল ও অমৃত ইঁহাদের হিসাবে একই শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে পড়িত। এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের আর দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই কলিকালে ঠিক্ ঐ প্রকার আর এক দল লোক দেখা দিয়াছে, যাঁহারা অমৃত ও গরলকে একই কোটায় ফেলিতে চাহিতেছেন। ইঁহারা সন্ন্যাসী নহেন, সম্পূর্ণ গৃহী, আমাদেরি মত আহার বিহার কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়ান। ইঁহারাই আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক। ইঁহাদের সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, অমৃত ও গরল জিনিষ হিসাবে একই কোটায় পড়ে। আমাদের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহারা গরল ভক্ষণ করিয়া হজম করিতেছেন না বটে, কিন্তু হাতে-কলমে এমন প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন যে, অমৃত ও গরল একই পদার্থ নয়, একথা এখন আর বলা চলিতেছে না।

বিষয়টা একটু খোলসা করিয়া বলা যাউক। বিজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জানেন, আমরা এই যে খাদ্য-অখাদ্য নানা জিনিষ চারিদিকে দেখিতেছি, কতকগুলি ছাড়া তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই দুই, তিন, চার বা তাহার অধিক মূল-পদার্থের যোগে উৎপন্ন। আমরা যে জিনিষটার সহিত খুব পরিচিত সেই জলকে লইয়া দেখি। পরীক্ষাশালায় জলকে ভাঙ্গিয়া বৈজ্ঞানিক দুইটি বায়বীয় পদার্থ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের উৎপত্তি দেখাইয়া দিবেন। অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ এই দুইটি বায়ু মূলপদার্থ, ইঁহাদিগকে কোনক্রমে বিশ্লেষ করা যায় না, অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া নূতন কোন

পদার্থ উৎপন্ন করা যায় না। সুতরাং বলিতে হয়, জল জিনিষটা, অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজনের মিলনে উৎপন্ন। যে-কোন জিনিষকে বৈজ্ঞানিকদিগের হাতে ফেলিয়া দিলে, সেটি কোন্ কোন্ মূলপদার্থের যোগে উৎপন্ন তাহা ইঁহারা ঐ প্রকার পরীক্ষায় বলিয়া দিতে পারেন। শিলা মৃত্তিকা বৃক্ষ তৃণ ধাতু অধাতু কোন জিনিষই ইঁহাদের পরীক্ষা এড়াইয়া থাকিতে পারে না, আত্মপ্রকাশ করিতেই হয়।

বলা বাহুল্য, জগতে যত জৈব ও জড় পদার্থ আছে বৈজ্ঞানিকগণ আজও নিঃশেষে তাহাদিগকে বিশ্লেষ করিতে পারেন নাই, সকলগুলিকে খুঁজিয়া পরীক্ষাশালায় বিশ্লেষ করাও বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু যেগুলিকে বিশ্লেষ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ধরা পড়িয়াছে। জীব হইতে উৎপন্ন পদার্থমাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ইঁহারা প্রত্যেকটিতেই কয়েকটিমাত্র মূলপদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেছেন। হরিণের শিঙ্, ময়ূরের পালক, আমের আঁটি, আঙুরের রস, মাথার মগজ, ঘাসের বীজ, বনমানুষের লেজ, চাম্‌চিকার ডানা, খরগোসের মাংস; টিকটিকির ঠ্যাঙ্, এবং এদিকে দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, চাল, ডাল, মাছ, তেল, সরভাজা, সরপুরিয়া, খাসাগোল্লা, মিহিদানা, পোলাও, কারি, কালিয়া প্রভৃতি জীব হইতে উৎপন্ন যে-কোন জিনিষ লইয়া পরীক্ষা করিয়া ইঁহারা তাহাতে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পদার্থ ব্যতীত অপর কোন নূতন পদার্থের চিহ্ন মাত্র দেখিতেছেন না। এই নির্দ্দিষ্ট পদার্থগুলির সংখ্যাও খুব অধিক নয়। একটু অঙ্গারক বাষ্প, একটু জল, একটু এমোনিয়া, একটু অক্সিজেন্, একটু গন্ধক ও ফস্‌ফরস্ এবং কখন কখন একটু আধটু আকরিক পদার্থ ব্যতীত কোন জৈব জিনিষে অপর পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাজেই ঐ কয়েকটি পদার্থের যোগে যে, জৈব জিনিষ মাত্রই প্রস্তুত তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু কয়েকটিমাত্র সুপরিচিত

পদার্থেরই মিলনে সহস্র সহস্র বিচিত্র জিনিষের উৎপত্তির কথাটা শুনিলে যেন মনে খট্‌কা লাগে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় যেন এই প্রকার,—ছানা ও চিনি লইয়া ময়রার দল ভিয়ানে বসিয়া গিয়াছে, ঐ দুই অপূর্ব্ব পদার্থের যোগে যেন এক খোলায় হইল খাসাগোল্লা, এক খোলায় হইল পাঁপর ভাজা, এক খোলায় হইল ঢাকার পরেটা, এক খোলায় হইল মাগুর মাছের ঝোল এবং শেষের খোলায় হইল পদ্মগন্ধ কুন্তলীন তৈল। এপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার ত আমরা এ জগতে দেখিতে পাই না। পাণ, চূণ, খয়ের ও মসলার যোগে সুস্বাদু পাণের খিলিই প্রস্তুত হয়, এগুলির মিলনে কোনদিন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ, ক্ষীরের লাড়ু বা অপর কিছু প্রস্তুত হইল, এমন ত কোন দিন দেখা যায় নাই এবং শুনাও যায় নাই।

কয়েকটি মাত্র পদার্থের যোগে সৃষ্টির প্রত্যেক বিচিত্র জৈব পদার্থের উৎপত্তির অসম্ভবতার কথা তুলিলে বৈজ্ঞানিকগণ নীরব থাকেন না। তাঁহারা বলেন,—ঐযে ময়রার ভিয়ানের উদাহরণ দিলে, তাহার সহিত বৈজ্ঞানিকের ভিয়ানের মিল নাই। ময়রা ঘৃত, চিনি ও সুজি ভাগে ভাগে লইয়া মোহনভোগ প্রস্তুত করে। জিনিষটা খুবই উপাদেয় হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মোহনভোগে ঘৃত ঘৃতই থাকে, চিনি চিনিই থাকে এবং সুজি সুজিই থাকে। এই তিন জিনিষের একটা উপর-উপর মিশ্রণে মোহনভোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন্ এবং এক পরমাণু অক্সিজেন্ লইয়া ভিয়ানে বসেন, তখন এই দুই পদার্থের যোগে এমন একটা জিনিষ হয়, যার সঙ্গে অক্সিজেন্ বা হাইড্রোজেন কাহারো মিল থাকে না। বৈজ্ঞানিক-ভিয়ানের রকমই এই প্রকার। যে-সকল মাল-মসলায় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাদের সহিত দ্রব্যের মিল থাকে না; না আকারে, না গুণে। তার পর আবার পরিমাণ লইয়া কথা-বার্ত্তা আছে। এক সের ছানার সহিত

আধ সের চিনি মিশাইয়া গোল্লা প্রস্তুত করিলে, বেশ ভাল গোল্লাই হয়। কিন্তু সেই এক সের ছানার সহিত এক সের চিনি মিশাইলে, তাহা কখনই গুড়ে মণ্ডায় পরিণত হয় না,—গোল্লাই হয়, না হয় জিনিষটা একটু শক্ত হয়, মিষ্ট একটু বেশি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ভিয়ানে, মাল-মসলার ওজনের একটু কম বেশিতে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জিনিষ প্রস্তুত হইয়া পড়ে।

মনে করা যাউক, দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও একটি অক্সিজেনের পরমাণু লইয়া বৈজ্ঞানিক কোন পদার্থ প্রস্তুত করিতে বসিলেন। এগুলির মিশ্রণে অণুপ্রমাণ জল উৎপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ঐ দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত এক পরমাণু অক্সিজেন্ না মিশাইয়া যদি দুই পরমাণু অক্সিজেন্ মিশানো যায়, তাহা হইলে আর জল প্রস্তুত হয় না। এমন একটা জিনিষ হয়, যাহার সহিত জলের অতি দূর সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। মূলপদার্থের এই প্রকার বিচিত্র মিলনে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জৈব পদার্থমাত্রেরই মালমসলা একই বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সেগুলি মিশে বলিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। কেবল জৈব নয়, জড়সৃষ্টির বৈচিত্র্যেরও উহাই কারণ। তবে অজৈব জিনিষ কি কি উপাদানে প্রস্তুত তাহা নির্ণয় করিয়া আবার সেই সকল উপাদানকে একত্র করিয়া আমরা সেটিকে যেমন পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে পারি, জৈব জিনিষকে তাহা পারি না। এগুলিকে আমরা ভাঙ্গিতে পারি; কোন্ কোন্ মূল উপাদান তাহার ভিতর আছে তাহা নির্ণয় করিয়া নিক্তির ওজনে সেগুলিকে মাপিতেও পারি, কিন্তু যখন ঠিক সেই ওজনের মালমসলা সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞানাগারের খোলায় ভিয়ান আরম্ভ করি, তখন যে জৈব জিনিষের উৎপত্তির আশা করিতেছিলাম তাহা জন্মায় না। তাহা

হইলেই হইল, জৈব পদার্থকে আমরা ভাঙ্গিতে পারি কিন্তু গড়িতে পারি না।

একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝানো যাউক। জল একটা অজৈব জিনিষ। বিজ্ঞানাগারে ইহাকে বিশ্লেষ করিলে, দুই পরমাণু হাইড্রোজেন্ ও এক পরমাণু অক্সিজেন্ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখন যদি আমরা দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত এক পরমাণু অক্সিজেন্ মিশাই তাহা হইলে ঠিক এক অণু প্রমাণ জল গড়িয়া তুলিতে পারিব। কিন্তু জৈব পদার্থে এই প্রকার সংগঠন-কার্য্য চালানো যায় না। চিনি একটা জৈব পদার্থ, আমাদের দেশে প্রধানত ইক্ষুরস হইতেই ইহার উৎপত্তি। জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাঙ্গিলে, বারো পরমাণু অঙ্গার, বাইশ পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এগারো পরমাণু অক্সিজেন্ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখন যদি কেহ অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনকে ঠিক ঐ প্রকারে ওজন করিয়া মিশাইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিষ প্রস্তুত হয়, চিনি হয় না। হিতোপদেশের রাজপুত্র মৃত পশুর অস্থি যোজনা করিতে পারিতেন, শুষ্ক অস্থিতে মাংসও লাগাইতে পারিতেন, পারিতেন না কেবল প্রাণ দিতে। আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ হাড়, মাংস, প্রাণ কিছুই প্রস্তুত করিতে পারেন না। পারেন কেবল ভাঙ্গিতে। প্রকৃতিদেবী অন্তঃপুরে বসিয়া কি কৌশলে আমাদের অতি সুপরিচিত অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্, হাইড্রোজেন্, অঙ্গার প্রভৃতিকে মিলাইয়া, লতাপাতা পুষ্পফল নরবানর গড়িতেছেন, তাহা আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ আজও জানিতে পারেন নাই। জীবনসৃষ্টির কৌশল এক প্রকৃতিই জানেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দুই চারিটি জৈব পদার্থ বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত করিয়াছেন সত্য, যথা,—রেশম, কর্পূর, নীল, রবার,—কিন্তু আসল জিনিষের সহিত এই এই কৃত্রিম দ্রব্যগুলির অবিকল মিল দেখা

যায় না। কাজেই বলা যাইতেছে না যে, ইঁহারা সৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাহা হউক, অমৃত ও গরলের কথা উপস্থিত করিয়া অনেক দূরে আসা গিয়াছে, আবার অমৃত ও গরলে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। অমৃতের অনেক কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখন গরল জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিকগণ কি বলেন, আলোচনা করা যাউক। ইঁহারা অধিকাংশ জৈব গরল অর্থাৎ যেমন সাপের বিষ, একোনাইট্, আফিং ইত্যাদিকে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষ করিয়া ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন ও মিষ্টান্নাদির সকল উপাদানগুলিই বিষে দেখিতে পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, খুব ভাল পুষ্টিকর সুখাদ্যে উপাদানগুলি যে পরিমাণে মিশানো থাকে, অনেক বিষপদার্থে উপাদানগুলিকে অবিকল সেই পরিমাণেই মিশ্রিত দেখা যাইতেছে। খুব উৎকৃষ্ট দধিতে যে পরিমাণে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গারাদি মিশ্রিত থাকে, হয় ত গোখুরা সাপের তাজা বিষে ঐসকল মূলপদার্থই ঠিক্ সেই পরিমাণেই মিশ্রিত দেখা যায়। এখন পাঠক বুঝিবেন, কেন আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা অমৃত ও গরলকে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া একই কোটায় ফেলিতে চাহেন।

যাহা হউক, অমৃত ও বিষের উপাদান যেন একই হইল, এবং উপাদানগুলির ওজনও যেন একই দেখা গেল ;—এখন একই পরিমাণে মিশিয়া কেন একটিকে বিষ এবং অপরটিকে অমৃতের গুণ দেয় দেখা যাউক ; জীবজগতের লীলার রহস্য এক লীলাময় পরমেশ্বরের জানা আছে, সেই লীলার মূলে মানুষের প্রবেশাধিকার নাই, এই আংশিক সত্য কথাটা বলিলেই "কেন"র উত্তর পাওয়া যায়। এপর্য্যন্ত মানুষ ঐপ্রকার উত্তর দিয়াই মনকে শান্ত রাখিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। ইঁহারা দেখিতে চাহেন কেবল প্রকৃতির সহজ ও সুস্পষ্ট নিয়মের ধারা

ও কলের ঝন্‌ঝনানি। রহস্যকুহেলিকাবৃত সৃষ্টির যে-সকল লীলা দেখিয়া সাধারণ মানুষ পুলকিত হইয়া পড়ে, এবং বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনা হইতেই মাথা নত করে, সেই লীলা দেখিলেই বৈজ্ঞানিকের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়। তিনি দেখিতে চাহেন, কোন্ প্রাকৃতিক যন্ত্রে কোন্ নিয়মে ঐ লীলার বিকাশ হইতেছে। কাজেই যখন অমৃত ও বিষের উপাদান অবিকল একই দেখা গেল, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে পরীক্ষার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, এবং শেষে স্থির হইয়াছিল, উহাদের উপাদান একই বটে কিন্তু প্রত্যেকটিতে যে প্রকারে পরমাণু সজ্জিত আছে, তাহা এক নয়। এইজন্যই অমৃত ও গরলের গুণে এতটা পার্থক্য।

এখন জীবদেহে গরল ও অমৃতের কার্য্য কিপ্রকার আলোচনা করা যাউক। ইহার জন্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে। কারণ বিষয়টির সহিত রসায়নশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব জড়ানো আছে। মূলপদার্থ মাত্রেরই পরমাণুর একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে, তাহারা একা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় থাকিতে চায় না। কেহ দুই হাত বাড়াইয়া, কেহ তিন, বা চার, পাঁচ ও ছয় হাত বিস্তৃত করিয়া অপর পরমাণুর সহিত মিলিতে চেষ্টা করে। হাতে হাতে জোড় বাঁধিয়া মিলিয়া গেলে, পরমাণু সাম্যাবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাদের মধ্যে আর চঞ্চলতা দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন পরমাণুগণ এই সাম্যাবস্থায় (Saturated Condition) আসে, তখন তাহাদের রাসায়নিক কার্য্যও লোপ পাইয়া যায়। আমরা যাহাকে জীবন বলি, তাহা রাসায়নিক কার্য্য লইয়াই। জীবশরীর যে-সকল পরমাণু দ্বারা গঠিত, সেগুলি সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং অপর পরমাণুর সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এই মিলন যখন কোন প্রকারে হইয়া যায়, তখনই জীবের মৃত্যু ঘটে। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু প্রভৃতি জড় পদার্থের পরমাণুতে এই মিলন হইয়াই আছে, এজন্যই ইহারা নির্জীব।

এখন মনে করা যাউক, কোটী কোটী চঞ্চল পরমাণু দ্বারা যে জীব-দেহ গঠিত রহিয়াছে, তাহাতে এমন একটি পদার্থ প্রবেশ করিল, যাহার পরমাণু জীবপরমাণুর সহিত মিলিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহাতে উভয়ের পরমাণুই সাম্যাবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে—জীবের মৃত্যু হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জীবশরীরে বিষের এই প্রকার কার্য্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলেই দেহের মুক্ত পরমাণুগুলির সহিত স্থায়িভাবে মিলিয়া যায়, কাজেই ইহার পর আর রাসায়নিক কার্য্য চলে না; প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যাহা সুখাদ্য তাহা দেহে প্রবেশ লাভ করিলে শরীরের পরমাণুর সহিত সে-গুলির ঐপ্রকার স্থায়ী মিলন ঘটে না, কাজেই অমৃতপানে জীবের মৃত্যু হয় না।

এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান্ অধ্যাপক এর্লিক্ (Ehrlich) সাহেব যে এক নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, সেটিও উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। জীবের শরীর কতকগুলি কোষের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। একএকটি কোষ যেন একএকটি ক্ষুদ্র কারখানার ঘর, তাহাতে যে কত রাসায়নিক কার্য্যে কত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না; তা ছাড়া কোন্ প্রণালীতে ঐসকল কার্য্য চলিতেছে তাহা কল্পনা করা ব্যতীত এখন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। এর্লিক্ সাহেব বলিতেছেন, প্রত্যেক জীবকোষের গায়ে অদ্ভুতশক্তি-সম্পন্ন কতকগুলি অণু আছে। এই অণুগুলির ভিতরে যে-সকল পরমাণু আছে সেগুলি স্থায়িভাবে পরস্পরের সহিত মিলিয়া থাকে না। প্রা ণ-রক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তাহা টানিয়া লইয়া ইহারা জীবকোষে চালাইয়া দেয়; কোষ তাহা দেহস্থ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। কাজেই দাঁড়াইতেছে এই যে, উক্ত অণুগুলিই বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া কোষের বৃদ্ধিকার্য্যে সাহায্য করে, এবং ইহাদের ভিতরকার পরমাণুর মধ্যে স্থায়ী বন্ধন নাই বলিয়াই, ক্ষণিকের জন্য পুষ্টিকর জিনিষের

পরমাণুর সহিত মিলিয়া সেগুলিকে কোষের ভিতর চালাইতে পারে। এরলিক্ সাহেবের মতে প্রাণিদেহে বিষ প্রবেশ করিলেই কোষসন্নিহিত অণুগুলির এই অদ্ভুত ক্ষমতা লোপ পাইয়া যায়; বিষের পরমাণুর সহিত উক্ত অণুগুলির পরমাণু এমন স্থায়িভাবে মিলিয়া যায় যে, তখন আর কোন পুষ্টিকর খাদ্য জীবকোষে প্রবেশ করিবার পথ পায় না। কাজেই জীবকোষের ক্রিয়া লোপ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য

আকাশের নীলিমা, বৃক্ষলতাতৃণের শ্যামলতা, পশুপক্ষীর দেহের বিচিত্র বর্ণ, সব মিলিত হইয়া জগতে দিনের পর দিন যে এক রঙের খেলা দেখাইতেছে, তাহা না থাকিলে বোধ হয় পৃথিবীর অর্দ্ধেক আনন্দ কমিয়া যাইত।

মনে করা যাক, জলস্থল আকাশ, সজীব-নির্জীব, তরুগুল্ম, সকল বস্তুই যেন বরফের ন্যায় শ্বেত বা সমুদ্রের ন্যায় নীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই একঘেয়ে রঙ্ আমাদের চক্ষুকে যে কত পীড়া দিত তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ফোটোগ্রাফের এক-রঙা ছবি প্রকৃতিকে নিখুঁত করিয়া আঁকে এবং নিপুণ চিত্রকর সেই প্রকৃতিকেই কল্পনার চক্ষে দেখিয়া রঙিন করিয়া নকল করে,—কিন্তু দর্শক আসলের চেয়ে নকলকেই আদর করে অধিক। বলা বাহুল্য ইহাকে দর্শকের বিচারমূঢ়তা বলা যায় না; আমাদের চক্ষু যে বর্ণের লীলা দেখিবার জন্য লালায়িত, তাহা এক-রঙা ফোটোগ্রাফে নাই, তাই ফোটোগ্রাফের এত অনাদর।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, রঙের খেলা দেখাইবার জন্য প্রকৃতি ঋতুসম্বৎসর ধরিয়া বৃক্ষের বীজে ও প্রাণীর কোষে যে আয়োজন করেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? জগৎকে সুন্দর ও মধুর করিবার জন্য প্রকৃতিতে যে শত শত আয়োজন আছে, ইহা তাহাদেরি মধ্যে একটি বলিলে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ প্রকার ব্যাখ্যা দিয়া তৃপ্ত হন না। প্রাণিদেহে এত জটিল-যন্ত্রের সমাবেশ কেন? এই প্রশ্নের

উত্তরে যদি কেহ বলেন, প্রাণীকে জীবিত এবং সুস্থ রাখিবার জন্যই দেহে এত ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রাদি স্থান পাইয়াছে, তাহা হইলে উত্তরটা বৈজ্ঞানিকোচিত হয় না; কোন শারীর-যন্ত্র জীবনে কোন্ ক্রিয়া করিতেছে, তাহা দেখানোই বৈজ্ঞানিকের কাজ। এইজন্য জগৎকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া প্রকৃতি সৃষ্টিরক্ষার কি সহায়তা করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন ধরিয়া গবেষণা করিতেছেন। ইহাতে যথেষ্ট সুফল লাভ করা গিয়াছে সত্য; কিন্তু সকল প্রহেলিকার মীমাংসা হয় নাই।

যে-সকল মহাপণ্ডিত আজীবন আলোক ও বর্ণতত্ত্ব লইয়াই কাটাইয়াছেন, বর্ণ-বৈচিত্র্যের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সদুত্তর দিতে পারেন না। ইঁহারা বলেন, এই যে শুভ্র সূর্য্যালোক দেখিতেছ, উহা এক-রঙা আলো নয়; লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনে পর্য্যন্ত অনেক মূল বর্ণরশ্মি মিলিয়া এই শ্বেতরশ্মি উৎপন্ন হইয়াছে। তে-শিরা কাচের উপর সূর্য্যের সাদা আলো ফেলিলে, ইহার সেই মৌলিক রঙিন্ বর্ণরশ্মিগুলা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। যে জিনিষটা লাল, তাহার বিশেষ গুণ হইতেছে এই যে, শুভ্র সূর্য্যালোককে বিশ্লেষ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কেবল লাল আলোকটিকে প্রতিফলিত করা এবং অবশিষ্ট রশ্মিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া লোপ করা। কাজেই প্রতিফলিত লাল রশ্মিতে আমরা দ্রব্যটিকে লাল দেখি। যে বস্তু নীল সেটিও ঠিক এই প্রকারে শুভ্র সূর্য্যরশ্মির নীল আলোকটিকে প্রতিফলিত করিয়া অপরগুলিকে হরণ করিয়া ফেলে।

বর্ণোৎপত্তির এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে লাল নীল প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তির কথা বুঝা যায় বটে, কিন্তু গোলাপের গঠনোপাদানের কোন্ বৈচিত্র্যে একটি গোলাপকে আমরা লাল এবং আর একটিকে সাদা দেখি তাহার তত্ত্ব আলোকবিদের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া

একটি ফুলকে লাল এবং অপরটিকে সাদা করায় প্রকৃতির কোন্ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে, তাহারও কিনারা হয় না। সমগ্র বর্ণতত্ত্বটাই মনে হয় যেন আজও রহস্য-যবনিকার অন্তরালে আছে।

যাহা হউক পশুপক্ষী ইত্যাদির বর্ণবৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আজকাল কাগজপত্র সভাসমিতি ও কথাবার্ত্তায় তাহার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। তত্ত্বটা এই যে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর গায়ে যে নানা রঙ্ দেখা যায়, তাহা কেবল প্রবল শত্রুর কবল হইতে দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে রক্ষা করিবার একটা ব্যবস্থা মাত্র। পক্ষীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া জীবিত থাকিবার জন্যই ঘাসের ভিতরকার ফড়িঙের রঙ্ সবুজ এবং শুষ্ক তৃণমধ্যস্থ ফড়িঙের রঙ্ পাটল হইয়াছে। শিকারী জন্তুর খরদৃষ্টি এড়াইয়া নিরীহ শশকের টিকিয়া থাকা বড় সহজ নয়। এই প্রাণিকুলকে শত্রুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রকৃতি তাহাদের দেহ শুষ্কতৃণের বর্ণের ন্যায় লাল্‌চে লোমে আবৃত রাখিয়াছেন; একবার শুষ্ক লতাপাতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শিকারী মানুষ বা শিকারী জন্তু শশককে চিনিয়া বাহির করিতে পারে না। বহুরূপী সরীসৃপ এবং কয়েক জাতীয় ভেক ক্ষণে ক্ষণে নিজেদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইহার কারণ-প্রসঙ্গেও জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ কথাই বলেন;—বহুরূপী যখন আহারান্বেষণে ডালে ডালে বেড়ায় তখন তাহার গায়ের রঙ্ সবুজ থাকে এবং মাটীতে নামিলেই রঙ্ ঠিক্ মাটীর রঙের মত হইয়া দাঁড়ায়।

কিপ্রকারে এইসকল প্রাণী ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের রঙের সহিত নিজেদের রঙ্ মিলাইয়া আত্মত্রাণ করে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, প্রাণীর চর্ম্মে এক প্রকার বর্ণকোষ থাকে, তাহাতে যে বর্ণসঞ্চিত হয় প্রাণীর চর্ম্মও

ঠিক্ সেই বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পড়ে। আমাদের গায়ের বর্ণকোষের রঙ্ কালো না হউক কতটা ময়লা; তাই আমাদের রঙ্‌টাও ময়লা। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদের বর্ণকোষের রঙ্ শ্বেত, তাই তাহাদের গায়ের রঙ্ সাদা। যাহা হউক, প্রাচীন পণ্ডিতগণ বহুরূপীর বর্ণপরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিতেন,—এই প্রাণিগণ যখন কোন বিশেষ বর্ণযুক্ত পদার্থের মধ্যে আসিয়া লুকায়, তখন চারিপার্শ্বের রঙ্ প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের গায়ে লাগিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাতেই তাহাদের গায়ের বর্ণকোষের রঙ্ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের রঙের অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এখন আর এই সিদ্ধান্তটিকে গ্রাহ্য করিতেছেন না। ইঁহারা বলিতেছেন, বহুরূপী তাহার চক্ষু দ্বারা যে বর্ণ দেখে, তাহা মস্তিষ্কের এক নির্দ্দিষ্ট অংশকে উত্তেজিত করে এবং পরে এই উত্তেজনা বিশেষ স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা চর্ম্মের বর্ণকোষগুলিতে নীত হইলে গায়ের রঙ্ বদ্‌লাইয়া যায়।

আধুনিক সিদ্ধান্তটিই যে অভ্রান্ত কয়েকজাতীয় বহুরূপী প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ওয়ের (Dr. Weir) তাহা দেখাইয়াছেন। ইনি বিষপ্রয়োগ করিয়া কয়েকটি বহুরূপীর মস্তিষ্ক অসাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহার ফলে উহাদের বর্ণপরিবর্ত্তনশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তা' ছাড়া তিনি আরো দেখাইয়াছিলেন যে, বহুরূপী জাতীয় যে-সকল প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি কম, তাহারা কখনই সহজে বর্ণপরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কাজেই এখন স্বীকার করিতে হইতেছে, চারিপার্শ্বের বর্ণরশ্মি চক্ষুতে আঘাত করিলে মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে যে উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাহাই স্নায়ু দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিবাহিত হইলে দেহের বর্ণপরিবর্ত্তন ঘটে।

বহু গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইলেও এখন ইহার সাহায্যে কেবল কতকগুলি প্রাণীর বর্ণপরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা

পাওয়া যাইতেছে। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণিগণ পক্ষযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কিছুদিন স্বরচিত আবরণের মধ্যে নিদ্রিত থাকে। এই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভিতরে ভিতরে দেহের পরিবর্ত্তন হইলে তাহারা প্রজাপতির আকারে গুটি বা আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিনিদ্র অবস্থাতেও পতঙ্গের গাত্রাবরণের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য, জীবনের এই অবস্থায় প্রজাপতিদের দৃষ্টিশক্তি থাকে না, তথাপি ইহারা কি প্রকারে পার্শ্বের রঙের সহিত নিজের দেহের রঙ্ মিলাইয়া অবস্থান করে, তাহার ব্যাখ্যান পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পাওয়া যায় না। মেরু প্রদেশের জীবজন্তুর বর্ণ প্রায়ই শ্বেত। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানেও বলা যায় না যে, চারি পার্শ্বের তুষাররাশির সহিত বর্ণ মিলাইয়া রাখিবার জন্য ইহারা বহুরূপীর মত নিজেদের বর্ণ পরিবর্ত্তিত করে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অপর ব্যাখ্যান দিয়া থাকেন। সূর্য্যালোকই যে অনেক জীবদেহে রঙ্ ফলায় তাহার প্রমাণ আছে ;—অন্ধকার ঘরে একটি গাছ রাখিয়া দাও, কয়েকদিন পরে তাহার ডাল ও পাতার রঙ্ স্পষ্ট সাদা দেখা যাইবে। এই প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মেরু প্রদেশের আকাশ প্রায় সর্ব্বদাই মেঘ বা তুষারকণিকায় আচ্ছন্ন থাকে, এজন্য সে দেশে সূর্য্যালোক দুর্লভ। কাজেই ইহাতে জীবজন্তুর বর্ণ সাদা হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে অপর্য্যাপ্ত সূর্য্যালোকে যত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পপত্র জন্মায়, শীতপ্রধানদেশে তত দেখা যায় না। ইহাও বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্ব্বোক্ত উক্তির প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অনুমানটিকে সকল স্থানে প্রয়োগ করা যায় না। গভীর জলে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, অথচ সেইসকল স্থানের মৎস্য প্রভৃতিকে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। প্রাণীর রক্ত লাল, কিন্তু ইহা কখনই সূর্য্যের মুখ দেখে না ; নির্জীব জিনিষকে যদি টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে যে-সকল আকরিক প্রস্তর

ভূগর্ভের অন্ধকারে থাকিয়া বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের বর্ণোৎপত্তির কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুসুরি খেঁসারি, ও মটরের ডাল আজন্ম বীজকোষের মধ্যে আবৃত থাকিয়া কেন এত সুন্দর রঙে রঞ্জিত হয়, তাহারো কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

যাহাই হউক শত্রুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে, কতকগুলি প্রাণীর দেহে বিচিত্র বর্ণ যোজিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া রঞ্জিত জীবমাত্রেরই দেহাবরণের বর্ণ তাহার আত্মরক্ষার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে একথা বলা যায় না। সামুদ্রিক জলচর পক্ষীমাত্রেরই বর্ণ শ্বেত। ঈগল্ পাখী সাদা, আমাদের দেশের বক সাদা। এই শ্বেতবর্ণকে কখনই আত্মরক্ষার ছদ্মবেশ বলা যায় না। গল্ যখন নীলসমুদ্রে ভাসে, তখন তাহাকে চিনিয়া লইতে শত্রুপক্ষের অণুমাত্র কালবিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে না। স্থলচর পক্ষীদের ত কথাই নাই;—কাক, কোকিল, শালিক্, ফিঙে, হাঁড়িচাঁচা, মাছরাঙা, চন্দনা, ময়ূর, মোরগ, পায়রা, ঘুঘু, নীলকণ্ঠ, প্রভৃতি পক্ষীর পালকের বর্ণ তাহাদের পরম শত্রু। আমাদের সুপরিচিত পাখীদের মধ্যে কেবল টিয়ার রঙ গাছের রঙের মত সবুজ এবং ছাতারে ও চড়াইয়ের রঙ্ মাটির রঙের মত মেটে।

প্রাণী ছাড়িয়া উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও যথেষ্ট বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। গাছপালায় লতাপাতা পুষ্পফলের বর্ণলীলা দেখিয়া সত্যই অবাক্ হইতে হয়। কিন্তু কোন্ শক্তির অধীন হইয়া এবং কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক ঋতুতে উহারা নব নব উৎসববেশে সজ্জিত হইতেছে তাহা স্থির করা বড় কঠিন। বর্ষার শেষে, শীতে ও বসন্তে যে-সকল ফুল ফোটে প্রায়ই তাহাদের রঙ সাদা হয়,—শেফালি, গন্ধরাজ, মাধবী, মল্লিকা, কুন্দ, চামেলি, মালতী, ইহাদের সকলেরি রঙ্ সাদা। গ্রীষ্মের ফুল,—চাঁপা, অতসী, বলরামচূড়া, সোঁদাল, করবী প্রভৃতির

রঙ্ উজ্জ্বল ও বিচিত্র। যে-সকল উদ্ভিদের ফল আমাদের খাদ্য, তাহাদের পুষ্পের বর্ণ প্রায়ই শ্বেত হয়; বেল, কয়েতবেল, নিচু, আম, পেঁপে, কুল, পেয়ারা, লেবু, নারিকেল, খর্জ্জুর, চালিতে, করমচা, জামরুল, গোলাপ-জাম, ইহাদের সকলেরি ফুল সাদা। কেবল বেগুন, শশা, বিলাতি কুমড়া, ঝিঙে ও দাড়িম তাহাদের রঙিন ফুল লইয়া বাগানের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু এক দাড়িম ও শশা ছাড়া এই শেষোক্ত ফলগুলির মধ্যে কোনটিকেই অপক্ক অবস্থায় খাওয়া যায় না। ঋতুর সহিত এবং ফলের স্বাদুতার সহিত ফুলের বর্ণের সম্বন্ধ কোথায় তাহা আজও স্থির হয় নাই; কিন্তু একটা যে নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে তাহা সুনিশ্চিত।

ডারুইন্ যে অভিব্যক্তির নিয়ম জীবজগতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আজকাল সকল ব্যাপারেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন এক আদিম জীব হইতে এই বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই প্রকার এক মূল বর্ণ হইতে এখনকার ফুলের বিচিত্র বর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, একথাটা মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক হেন্স্লো (Henslow) সাহেবের মনে ঠিক এই কথাটির উদয় হইয়াছিল। তিনি বড় বড় অরণ্যের বনফুলের বর্ণপরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, উহাদের অনেকের বর্ণ পীত। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলিতেছেন, পুষ্পমাত্রেরই আদিম বর্ণ পীত; নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এবং চাষ আবাদের গুণে বুনো হল্‌দে রঙটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন নানা বর্ণে পরিণত হইয়াছে। উদ্যানে আনিয়া যত্ন করায় যে-সকল বনজ উদ্ভিদের ফুলের বর্ণ এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অযত্নে ফেলিয়া রাখিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে তাহাদেরি ফুল আধুনিক বিচিত্র-বর্ণ ত্যাগ করিয়া প্রাচীন পীতবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশের শেয়ালকাঁটা, বাবলা

প্রভৃতি বুনো গাছের ফুল পীত। যে চন্দ্রমল্লিকার এখন বড় বড় বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, এককালে তাহা বন্য ছিল এবং তখন তাহার ফুল খুব ছোট হইয়া জন্মিত। আজও ইহার জ্ঞাতিবর্গকে অনেক জঙ্গলে ছোট ছোট হরিদ্রাভ ফুল সহ দেখা যায়। বাগানে চন্দ্রমল্লিকা যত্ন না করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার ফুল ছোট হইয়া আসে এবং তাহার রঙ্ সেই প্রাচীন পীতবর্ণে পরিণত হয়।

প্রস্ফুটিত হইবার সময়ের সহিত পুষ্পের বর্ণের যে কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। খোঁজ করিলে প্রাণীদের মধ্যেও ঐ প্রকার একটা বর্ণবিভাগের লক্ষণ ধরা পড়ে। মাংসাশী বন্য জন্তুর বর্ণ প্রায়ই একরঙা হয় না,—ব্যাঘ্র, হায়েনা, বনবিড়াল, জাগুয়ার প্রভৃতি অনেকেরই দেহ বিচিত্র বর্ণের লোমে আবৃত থাকে। উদ্ভিদ্‌ভোজীদের মধ্যে রঙিন্ জন্তু নাই একথা বলা যায় না,—জেব্রা, জিরাফ, এবং কয়েক জাতীয় হরিণের রঙ মাংসাশীদের মতই বিচিত্র; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। গো-জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, গোরুর গায়ে ডোরা ও চিতে উভয়ই দেখা যায় বটে, কিন্তু ঘোড়ার গায়ে কখনই জিরাফ্ বা জেব্রার মত ডোরা রঙিন্ দাগ জন্মে না। এগুলিকে কখনই আকস্মিক ব্যাপার বলা যায় না; খুব সম্ভবতঃ ইহাদের মূলে কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে; কিন্তু সে রহস্য যে কি, তাহা আজও কেহ জানে না। পূর্ব্বোক্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যগুলিকে আত্মরক্ষার ছদ্মবেশ বলিলে অন্যায় বলা হয়।

যে-সকল গোরুর গায়ে দুই বা তিন প্রকার রঙ্ থাকে, তাহাদের দেহের বর্ণবিন্যাসে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহাদের ঘাড় বা মাথার রঙ্ কখনই দেহের অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা ফিকে হয় না। পিছনটা লাল বা কালো এবং ঘাড় ও মাথা সাদা—এ প্রকার গোরু

দুর্লভ। সাদায় ও কালোতে মিশানো পালিত শূকর প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু বন্য-শূকরে কখনই একাধিক রঙ্ দেখা যায় না। পাহাড়ের বন্য ছাগ কদাচিৎ বিচিত্র রঙের লোমে আবৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কালো ঘোড়ায় সাদা চিতি অর্থাৎ তিলক-চিহ্ন দুর্লভ নয়, কিন্তু ইহা প্রায়ই চারিখানি পা ও মস্তকে আবদ্ধ থাকে; কালোর উপরে সাদা চিতি, ঘোড়ার অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কদাচিৎ জন্মে।

এইসকল বর্ণ-বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যান জীবতত্ত্ববিদের নিকট পাওয়া যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যতই দম্ভ প্রকাশ করুন না কেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে এখনো এমন অনেক ঘটনা নিয়তই ঘটিতেছে যাহার ব্যাখান দিতে গেলে তাঁহাদের জ্ঞানে কুলায় না। জীবের বর্ণ-বৈচিত্র্যকে ঐ প্রকার একটি অব্যাখ্যাত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

বৃক্ষের চক্ষু

বাহির হইতে দেহে আঘাত-উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, প্রাণীর ন্যায় বৃক্ষগণও যে তাহা অনুভব করে, আমাদেরই দেশের মহাপণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লজ্জাবতী লতার শাখায় চিম্‌টি কাটিতে থাক বা শাখার কোন অংশ একটু পোড়াইয়া দাও, দেখিবে দূরের পাতাগুলি এই সকল অত্যাচারের বেদনায় গুটাইয়া আসিতেছে। এই বেদনাটা যে কি রকমের তাহা আমাদের জানা নাই, এবং বোধ হয় জানিবার উপায়ও নাই; কিন্তু চিম্‌টি কাটায় বৃক্ষদেহে যে একটা পরিবর্ত্তন সুরু করা যায়, তাহা যে দেহের ভিতর দিয়া চলিয়া দূরের পাতাগুলিকে গুটাইয়া দেয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি বসু মহাশয় ইহাও দেখাইয়াছেন যে, প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদের দেহও স্নায়ুজালে আবৃত। প্রাণীর কোন অঙ্গে বেদনা দিলে তাহা যেমন স্নায়ুসূত্রগুলির সাহায্যে বাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়, উদ্ভিদের দেহেও আঘাতের উত্তেজনা অবিকল সেই প্রকারে চলাচল করে। কিন্তু উদ্ভিদের চক্ষু আছে, এই কথাটি সম্পূর্ণ নূতন।

মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর দেহযন্ত্র ও ইন্দ্রিয়গুলি এক দিনে এত উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। বিজ্ঞানের কথা মানিলে স্বীকার করিতে হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসরের বহু পরিবর্ত্তনের ধারায় পড়িয়া মানুষ তাহার এখনকার এমন সুব্যবস্থিত চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি লাভ করিয়াছে। সুতরাং যে-সকল প্রাণী এখনও জীব-পর্য্যায়ের খুব নীচের

কোটায় অবস্থিত, তাহাদের দেহে মানুষের চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় সুব্যবস্থিত ইন্দ্রিয় না থাকিবারই কথা। মানুষের চক্ষুর সহিত পতঙ্গাদি ইতর প্রাণীর চক্ষুর তুলনা করিলে এই ভেদ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদ্-জাতিকে জীবপর্য্যায়ের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়া থাকেন, কাজেই মানুষ চক্ষুর সাহায্যে বাহিরের নানা বস্তু ও নানা বর্ণ দেখিয়া যে সৌন্দর্য্য অনুভব করে উদ্ভিদের তাহা প্রয়োজন হয় না। আঁধার হইতে আলোককে চিনিয়া লওয়া এবং কোন্ দিক্ হইতে আলোক আসিতেছে তাহা বুঝিয়া লওয়া যেমন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রধান কার্য্য, উদ্ভিদের চক্ষুর কার্য্যও কতকটা তদ্রূপ। বৃক্ষের চক্ষুকে মানব-চক্ষুর সহিত তুলনা করা যায় না, কিন্তু ইতর পতঙ্গদিগের চক্ষুর সহিত তুলনা করিলে, ইহাকে কোন অংশে হীন বলা যায় না।

জর্ম্মান্ অধ্যাপক হাবারল্যাণ্ড (Haberlandt) সাহেব উদ্ভিদের শরীরতত্ত্বের অনেক নূতন কথা প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বৃক্ষের চক্ষুর কথাটাও তিনি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। চক্ষুর মোটামুটি কার্য্য কি, তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাহিরের নানা পদার্থের ছবি চক্ষুর ভিতরে আনিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার কাজ এক প্রকার শেষ হইয়া যায়। অবশ্য মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চক্ষু যেমন জটিল, তাহার কার্য্যও সেই প্রকার বিচিত্র; কিন্তু সমগ্র প্রাণিজাতির চক্ষুর কার্য্য কি তাহা অনুসন্ধান করিলে, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটিই আমাদের নজরে পড়িয়া যায়।

পাঠকের অবশ্যই জানা আছে, বাহিরের দৃশ্যকে যখন আমরা কোন সংকীর্ণ স্থানে আনিতে চাই, তখন আমাদিগকে Convex Lens অর্থাৎ স্থূলমধ্য কাচ ব্যবহার করিতে হয়। ফোটোগ্রাফার যখন একটি চৌদ্দ পোয়া মানুষের ছবি একখানি ক্ষুদ্র কাগজের উপরে উঠাইতে চাহেন, তখন তিনিও ঐ স্থূল-মধ্য কাচ ব্যবহার করেন। তাঁহার

ক্যামেরার সম্মুখে সেই কাচ লাগানো থাকে, বাহিরের বৃহৎ বস্তুর ক্ষুদ্র ছবি ঐ কাচেরই সাহায্যে ছোট হইয়া ক্যামেরার ভিতরে আসিয়া পড়ে। আমাদের চক্ষু যখন বাহিরের ছবিকে ছোট করিয়া ভিতরে ফেলে তখন তাহাও ঐ কৌশল অবলম্বন করে; চক্ষুর ভিতরে অবশ্য স্থূলমধ্য কাচ থাকে না, কিন্তু কাচের মতই এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ এমন ভাবে চক্ষুর ভিতরে সজ্জিত থাকে যে, তাহা ক্যামেরার স্থূলমধ্য কাচখণ্ডেরই ন্যায় বাহিরের নানা দৃশ্যকে ছোট করিয়া অক্ষি-পর্দ্দার (Retina) উপরে ফেলে। সুতরাং বৃক্ষের কোন অঙ্গে যদি ঐ প্রকার স্থূলমধ্য স্বচ্ছ পদার্থ দেখা যায় এবং তাহা বাহিরের দৃশ্যকে ছোট করিয়া বৃক্ষদেহের ভিতরে ফেলিতেছে ইহাও যদি অনুসন্ধানে জানা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, গাছেরও চক্ষু আছে। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মান্ পণ্ডিতটি গাছের শাখাপত্রাদির ছালে অবিকল এই প্রকার চক্ষু আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ছালের উপরি ভাগে যে-সকল কোষ সজ্জিত থাকে তাহাদেরই মধ্যে কতকগুলি এক প্রকার অতি স্বচ্ছ রসে পূর্ণ থাকিয়া স্থূলমধ্য কাচের মত কার্য্য করে। ইহাতে যে কোষগুলির মধ্যে কেবল বাহিরের দৃশ্যাবলীর ক্ষুদ্র ছবি আসিয়া পড়ে তাহা নয়, বাহিরের সূর্য্যকিরণের তাপও ঐ স্থূলমধ্য স্বচ্ছ পদার্থের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া কোষে জমা হয় এবং ইহাতে উদ্ভিজ্জ-কোষ সক্রিয় হইয়া পড়ে।

বৃক্ষের পাতায় ও ছালে পরিব্যাপ্ত এই সহস্র সহস্র চক্ষুগুলি বাহিরের দৃশ্যের সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ছবি কোষের মধ্যে উৎপন্ন করিয়া কি কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা বলা কঠিন, কিন্তু তাই বলিয়া এই চক্ষুগুলি যে বৃথা ছবি উৎপন্ন করে তাহা কখনই বলা যায় না। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, সাধারণ মক্ষিকার মস্তকের দুই পার্শ্বে যে দু'টা বড় বড় চক্ষু দেখা যায়, সে গুলি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর সমষ্টি। মক্ষিকার প্রত্যেক

চক্ষুটি প্রায় চারি হাজার অতি ক্ষুদ্র চক্ষুর যোগে উৎপন্ন, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে এগুলিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। প্রজাপতির চক্ষু সংখ্যা আবার আরও অধিক। ইহাদের মস্তকের দুই পার্শ্বে যে দু'টা চক্ষু থাকে তাহাদের প্রত্যেকটি সতেরো হাজার ক্ষুদ্রতর চক্ষুর যোগে উৎপন্ন। মক্ষিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গগণ এই সহস্র সহস্র চক্ষুর সাহায্যে তাহাদের চারিদিকের দৃশ্যাবলীকে কি প্রকারে দেখে তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু দেহরক্ষার জন্য এই সকল চক্ষুর যে কোন প্রকার কার্য্য আছে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক হাবারল্যাণ্ড সাহেব বলিতেছেন, উদ্ভিদের পত্র ও শাখার উপরে যে অসংখ্য চক্ষু সজ্জিত রহিয়াছে সেগুলি পতঙ্গের চক্ষুর ন্যায়ই কার্য্য করে। যেদিন পতঙ্গের দৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের নিকটে সুস্পষ্ট হইবে, হয় ত সেই দিনই বৃক্ষের চক্ষুগুলির কার্য্য আমরা বুঝিতে পারিব।

মৃত্যুর নবরূপ

জীবজগতের প্রতি স্থূলভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যেন বংশ-রক্ষা করাই প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্মগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাণীই বল, আর উদ্ভিদ্‌ই বল, এক একটি সূক্ষ্ম জীবকোষ হইতে ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তি। এই এককোষময় জীবই ভ্রূণের মধ্যে বহুকোষ-বিশিষ্ট হইয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার পরে নিজেদের দেহ পরিণত হইলে তাহারাই আবার একাধিক এককোষময় নূতন জীবকে জন্ম দিয়া জীবনের কার্য্য সমাপন করে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে জীব যেন প্রকৃতির ত্যাজ্যপুত্র হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর ক্রোড়ই তাহাদের বিশ্রামের স্থান হয়। ওষধিজাতীয় সকল উদ্ভিদ্‌ই একবারমাত্র ফল প্রদান করিয়া এই প্রকারে মৃত হয় এবং অনেক ইতর প্রাণীও সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র সংসার-চক্রের আবর্ত্তনের সহিত জীবের জীবনটাও চক্রপথে আবর্ত্তিত হইতেছে। এককোষময় জীব হইতে আবার নূতন এককোষ-ময় জীবে পরিণতি, জীবজগতে আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। এই সকল দেখিয়া সত্যই মনে হয়, নিজের বংশের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মরিয়া যাওয়াই জীবনের সার্থকতা।

বলা বাহুল্য, জীবনের লক্ষ্য ও মৃত্যুসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি খাঁটি জড়বিদ্‌গণের স্থূল কথা। মাতাপিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট করা এবং শেষে নিজের জীবনের ধারা সন্তানের দেহে রাখিয়া দেহত্যাগ করা, উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর জীবনের লক্ষ্য

হইলেও, তাহা কখনই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। মানুষ যে উচ্চ বুদ্ধির অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বংশরক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন অতি অল্প। কাজেই প্রকৃতিদেবী নিজের হাতে যে অমূল্য শক্তিটুকু মানুষের দেহে যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন, অপর প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য তাহার ব্যবহার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। যাহা হউক এই কঠিন দার্শনিক ব্যাপারে প্রবেশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের অধিকার বহির্ভূত। আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে,—মৃত্যু। মৃত্যুর ন্যায় কঠোর সত্য বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

পৃথিবীর সকল প্রাণীই মানুষের মত জটিল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া জন্মে না। যাহাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা কিছুই নাই, এপ্রকার প্রাণীর সংখ্যা ভূমণ্ডলে বড় অল্প নয়। ইহারা অচেতন জড়কণার ন্যায় জলে বা স্থলে অবস্থান করে, কোন খাদ্যদ্রব্য গায়ে ঠেকিলে তাহার সারভাগ শোষণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদও দেখা যায় না, নিজেদের দেহগুলিকে খণ্ডিত করিয়া বংশবিস্তার করাই ইহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সার্থকতা বলিয়া মনে হয়। এই সকল প্রাথমিক প্রাণীর মৃত্যু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, মৃত্যুটা অতি সোজা ব্যাপার, তাহাতে জটিলতার লেশমাত্র বর্ত্তমান নাই। ঘৃতে উত্তাপ দিলে তাহা যেমন গলিয়া তরলাকার প্রাপ্ত হয়, ইহাদের মৃত্যুও যেন সেইপ্রকার। জীবনের কার্য্য শেষ হইলে তাহাদের দেহ অতি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে,—পঞ্চভূতে গড়া জিনিষ আবার পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। উচ্চপ্রাণীদের দেহের গঠন যেমন জটিল, তাহাদের মৃত্যুও তেমনি আকস্মিক ও ভয়ানক। ষ্টীম এঞ্জিনের মত একটা জটিল যন্ত্রের কোন কল-কব্জা খারাপ হইলে তাহা কতই বিকৃত স্বরে আর্ত্তনাদ করে এবং শেষে হঠাৎ তাহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ঢেঁকির মত কোন সরল যন্ত্রের বিকলতায় এত আর্ত্তনাদ, এত ঝন্‌ঝনানি এত ফোঁস্‌ফাঁস্ শব্দ

শুনা যায় না। উচ্চপ্রাণীর দেহ ষ্টীম এঞ্জিনের মতই জটিল, তাই তাহার দেহ-যন্ত্রের কোন অংশে একটু খুঁৎ হইলেই কল বন্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গের রক্তসঞ্চালন জীবনরক্ষার একটা প্রধান অবলম্বন, কাজেই রক্তের চলাচল বন্ধ হইলেই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। রক্তে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত কণিকাগুলি ভাসিয়া বেড়ায় তাহা অক্সিজেন্ বহন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয়, সুতরাং রক্তে যদি অক্সিজেন না থাকে তবে মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। অক্সিজেন্ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অতএব নিশ্বাসরোধ হইলেই প্রাণীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মা দেহপঞ্জর ত্যাগ করিলেই মৃত্যু ঘটে এই প্রকার ব্যাখ্যান দিয়া দার্শনিকগণ যেপ্রকার নিশ্চিন্ত হন, শারীরবিদ্‌গণ মৃত্যুর সেপ্রকার ব্যাখ্যান দিতে পারেন না। অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইঁহারা প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ে ও সকল অঙ্গে প্রাণ দেখিতে পাইয়াছেন। সমগ্র প্রাণিশরীর ইঁহাদের মতে প্রাণময়।

সম্প্রতি ফ্রান্সের এক বৈজ্ঞানিক-পরিষদে (French Academy of Medicine) ডাক্তার ক্যারেল্ (Dr. Alexis Carrel) মৃত্যুসম্বন্ধে যে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহাই বড়ই বিস্ময়াবহ। আজকাল আজ্‌গবি বৈজ্ঞানিক সংবাদের অভাব নাই, সংবাদপত্রের পাতা উল্‌টাইলেই অনেক অদ্ভুত খবর জানা যায়। কিন্তু ডাক্তার ক্যারেল্ একজন নামজাদা শারীরবিৎ এবং ফ্রান্সের একাডেমি অব্ মেডিসিন্ নামক পরিষৎটিও সর্ব্বদেশে সুপরিচিত; এই সকল কারণে নূতন কথাগুলির উপর আস্থা-স্থাপন করিতে হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ক্যারেল্ সাহেবই সদ্যোমৃত প্রাণীর দেহ হইতে মাংস ছিন্ন করিয়া তাহা জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। নানা প্রকার আরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া মাংসখণ্ড জীবনের লক্ষণ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং শেষে তিনি এই

মাংসখণ্ড জীবিত পশু-প্রভৃতির ক্ষত স্থানে জোড় লাগাইতেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বুঝিয়াছিলেন, যে দেহটিকে আমরা মৃত বলি তাহার অংশবিশেষ মৃত্যুর ভান করিয়া কিছুক্ষণ জীবিত থাকে। ইঁহারা মৃতদেহের এই জীবনকে "Intra-cellular Life" অর্থাৎ কোষের জীবন নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কার খুবই বিস্ময়কর, কিন্তু সম্প্রতি ডাক্তার ক্যারেল্ তাঁহার যে নবাবিষ্কারের বিবরণ দিয়াছেন তাহা আরও বিস্ময়জনক। ইনি দেখিয়াছেন, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে, কেবল মাংসপিণ্ডই জীবিত থাকে তাহা নয়; হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যন্ত্রগুলিকেও দেহ হইতে ছিন্ন করিলেও সেগুলিকে জীবিত রাখা যায় এবং দেহে সংযুক্ত থাকিলে তাহারা যে-সকল কার্য্য চালাইত, এই অবস্থায় তাহারা অবিকল সেই সকল কার্য্য চালায়। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তালে তালে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া দেহে রক্ত সঞ্চার করে; ফুস্‌ফুস্ বায়ু হইতে অক্সিজেন্ গ্রহণ করে এবং বিষময় অঙ্গারক বাষ্প দেহচ্যুত করে; পাকাশয়ের যন্ত্রগুলি খাদ্যের সার অংশ গ্রহণ করে এবং ইহা হইতে রক্তকণিকা প্রস্তুত করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল শারীরযন্ত্রগুলিকে দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া সাবধানে রাখিলে সেগুলি জীবিত থাকিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলিও দেখায়। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেগুলি জীবনের কার্য্য দেখাইতে থাকে।

এ পর্য্যন্ত জগতে যত বৃহৎ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আবিষ্কারকগণ এক একটা অবান্তর ব্যাপারে তাঁহাদের আবিষ্কারগুলির আভাস পাইয়া পরে কঠোর সাধনায় সে গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ক্যারেল্ সাহেবও এই আবিষ্কারের আভাস একটা অবান্তর ব্যাপারে দেখিয়াছিলেন।

অল্পদিন হইল রাত্রি দশটার সময়ে ফ্রান্সের জনৈক বিখ্যাত ধনীর মৃত্যু হয়। ইঁহার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র নাবালক পুত্র। আইন অনুসারে সাবালকত্ব পাইবার যে বয়সের সীমা আছে, পুত্রটি সেইদিন রাত্রি বারোটার পর তাহা উত্তীর্ণ করিবে। আত্মীয়-স্বজনগণ চিন্তিত হইলেন ; কারণ নাবালক অবস্থায় পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি পরে করায়ত্ত করা অনেক ব্যয়সাধ্য। মৃত পিতাকে দুই ঘণ্টা জীবিত রাখার ব্যবস্থার জন্য ফ্রান্সের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হইল। ক্যারেল্ সাহেব মৃতদেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে নানাপ্রকার ঔষধ ক্ষুদ্র পিচ্‌কারি দ্বারা প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। নিঃস্পন্দ হৃদ্‌যন্ত্রে আবার স্পন্দন দেখা দিল, দেহের উত্তাপ বাড়িয়া চলিল, এবং ফুস্‌ফুস্‌ও ঔষধের উত্তেজনায় সাড়া দিয়া শ্বাসকার্য্য চালাইতে লাগিল। কাজেই মৃতদেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল। ডাক্তার ক্যারেল এই প্রকারে দশটার সময়ে মৃত ব্যক্তিকে সজীব করিয়া বারোটা পনেরো মিনিট পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু মৃতদেহে চেতনার সঞ্চার করিতে পারেন নাই। এই ঘটনাই ক্যারেল্ সাহেবকে গবেষণার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারে দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিকগণ খুব উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং আশা করিতেছেন, হয় ত কোন দিন মৃতদেহে চেতনারও সঞ্চার করিতে পারিবেন। চেতনা জিনিষটা যে কি, তাহা আজও জড়বিদ্‌-গণের জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে, সুতরাং মৃতদেহে চেতনার সঞ্চার করা এখন সম্ভবপর কিনা সুধী পাঠক বিবেচনা করুন।

একটি নূতন আবিষ্কার

গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, জীবের উৎপত্তির উপর বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এক দল বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনা; মাতৃপিতৃসাহায্য-ব্যতীত জীবের জন্ম হইতেই পারে না। আর একদল পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া স্বতঃজনন-(Spontaneous generation) সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পুচে (Pouchet) সাহেব স্বতঃজননবাদীদিগের নেতা ছিলেন, এবং পরে অধ্যাপক বাষ্টিয়ান্ (Bastion) ইঁহার সহযোগী হইয়াছিলেন। ইঁহারা বলিতেন, জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু ইহাই জীবোৎপত্তির একমাত্র ধারা নয়। অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি আমাদের চারিদিকে নিয়তই চলিতেছে। উদাহরণ জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা গলিত উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, এগুলিতে যে অতিক্ষুদ্র অসংখ্য কীটের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহাই স্বতঃজননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাষ্টুর (Pasteur) এই স্বতঃজননবাদীদিগের সমগ্র যুক্তিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। গলিত জীবদেহে যে-সকল ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়, সেগুলি যে মাতৃপিতৃসাহায্য গ্রহণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করে, পাষ্টুর সাহেব এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক টিন্‌ডাল্ সাহেব তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

ইহার পর বহুকাল স্বতঃজননবাদীদিগের কণ্ঠস্বর শুনা যায় নাই।

বিরোধী পণ্ডিতসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় স্বতঃজননের প্রায় সকল ব্যাপারগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আদিম জীব যে স্বতঃজাত নয়, তাহা ইঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কাজেই স্বতঃজনন কথাটা জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের এক অংশে থাকিয়া গিয়াছিল।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বার্ক্ নামক জনৈক ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে রেডিয়ম্ নামক নবাবিষ্কৃত ধাতুটির পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই সময়ে স্বতঃজননের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া একটা সংবাদ জানা গিয়াছিল; ইহাতে স্বতঃজননবাদের ছিন্ন মূল এই আবিষ্কারে পল্লবিত হইবে বলিয়া আশা হইয়াছিল। কিন্তু অপর বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর পরীক্ষায় বার্কের আবিষ্কার অটল থাকিতে পারে নাই। বিচারে ইহার অনেক ভুল ধরা পড়িয়াছিল।

সম্প্রতি ডুবার্ন্ (Dubarn) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গের আর একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আবিষ্কারটি কেবল স্বতঃজননেরই পোষক নয়, ইহা পদার্থমাত্রেরই গোড়ার খবর আনিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আবিষ্কারক জৈব অজৈব সকল পদার্থকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক কণাকেই সজীব পদার্থের ন্যায় নড়িতে চড়িতে দেখিয়াছিলেন।

আবিষ্কারক ডুবার্ন্ সাহেব বিদেশী হইলেও, তিনি কয়েক বৎসর আমাদের দেশে বাস করিতেছিলেন, এবং এই কলিকাতায় বসিয়াই তাঁহার আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাই আমরা অতি আগ্রহের সহিত আবিষ্কারবিবরণটি লিখিতে বসিয়াছি।

জীববিদ্যা আজকাল যে প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে

চলিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে এক অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই উন্নতির প্রধান সহায় বলিয়া মনে হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রধান গঠনোপাদান, জীবসামগ্রীর (Protoplasm) অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য এবং জীবদেহের কোষগুলির জন্মমৃত্যুর রহস্য এক অণুবীক্ষণ-যন্ত্রই চক্ষুতে দিব্য দৃষ্টি যোজনা করিয়া আমাদিগকে দেখাইতেছে। জীবতত্ত্বের গবেষণায় আজকাল যে-সকল অণুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেগুলিকে নানা প্রকারে সুব্যবস্থিত করা সত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায় নাই। জীবাণু (Bacteria) প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র বস্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে গেলে, নানাপ্রকার রঙ্ দিয়া সেগুলিকে আজও রঞ্জিত করিতে হয়, নচেৎ পরীক্ষাকালে তাহারা মোটেই আমাদের চোখে পড়ে না। তা'ছাড়া জীবাণুগুলি যাহাতে নড়িয়া চড়িয়া যন্ত্রের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য সময়ে সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দৃষ্টিক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা হয়। প্রচলিত অণুবীক্ষণযন্ত্রকে সংস্কৃত করিয়া নূতন প্রথায় একটি উন্নত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য ডুবারন্ সাহেব অনেকদিন অবধি চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবগণের স্বচ্ছন্দবিহার বন্ধ করিয়া এবং তাহাদের দেহাভ্যন্তরে রঙ্ প্রবেশ করাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে যে, তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াই তিনি নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। সূর্য্যালোককে বা বিদ্যুদালোককে আবশ্যক মত প্রখর করিয়া যন্ত্রে ফেলিবারও একটি সুন্দর কৌশল সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। তা-ছাড়া ইনি অণুবীক্ষণের শক্তিকে বৃদ্ধি করিবারও একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছন। ইঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত যন্ত্রটির শক্তি এত অধিক হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা কোন ক্ষুদ্র জিনিষ পরীক্ষা করিলে যন্ত্রে তাহার আকার ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার গুণ দীর্ঘপ্রস্থে বড় দেখায়। অণুবীক্ষণযন্ত্র এপর্য্যন্ত কেবল নামেই

অণুবীক্ষণ ছিল। কোন যন্ত্র সাহায্যে অদ্যাপি অণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। ডুবারন্ সাহেব তাঁহার অণুবীক্ষণকে সত্যই অণুবীক্ষণ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

স্বর্ণ রৌপ্য প্লাটিনম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে চূর্ণ করিয়া ও পিষিয়া তাহাদেরি ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে লইয়া ডুবারন্ সাহেব তাঁহার নিজের হাতের অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কণাগুলির প্রকৃত ব্যাসের পরিমাণ এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র ছিল, কিন্তু যন্ত্রে সেগুলির প্রত্যেককে এক একটি শিশিরবিন্দুর আকারে দেখা গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইনি যতগুলি পদার্থের কণা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সকলকেই সম্পূর্ণ গোলাকার এবং একই আয়তনবিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

ইহার পর আরো সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডুবারন্ সাহেব অপর যে-সকল কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা আরো বিস্ময়কর। পরীক্ষায় প্রত্যেক কণাটিকেই তিনি চঞ্চল দেখিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম না মানিয়া প্রত্যেকেই সজীব পদার্থের ন্যায় চলাফেরা আরম্ভ করিয়াছিল। কণাগুলিতে অত্যন্ত তাপ প্রয়োগ করিয়া এবং পুনঃপুনঃ চূর্ণিত ও মর্দ্দিত করিয়াও ঐ সজীবতার লক্ষণের পরিবর্ত্তন করা যায় নাই।

দুইটি চলিষ্ণু জিনিষ বিপরীত দিক হইতে আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিলে, উভয়েরই বেগ কমিয়া আসে। কিন্তু ডুবারন্ সাহেবের আবিষ্কৃত আণুবীক্ষণিক বর্ত্তুলকণাগুলি সংঘর্ষণের এই সুপরিচিত নিয়ম মানিয়া চলে নাই। ধাক্কায় তাহাদের প্রত্যেকটির বেগের বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। পদার্থমাত্রেরই সূক্ষ্ম কণার এই সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আবিষ্কারক বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাপ বা আলোক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের উপর পড়িলে চাপ (Radiation pressure) দিয়া তাহাকে

গতিশীল করায়। নানা প্রকারে তাপালোকের চাপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উহাই অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে চঞ্চল করে বলিয়া আবিষ্কারক প্রথমে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কণাগুলিকে অনিয়মিতভাবে যথেচ্ছ চলিতে দেখিয়া ইহা যে, তাপালোকের চাপের কার্য্য নয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকারে জড়পদার্থের পরিজ্ঞাত সাধারণ ধর্ম্ম-গুলির মধ্যে কোনটিরই সহিত ঐ সকল জড়কণার কার্য্যের ঐক্য দেখিতে না পাইয়া আবিষ্কারক তাহাদিগকে "সজীবকণা" (Vital particles) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং ধাতু প্রস্তরাদির সূক্ষ্ম কণা পরীক্ষা করিয়া সকলেরই ঠিক একই কার্য্য দেখা গিয়াছিল, সুতরাং আবিষ্কারকের মতে এই সকল সজীব কণাই সজীব নির্জ্জীব সকল পদার্থেরই গঠনোপাদান এবং শেষ পরিণাম।

আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবসামগ্রী (Protoplasm) নামক এক জিনিষকে জীবদেহের প্রধান উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। নির্জ্জীব অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে একত্র হইয়া পড়িলে তখন তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, এবং পূর্ব্বেকার নির্জ্জীব পদার্থ সজীবের সকল ধর্ম্ম পাইয়া জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যগুলি দেখাইতে থাকে। ইহাই জীবসামগ্রী। অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিকই অদ্যাপি জীবসামগ্রীকে নিজের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। বিধাতার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শিল্পশালাতেই ইহার উৎপত্তি, এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় নির্জ্জীব পদার্থ জীবধর্ম্মী হয়, তাহা বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত আর কেহই জানেন না। ডুবার্ন্ সাহেব তাঁহার "সজীবকণার" সাক্ষাৎ পাইয়া বলিতেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে জীবসামগ্রী (Protoplasm) বলেন, তাহা সজীবকণারই সমষ্টি এবং কণাগুলিই জীবসামগ্রীতে সজীবতা আনয়ন্ করে; অর্থাৎ "সজীবকণা" জীবসামগ্রীর এক ধাপ নীচেকার জিনিষ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সজীব নির্জ্জীব নানা পদার্থের সূক্ষ্ম কণা পরীক্ষা করিয়া ডুবার‍্ন্ সাহেব যে সজীবতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাপ দিয়া আঘাত দিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তিনি সেগুলির জীবধর্ম্মের লোপ করিতে পারেন নাই, এবং সেগুলিকে কোন ক্রমে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেই বাধ্য করা যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সৃষ্ট পদার্থ-মাত্রই যখন ঐ "সজীবকণা" দ্বারা গঠিত তখন একত্র হইলেই তাহারা কেন প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলে? আবিষ্কারক এই প্রশ্নটির পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন নাই। তবে "সজীবকণা" পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িলেই যে, তাহাদের সজীবতা লোপ পাইয়া যায়, এবং বিযুক্ত হইলেই যে আবার তাহার পুনর্বিকাশ হয়, পরীক্ষায় তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন।

এই সকল দেখিয়া ডুবার‍্ন্ সাহেব বলিতেছেন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই যে-সকল উপাদানে গঠিত তাহা মূলে সজীব। "সজীবকণা" সকল পুঞ্জীভূত হইয়া যখন তাহাদের মূল-গত জীবধর্ম্মকে অপ্রকাশ রাখিয়া দেয়, তখনি সেই সকল "জীবকণার" সমষ্টি আমাদের নিকট নির্জ্জীব পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, এবং পুঞ্জীভূত হওয়ার পরও সেগুলি যখন তাহাদের স্বাভাবিক সজীবতাকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই কণাসমষ্টি আমাদের নিকট সজীব হইয়া পড়ে। তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা যে সজীব ও নির্জ্জীবের ভেদ স্বীকার করিয়া আসিতেছি, তাহা ডুবার‍্ন্ সাহেবের মতে মূলগত ভেদ নয়। জীবনের প্রারম্ভ ও শেষ নাই। সমস্ত পদার্থই ভগবানের ইচ্ছায় সজীব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই আদিম জীবের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাকে স্বতঃজনন বলিয়াছেন, তাহা প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের ইচ্ছায় নিয়তই আমাদের সম্মুখে চলিতেছে।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ডুবাব্‌ন্ সাহেব সজীব কণাগুলির আকার সম্পূর্ণ গোল দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কার্য্যবিধি পরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে শূন্যগর্ভ অনুমান. করিতেছেন। শূন্যগর্ভ জিনিষের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ও তাহার কতকটা জলে পূর্ণ করিয়া যদি জলে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ভিতরকার জল যেমন সবলে ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইতে থাকে তেমনি ভিতর-কার জলের চাপ সমগ্র জিনিষটাকে ঠেলিয়া বিপরীত দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমরা প্রতিদিনই নানাপ্রকারে তরল পদার্থে চাপের এই কার্য্যটিকে দেখিতে পাই। ডুবাব্‌ন্ সাহেব "সজীবকণার" সঞ্চলন ব্যাপারটাকে চাপের কার্য্য বলিয়া অনুমান করিতেছেন। ইঁহার মতে, "সজীবকণা"-গুলি শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার জিনিষ হইলেও, প্রত্যেকের কোষ-প্রাচীরে অন্ততঃ দুইটি করিয়া ছিদ্র আছে। জল বা অপর কোন তরল পদার্থে ভাসিতে আরম্ভ করিলেই, ইহারা আপনা হইতেই এক ছিদ্র দ্বারা জল উদরস্থ করিয়া অপর ছিদ্রপথে তাহা বাহির করিতে আরম্ভ করে। কাজেই ইহাতে কোষস্থ জলে চাপের একতা নষ্ট হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কণাগুলিও বিচিত্রগতিসম্পন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

"সজীবকণা"-গুলিকে শূন্যগর্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়া ডুবাব্‌ন্ সাহেব কতকগুলি রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সমস্যারও সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লৌহ ও গন্ধক এই দুই মূলপদার্থের এক এক পরমাণু একত্র হইলে একটি যৌগিক পদার্থের (Iron sulphide) উৎপত্তি হয়। লৌহ এবং গন্ধক এই দুইয়ের কোন ধর্ম্মই পদার্থটিতে দেখা যায় না। ডুবাব্‌ন্ সাহেব বলেন, লৌহের "সজীবকণা" সকল যখন গন্ধকের "সজীবকণা" গুলিকে উদরস্থ করিয়া আর এক জাতীয় "সজীবকণার" উৎপত্তি করে, কেবল তখনি লৌহ ও গন্ধকের রাসায়নিক

সংমিশ্রণ ঘটে। তিন চারিটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইলেও ঠিক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মৌলিক "সজীবকণা"-গুলি পরস্পরের কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক একটি পৃথক "সজীবকণা"র উৎপত্তি করে। লৌহ ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনে, লৌহের কণা গন্ধকের কণার ভিতর প্রবেশ করে, কি গন্ধকের সজীব কোষ লৌহকোষের ভিতর আশ্রয় লয়, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। ডুবারন্ সাহেব বলিয়াছেন, যে পর্য্যায়ে "সজীবকণা"-গুলি পরস্পরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক রাসায়নিক রহস্যেরও প্রকৃতি নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

ডুবারন্ সাহেবের এই আবিষ্কারের বিবরণ আজও বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বাংশে প্রচারিত হয় নাই। পরীক্ষায় দৃষ্ট ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষ হইলেই যে ভ্রমপ্রমাদহীন হইবে, এ কথা বলা যায় না। সুতরাং একক ডুবারন্ সাহেব একটিমাত্র যন্ত্রে "সজীবকণা"র সন্ধান পাইয়া যে প্রকাণ্ড সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহার ভিত্তি খুবই দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যাহাদিগকে তিনি "সজীবকণা" নামে আখ্যাত করিয়াছেন, তাহারা যে প্রকৃতই সজীব তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই ইনি যে-সকল কঠিন কঠিন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন বোধ হয় তাহার আলোচনা করিবার আজও সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি কোন দিন সেই শুভ কাল উপস্থিত হয়, তবে ডুবারন্ সাহেব ধন্য হইবেন এবং তাঁহার প্রসাদে আধুনিক বিজ্ঞান অজ্ঞান-কুহেলিকা হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আপাততঃ সিদ্ধান্ত-গুলিকে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

সমস্ত জিনিষই যে সজীব এই কথাটা শুনিলে এখন আর

আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। আমাদের অতি প্রাচীন পিতামহগণ এই ভারতবর্ষে বসিয়াই প্রকারান্তরে এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তার পর আমাদের স্বদেশবাসী মহা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে সেই সত্যকে দেখাইয়াছেন। ডুবারন্ সাহেব প্রকারান্তরে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বসু মহাশয়ের প্রত্যেক উক্তিই যেমন শত শত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ডুবারন্ সাহেবের কোন কথারই মূলে সে প্রকার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্বদেশী বিদেশী দার্শনিকগণ বহুকাল হইতে মূল জড়কণাকে সজীব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত লিব্‌নিজ্ (Leibnitz) সাহেব আরও উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তিনি পরমাণুকে সজীব বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, ইহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াও তাঁহার মনে হইয়াছিল।

কেরোসিন্ তৈল

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের পরিবারে কেরোসিন্ তৈলের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়, তখনকার একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। আমাদের একটি অতি বৃদ্ধা ধাত্রী ছিল। প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারসম্বন্ধে খট্‌কা উপস্থিত হইলেই আমরা সেই বৃদ্ধার শরণাপন্ন হইতাম। ব্যাখ্যানপ্রদানে সে সিদ্ধবিদ্যা লাভ করিয়াছিল। মেঘের চলাচল, বজ্রপাত, বিদ্যুৎস্ফুরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্যের আবির্ভাব প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের ব্যাখ্যান তাহার জিহ্বাগ্রে থাকিত। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাহার শরণাগত হইয়া, আমরা কখনই নিরাশ হই নাই। বৃদ্ধা কেরোসিন্ তৈল কোনক্রমে স্পর্শ করিত না, এবং আমাদিগকেও স্পর্শ করিতে দিত না। একদিন এই বিতৃষ্ণার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ধাত্রীর ব্যাখ্যানে জানিয়াছিলাম, দেশের সমস্ত মৃত জন্তুর গলিত দেহ কলের ঘানিতে ফেলিয়া সাহেবেরা যে তৈল বাহির করে, তাহাই কেরোসিনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

কেরোসিন তৈলের প্রস্তুতপ্রণালীর পূর্ব্বোক্ত বিবরণটি বহুদিন ধরিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এখন আর সে বিশ্বাস নাই। সুদূর পল্লীবাসীও এখন ঐ প্রকার একটা অদ্ভুত প্রস্তুতপ্রণালীতে বিশ্বাসস্থাপন করিবে না; কিন্তু কেরোসিনের উৎপত্তিতত্ত্ব জানিবার জন্য বিজ্ঞানগ্রন্থ খুলিলে আমাদের সেই বৃদ্ধা ধাত্রীর কথার সহিত একদল বৈজ্ঞানিকের উক্তির মূলে মিল দেখা যায়। কলের ঘানিতে

মৃতদেহ পেষণ করিয়া সাহেবেরা তৈল বাহির করেন না, প্রকৃতিই ভূপ্রোথিত জীবদেহের উপর চাপ দিয়া কোন প্রকারে তৈল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের উক্তির ইহাই সারমর্ম্ম।

কেরোসিন তৈল যে একটা জৈব পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই ইহাতে একমত হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর যে-সকল অংশে অতি প্রাচীন কয়লার খনি আছে, কেরোসিন তৈল সেই সকল স্থানেই প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং কয়লা যেপ্রকার ভূপ্রোথিত উদ্ভিদের দেহ হইতে উৎপন্ন হয়, কেরোসিনও সেইপ্রকার যুগ-যুগান্তরের মাটিচাপা বৃক্ষাদি হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। উদ্ভিদ্‌শরীরে কেরোসিনের ন্যায় পদার্থের অভাব নাই। টার্পিন তৈল ধুনা প্রভৃতি দাহ্য বস্তু উদ্ভিদ্‌ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বৃক্ষাদির যে-সকল অংশ হইতে টার্পিন্‌ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তাহাই বহুকাল প্রোথিত থাকিয়া ভূ-গর্ভের চাপ ও তাপে যে শেষে কেরোসিন্‌ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বৈজ্ঞানিকের নিকট হীরক ও কয়লা একই জিনিষ। বিশ্লেষণে এক অঙ্গার ব্যতীত অপর কোন জিনিষই হীরকে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কয়লাই বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপে ও উপরের মৃত্তিকার চাপে তাহার মলিনতা ঘুচিয়া যায়। ধরা-কুক্ষির বৃহৎ কর্ম্মশালায় কি প্রকারে কেবল চাপ ও তাপের সাহায্যে তুচ্ছ কৃষ্ণ অঙ্গার অতুজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরকে পরিণত হয়, তাহা জানা ছিল না। অল্পদিন হইল একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক কয়লাকে ভূগর্ভের অবস্থায় ফেলিয়া, তাহাকে হীরকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বৃক্ষনির্য্যাসকে ঐ প্রক্রিয়ায় কেরোসিনে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কেবল কয়লার খনির নিকটেই যে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়, এখন আর একথা বলা চলে না। অনেক অঙ্গারবর্জ্জিত স্থানেও আজকাল কেরোসিনের খনি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই সকল স্থানের কেরোসিন্ উদ্ভিদ্-দেহজ নয়। প্রাণীর দেহ বহুকাল ভূপ্রোথিত থাকিলে, দেহের তৈলময় উপাদানগুলি নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া শেষে কেরোসিন হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কেরোসিন-খনির চারিদিকের ভূমি খনন করিলে, সত্যই অনেক জীবকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রাণীর বসা ইত্যাদি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কেরোসিনের আকার প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতেও অবিশ্বাস করা যায় না।

আজ চল্লিশ বৎসর হইল কেরোসিনের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিলে মনে হইতে পারে, ভূগর্ভে যে এপ্রকার একটা তৈল সঞ্চিত আছে প্রাচীনেরা বুঝি তাহার কোন সন্ধান রাখিতেন না; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। প্রাচীনেরা ইহার খুবই সন্ধান রাখিতেন, এবং আবশ্যক মত ব্যবহারও করিতেন। নিনেভা ও বাবিলনের নগর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষগুলি পরীক্ষা করিলে, তাহার চূণ সুরকির সহিত একপ্রকার অপরিচ্ছন্ন কেরোসিন মিশ্রিত দেখা যায়। এই জিনিষটাকে গৃহনির্ম্মাণের অপর উপাদানগুলির সহিত ব্যবহার করিলে যে গাঁথুনি দৃঢ় হয়, এবং জলে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না, চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোকেরাও তাহা জানিতেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কেরোসিন্ তৈলের আকরের অল্পাধিক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ ও কানাডা-প্রদেশে ইহার খুব বড় বড় আকর আছে। তা'ছাড়া রুসিয়া ও আমাদের ব্রহ্মদেশেও কেরোসিন পাওয়া যাইতেছে। মাটি খুঁড়িলে কয়লা প্রভৃতি আকরিক জিনিষকে যে প্রকার স্তরে স্তরে সজ্জিত
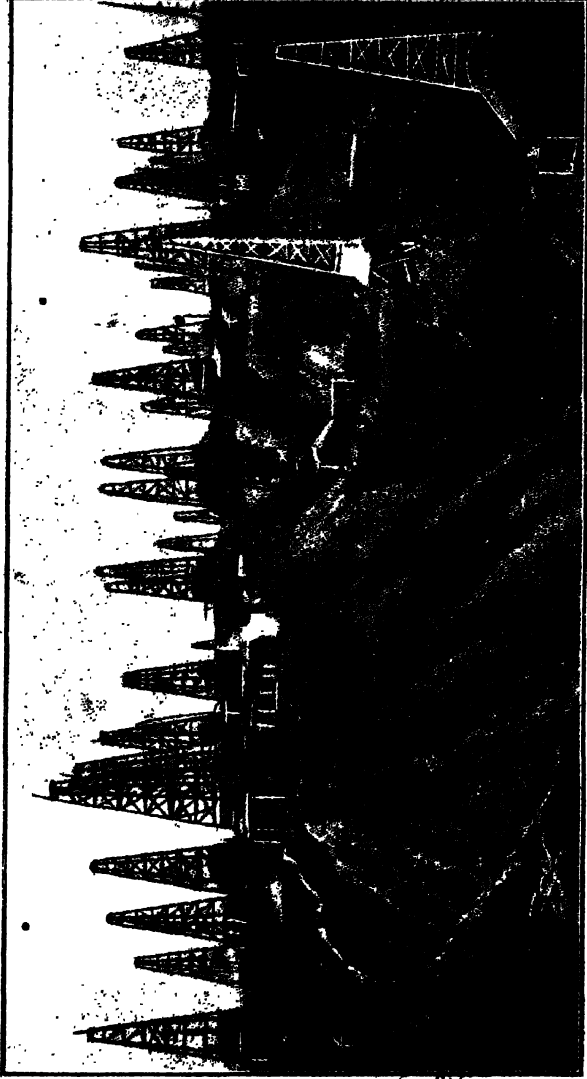
আমেরিকার একস্থানে বহু কেরোসিনের খনির দৃশ্য

দেখা যায়, কেরোসিনকে সেপ্রকার বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় না। যদি মাটিতে কেরোসিন থাকে, তবে ভূগর্ভের স্থানে স্থানে যে-সকল ফাটাল দেখা যায়, পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা হইতে তাহাতেই তৈল আপনা হইতে সঞ্চিত হয়। উপর হইতে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া সেই সকল ফাটাল বাহির করিলেই জল ও বাষ্পমিশ্রিত তৈল ফোয়ারার মত ছুটিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে খনির ভিতরকার আবদ্ধ বায়বীয় ও জলীয় অংশ বাহির হইয়া গেলে, খাঁটি তৈল গহ্বরে পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় ব্যবসায়িগণ পম্প্ লাগাইয়া তৈল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আকর হইতে যে-সকল তৈল সদ্য উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত কেরোসিন তৈলের কোনই সাদৃশ্য থাকে না। তৈল প্রস্তুতকারিগণ নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই অবিশুদ্ধ তৈলকে নির্ম্মল করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া থাকেন। একশত ভাগ আকরিক তৈল লইয়া কেরোসিন্ প্রস্তুত করিতে গেলে, কেবল পঞ্চান্ন ভাগ মাত্র খাঁটি নির্ম্মল তৈল পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ভাগ হইতে গ্যাসোলিন্, ন্যাপ্‌থা, প্যারাফিন্ ও কলে দিবার তৈল প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক জিনিষ প্রস্তুত হয়। স্থূল কথায়, আকরিক তৈলের অতি অল্প অংশ অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অবিশুদ্ধ আকরিক তৈলের শোধনপদ্ধতি অতি সহজ। গুড়ের ন্যায় ঘন তৈলকে কতকগুলি আবদ্ধমুখ কটাহে রাখিয়া ফুটানো হয়। কটাহের আবরণের সহিত লৌহের বড় বড় নল সংযুক্ত থাকে। তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিলে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা ঐসকল নল দ্বারা আর এক শীতল পাত্রে পৌঁছিয়া দিলে তথায় জমিতে আরম্ভ করে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম কালে যে জিনিষটা শীতল পাত্রে জমা হয়, তাহা

দ্বারা বিশেষ কোন কাজ পাওয়া যায় না। তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রথায় চোয়াইলে গ্যাসোলিন্, বেন্জিন্ ন্যাপ্থা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি পাওয়া যায়। কটাহের তৈল ফুটিতে আরম্ভ করিয়া মাঝামাঝি সময়ে যে-সকল বাষ্প ছাড়িতে আরম্ভ করে, তাহাই আমাদের পরিচিত কেরোসিনের বাষ্প। ইহা সেই সুদীর্ঘ নল বহিয়া শীতল পাত্রে আসিয়া তরল হইলেই কেরোসিন প্রস্তুত হয়।

এই প্রকারে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত কেরোসিনের খুব সাদৃশ্য থাকিলেও জিনিষটাকে ঠিক্ বাজারের ভাল কেরোসিনের মত নির্ম্মল দেখায় না। ইহার সহিত শতকরা দুই ভাগ সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ মিশাইলে ময়লা কাটিয়া নীচে থিতাইতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈল বেশ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধহীন হইয়া দাঁড়ায়। অতি উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার পর তৈলে এমোনিয়া বা কষ্টিক্ সোডা মিশানো হইয়া থাকে। ইহাতে তৈলে অণুমাত্র মলিনতা থাকে না, এবং দুর্গন্ধও প্রায় লোপ পাইয়া যায়।

অপরিচ্ছন্ন আকরিক তৈল কটাহে ফুটিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বপ্রথমে যে ন্যাপ্থা প্রভৃতির বাষ্প বহির্গত হইয়া জমা হয়, তাহা তৈলরূপে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী; কিন্তু জিনিষটার প্রস্তুত-ব্যয় অতি অল্প বলিয়া, অনেক ব্যবসায়ী অন্যায় লাভের আশায় ভাল কেরোসিনের সহিত এই জিনিষটাকে প্রায় মিশাইয়া থাকে। ল্যাম্প ফাটিয়া গিয়া যে-সকল দুর্ঘটনা ঘটায়, তাহার মূল কারণ ঐ ন্যাপ্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে-সকল তৈল একশত তেত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপে প্রজ্বলিত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই উৎকৃষ্ট তৈল বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাহারই সহিত শতকরা একভাগ ন্যাপ্থা মিশাইলে মিশ্র তৈল
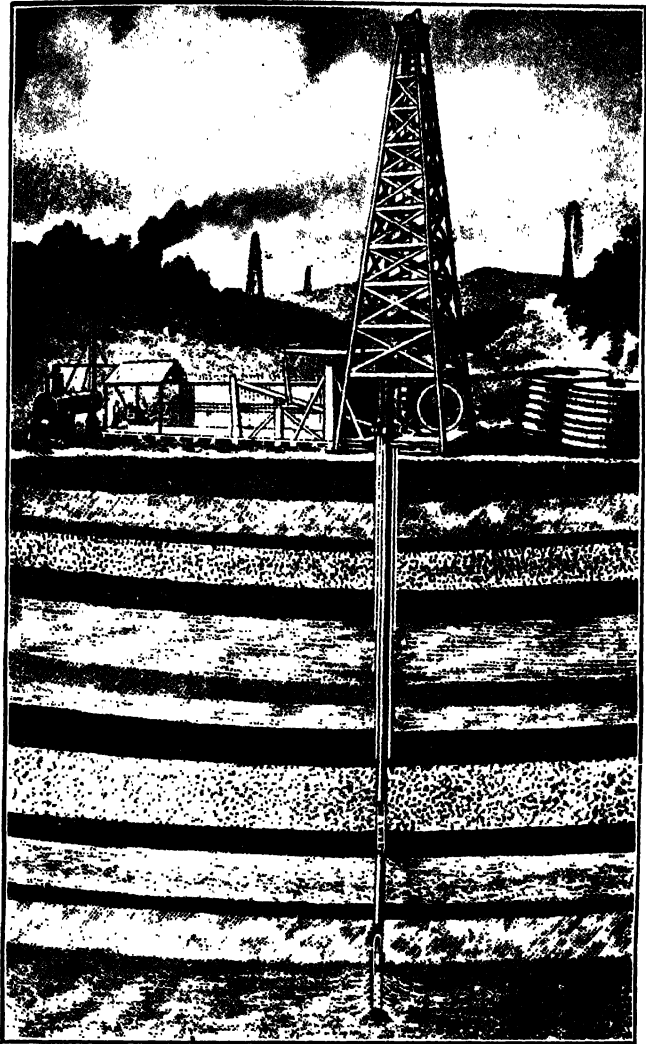
গভীর স্তর হইতে কেরোসিন উত্তোলনের যন্ত্র—১৯৩ পৃঃ

একশত তিন ডিগ্রি উত্তাপেই জ্বলিয়া উঠে। সৎ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কেরোসিন না কিনিলে কখন কখন তৈলে শতকরা পাঁচভাগ পর্য্যন্ত ন্যাপ্থা পাওয়া গিয়া থাকে। এই তৈল ৮৩^{0} ডিগ্রি উত্তাপ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে; সুতরাং এপ্রকার নিকৃষ্ট জিনিষ ব্যবহারে বিপদের সংঘটন মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কেবল দুর্ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই যে উৎকৃষ্ট তৈলের ব্যবহার আবশ্যক, তাহা নয়। অল্প খরচে অধিক আলোক পাইতে হইলেও উৎকৃষ্ট তৈল ব্যবহার করা আবশ্যক। অনেক সময়ে বাজারের তৈল ভাল ল্যাম্পে ব্যবহার করিতে গিয়া দেখা যায়, শিখা ধূমময় হইয়া পড়িতেছে। ইহাও তৈলমিশ্রিত ন্যাপ্থারই একটা লক্ষণ। এ প্রকার তৈল অল্প মূল্যে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু জিনিষটা এত অপরিচ্ছন্ন আলোক দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায় যে, ইহার ব্যবহারে গৃহস্থমাত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তা' ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় রহিয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভাল তৈল পুড়াইয়া যে পরিমাণ আলোক পাওয়া যায়, মধ্যম শ্রেণীর তৈলে তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ মাত্র আলোক পাওয়া গিয়া থাকে।

কেরোসিন্ তৈল আজকাল আমেরিকায় একটা প্রধান পণ্যদ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থানের কেরোসিনের বড় বড় আকরগুলি ১৮৬০ সাল পর্য্যন্তও অনাদৃত ব্যবস্থায় পড়িয়াছিল। দেশের অতি প্রাচীন জঙ্গলের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলিই ইন্ধন জোগাইত। এখন আর সে জঙ্গল নাই। প্রায় সকল অরণ্যভূমিই কৃষিক্ষেত্র বা গ্রাম-নগরে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার খাদ্য জোগাইবার জন্য আমাদিগকে রত্নগর্ভা ধরা-দেবীরই শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। মনে হয়, ভবিষ্যৎ সন্তানদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের

জন্যই যেন বসুন্ধরা যুগযুগান্তর ধরিয়া এই সকল অমূল্য দ্রব্য ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

অতি প্রাচীনকালে যে অবস্থায় পড়িয়া বৃক্ষাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছিল, পৃথিবীর এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন বৃক্ষাদি আর ভূপ্রোথিত হইতে পারিতেছে না; সুতরাং নূতন করিয়া কয়লা বা কেরোসিন্ তৈলেরও উৎপত্তি হইতেছে না, অথচ পূর্ব্বসঞ্চিত কয়লা ইত্যাদির ব্যয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি বা আর একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোসিনের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায়; কিন্তু আমরা ইহাতে কোন আশঙ্কারই কারণ দেখি না। মানবজাতি বিধাতার নানা আশীর্ব্বাদে ভূষিত হইয়া প্রাণিরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সৃষ্টিরক্ষার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ কখনই তাহার অধিকারভুক্ত বলা যায় না। বৃহৎ অরণ্যগুলির ধ্বংসের পর মানব যখন ইন্ধনের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিধাতারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভূগর্ভে নূতন ইন্ধনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই ভাণ্ডার শূন্য হইলে, সেই বিধাতারই অকথিত বাণী ইন্ধন-সংগ্রহের নব নব সহজ উপায় বলিয়া দিবে।

দধি

খেজুর-রস, মধু, দুগ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষকে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে, এগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিকৃত হইয়া পড়ে। একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, একপ্রকার বাষ্প উঠিয়া জিনিষগুলিকে ফেনাযুক্ত করিয়া ফেলিতেছে। খেজুর-রস এই প্রকারে বিকৃত হইলে এত ফেনিল হইয়া পড়ে যে, তখন ভাণ্ডে তাহার স্থান সংকুলান হয় না। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্ত্তনে জিনিষের স্বাদ বর্ণ গন্ধ সকলই পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে এই প্রকারে উহাদের একটা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। চলিত কথায় আমরা এই পরিবর্ত্তনকে "গাঁজিয়ে যাওয়া" বলি। ইংরাজিতে উহাকে Fermentation বলে। খাঁটি সংস্কৃতে, ব্যাপারটা‥ কিণ্বন বলা যাইতে পারে। যে বাষ্প উঠিয়া জিনিষগুলাকে ফেনাইয়া তোলে, তাহার পরিচয় গ্রহণ করা হইয়াছে। বাষ্পটা অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic Acid Gas) ব্যতীত আর কিছুই নয়।

টাট্‌কা খেজুরের রস, খাঁটি দুধ প্রভৃতি কিছুক্ষণ অনাবৃত রাখিবার পরই তাহাদের এই প্রকার বিকার দেখিলে বাহিরের কোন জিনিষের যোগেই এই পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত ব্যাপারটাও তাই বটে। বায়ুশূন্য পরিষ্কার পাত্রে রাখিলে উহাদের কোন বিকারই দেখা যাইবে না। জর্ম্মানির গো-শালাগুলির ঘন দুধ, ইংলণ্ডের মাছ, এবং আমেরিকার বড় বড় বাগানগুলির ফলমূল এই পদ্ধতিতেই টিনে আবদ্ধ হইয়া আমাদের বাজারে উপস্থিত হইতেছে এবং এইরূপ বায়ুশূন্য কৌটায় ফলরক্ষণ আমদের দেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

যাহা হউক যে জিনিষ বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিয়া খেজুর-রস ইত্যাদি বিকৃত করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে বাতাসে সর্ব্বদাই নানা জাতীয় জীবাণু ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জীবাণুর নাম শুনিলেই ব্যাধির জীবাণুর কথা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু এপর্য্যন্ত যতগুলি এই শ্রেণীর জীবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাধি-উৎপাদক জীবাণুর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহকে পচাইয়া ফেলা, চিনি হইতে মদ উৎপন্ন করা, উদ্ভিদের মূলে বায়ুর নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করিয়া রাখা, এমন কি চুরুটের তামাকে সুগন্ধ উৎপন্ন করা, রঞ্জন-কার্য্যে রঙ্‌কে ফলাইয়া তোলা প্রভৃতি অনেক ব্যাপার কেবল জীবাণু দ্বারাই সম্পন্ন হয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। কেবল স্থির করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নাই; হাজার হাজার পৃথক্ জাতীয় জীবাণুর মধ্যে আবশ্যক মত এক এক জাতিকে চিনিয়া এবং বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যবসায়ের জন্য আমরা রেসমের কীট ও লাক্ষার কীট পালন করিয়া থাকি। আজকাল ব্যবসায়ের জন্য ঐ সকল জীবাণুকেও পালন করা হইতেছে। যে জীবাণু মদ্য উৎপন্ন করে বা উদ্ভিদের খাদ্য যোগায়,—পালন করিয়া তাহাদিগকে মদ্য প্রস্তুতের কারখানায় বা শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে আজকাল অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতেছে।

দধি জিনিষটাও জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন। এক শ্রেণীর বিশেষ জীবাণু দুগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকার রস নির্গত করিতে থাকিলে তাহা দ্বারা রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়। ইহাই দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। দধির সুগন্ধ, অম্লস্বাদ সকলই সেই দধি-জীবাণুর কাজ। মাখনের সুগন্ধ এবং বিলাতি চিজের সেই গন্ধটারও মূলে জীবাণুর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ জীবাণু দুগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ

করিলে তাহারাই মাখন ও চিজ্ উৎপন্ন করে। আজকাল বিলাতি গোয়ালারা দধি, মাখন বা চিজ্ উৎপাদক জীবাণুগুলিকে চিনিয়া পৃথক্ স্থানে তাহাদের পালন করিতেছে, এবং আবশ্যকমত তাহাদিগকেই দুগ্ধে ফেলিয়া দিয়া উৎকৃষ্ট দধি মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। আমাদের গো-শালাগুলিতে সেই "সাঁজা" দিয়া দধি প্রস্তুতের প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। "সাঁজা" দেওয়া এবং দুগ্ধে জীবাণু সংযোগ করা একই কাজ বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে "সাঁজা" বলি তাহাতে দধির উৎপাদক খাঁটি জীবাণু ছাড়া আরো অনেক জীবাণু থাকিয়া যায়। কাজেই সকল সময় সাঁজায় খুব ভাল দধি হয় না। দধি-উৎপাদক জীবাণু যেমন কাজ করিতে থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অপর অনাবশ্যক জীবাণু সাঁজার সহিত দুগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিকৃত করিতে আরম্ভ করে। ফলে দধিটা একটা অদ্ভুত জিনিষ হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় দধি বসিল না, বা সেটা লালার ন্যায় একটা আটালো জিনিষ এবং দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িল। এই সকল সেই অনাবশ্যক জীবাণুরই কীর্ত্তি।

জীবাণু কেবল ব্যাধি-উৎপাদন এবং বাহিরের জিনিষকে ভাল-মন্দে পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সুস্থ এবং সবল প্রাণীর দেহের ভিতরেও ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্য দেখায়। মানব-দেহের নবদ্বারের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি দ্বার ইহাদের প্রবেশের জন্য অবারিত রহিয়াছে। আমরা খাদ্যের সহিত অনেক জীবাণু উদরস্থ করিয়া ফেলি। কিন্তু এগুলি যদি ব্যাধি-জীবাণু না হয়, তবে তাহারা আমাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। আমাদের জঠর হইতে যে পাক-রস (Gastric Juice) নির্গত হয়, তাহার জীবাণুনাশের শক্তি আছে। কাজেই উদরস্থ হইলে পর সেই রসের সংযোগে তাহারা মরিয়া যায়। কিন্তু অন্য পথে আমাদের অন্ত্রে

(Intestine) যে-সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে অন্ত্র-রস (Pancreatic Juice) তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে না। বরং ঐ রসের সহিত একটু ক্ষার যুক্ত থাকায় তাহা অন্ত্রস্থ পদার্থগুলিকে জীবাণুর বংশ বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া তোলে। ইহার ফলে অন্ত্রস্থ অর্দ্ধপক্ক ভুক্ত জিনিষগুলাকে ঐ জীবাণুগুলি খুব পচাইয়া তুলিতে থাকে। পচানোই যে-সকল জীবাণুর কাজ তাহারা সংসারের অশেষ উপকার করে সত্য, কিন্তু এই পচানোর কাজটা আমাদের দেহের মধ্যে চালাইতে থাকিলে ফল শুভ হয় না। জীবাণু সকল নিজের দেহ হইতে যে রস নির্গত করে, তাহা রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলেই নানা পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মানবদেহে এই সকল জীবাণুর কাজ লইয়া আধুনিক শারীরবিদ্‌গণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে, বয়স যতই অধিক হয়, মানুষের অন্ত্রে অনিষ্টকর জীবাণুর সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলে। সুস্থ শিশুদের অন্ত্রে সেই পচানো জীবাণু একপ্রকার দেখাই যায় না। পরীক্ষায় কেবল কতকগুলি দধি-জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। তা'র পর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে ঐ দধি-জীবাণুগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া পচানো-জীবাণু ক্রমে অন্ত্র অধিকার করিয়া বসে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক মেচ্‌নিকফ্‌ (Metchnikoff) আজকাল জীবাণু সম্বন্ধে নানা গবেষণা দ্বারা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি মানবদেহের প্রধান শত্রু জরার মূলকারণ খুঁজিতে গিয়া তাহাতে জীবাণুর কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি বলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দেহের পাকনালীতে যে-সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদেরই দেহনির্গত বিষ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে জরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্যাধির মূল কারণ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলে তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন প্রায়ই সুসাধ্য

ফরাসী বৈজ্ঞানিক মেচ্‌নিকফ
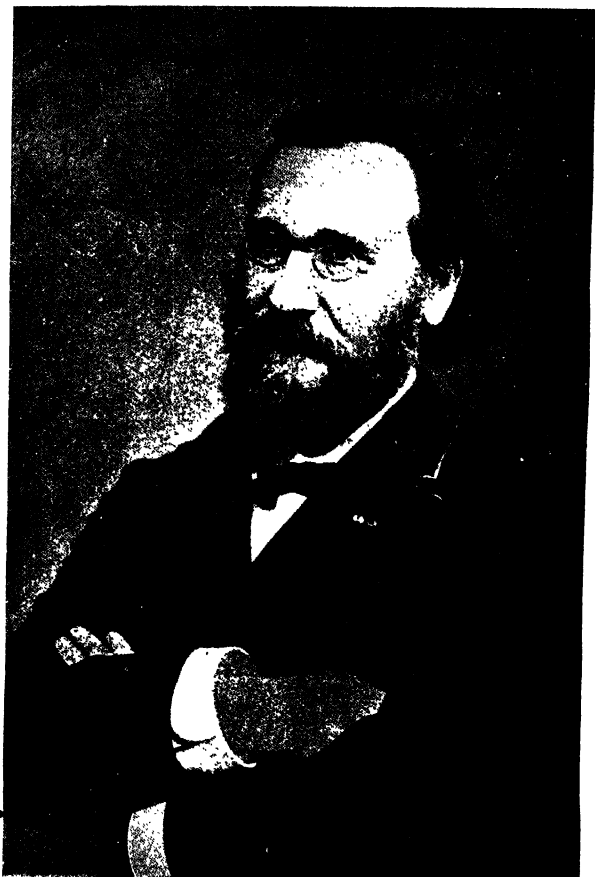
মেচ্‌নিকফ্‌ সাহেব জরা-উৎপত্তির ঐ একটি কারণ জানিতে পারিয়া তাহার নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি দেখিয়াছিলেন, অম্লযুক্ত পদার্থে ঐ অনিষ্টকর জীবাণুগুলি মোটেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। শিশুর অন্ত্রে দধি-উৎপাদক (Lactic Acid) জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়াই শিশুগণ ঐ অনিষ্টকর জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। যে উপায়ে স্বয়ং প্রকৃতি শিশুদেহ হইতে অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীরের ভিতরকার জীবাণুগুলি ঠিক সেই প্রকার অম্ল সংযোগে ধ্বংস করিবার জন্য মেচ্‌নিকফ্‌ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ অর্থাৎ দধির অম্ল উদরস্থ করিবার কথা সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যায় নাই। পাকযন্ত্রে উপস্থিত হইবামাত্র এসিড্‌কে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছিল। কাজেই যখন অন্ত্রে গিয়া পৌঁছিয়াছিল তখন তাহা দ্বারা জীবাণুর বিনাশ হয় নাই। এই কারণে যাহাতে অন্ত্রেই কোন প্রকারে দধির অম্ল উৎপন্ন হইতে পারে তাহার কোন এক ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মেচ্‌নিকফ্‌ মনে করিয়াছিলেন, যদি কোনক্রমে দেহের পাকাশয়ে দধির অম্ল-উৎপাদক জীবাণুর (Lactic Acid Bacteria) স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করা যাইতে পারে তবে সকল গোলযোগেরই অবসান হয়; তখন ঐ জীবাণুগুলিই দধির অম্ল প্রস্তুত করিয়া অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকে নিশ্চয়ই নষ্ট করিতে থাকিবে।

ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ উৎপাদক সাধারণ জীবাণুগুলি ৮৫° ডিগ্রির অধিক উত্তাপে ভাল জন্মায় না। আমাদের পাক-নালীর উষ্ণতা প্রায় ৯৯° ডিগ্রি। কাজেই পাকনালীতে ল্যাক্‌টিক এসিড্‌ জীবাণুর উপনিবেশ স্থাপন করার কল্পনা মেচ্‌নিকফ্‌কে একপ্রকার ত্যাগই করিতে

হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একেবারে হতাশ হনপড়ে। যত প্রকার অম্লস্বাদযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে তিনি নানা দেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু পরীক্ষার পর বুল্‌গেরিয়া অঞ্চলের এক প্রকার দধিতে (Yoghurt) বাঞ্ছিত জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই জীবাণুগুলিও দধির অম্ল অর্থাৎ ল্যাক্‌টিক্ এসিডের উৎপাদক, কিন্তু এই শ্রেণীর সাধারণ জীবাণু হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। আমাদের পাকযন্ত্রের উত্তাপকে সহ্য করিয়া এগুলি বেশ বৃদ্ধি পাইতে পারে। মেচ্‌নিকফ্ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন যে বুল্‌গেরিয়ার এক শ্রেণীর লোক এই দধি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ।

ইহার পর আমাদের দেশের দধি এবং ইজিপ্তের লেবেন (Leben) লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উভয়েই তিনি তাপসহিষ্ণু জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। আমাদের দধির জীবাণু ৯৯° ডিগ্রির অধিক উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু বুলগেরিয়ার দধির জীবাণুগুলিকে প্রায় ১২০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উষ্ণতায় জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। শিশুর অন্ত্রে যে-সকল স্বাস্থ্যকর জীবাণু দেখা যায় সেগুলি এই জাতিরই অন্তর্গত।

যাহা হউক এই আবিষ্কারের পর হইতে দধি ভক্ষণ ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইউরোপের বড় বড় সহরে দধির কারখানা খোলা হইয়াছে; শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই ইহার হিতকারিতার কথা শুনিয়া আজকাল দধিকে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে ধরিতেছেন। দধি যে মানুষকে দীর্ঘায়ু এবং বলিষ্ঠ করে, একথা সকলে আজও নিঃসন্দেহে স্বীকার না করিলেও, ইহা যে পাকযন্ত্র-সম্বন্ধীয় অনেক পীড়ার একটি মহৌষধ তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।

বয়স অধিক হইলে অনেক সময় অকারণে মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই ব্যাধির প্রতিকারে দধির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দেখা গিয়াছে। তা' ছাড়া রক্তহীনতা, পেটফাঁপা, অবসন্নভাব, মাথাধরা ইত্যাদি ছোট বড় নানা প্রকার পীড়ায় ইহা খুবই উপকার করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রায় সকল-ব্যাধিই পাকনালীর সেই অনিষ্টকর জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন। সুতরাং দধির স্বাস্থ্যকর জীবাণুই যে, দেহ-শত্রুগণকে ধ্বংস করিয়া মানুষকে নিরুপদ্রব করে তাহাতে বোধ হয় আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। দধির অপর কোন গুণ থাকুক্ বা না থাকুক্ ইহার যে এক অদ্ভুত পাচকশক্তি আছে কেবল তাহার জন্যই জিনিষটা সর্ব্বজাতির প্রধান খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যবর্দ্ধক বলিয়াই হাটে বাজারে দধি নামক যে এক অতি তরল পদার্থ বহু ব্যয়ে ক্রয় করা যায়, তাহা ব্যবহার করিবার জন্য পাঠককে কেহই পরামর্শ দিবে না। খাঁটি দধি-জীবাণু দ্বারা প্রস্তুত দধিই স্বাস্থ্যপ্রদ। স্বাদে গন্ধে বর্ণে যে দধি নিকৃষ্ট তাহা স্বাস্থ্যহানিকর জীবাণুরই আবাসভূমি একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাজেই ইহার ব্যবহারে স্বাস্থ্যের হানি হইবারই কথা। বাড়ীতে যাঁহারা ভাল দধি পাতিতে পারেন এপ্রকার গৃহিণী আমাদের পাড়াগাঁয়ে ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দধিব্যবসায়িগণ নিরক্ষর বটে কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে অনেকে দীর্ঘকালের পুরুষপরম্পরাগত অভিজ্ঞতার ফলে অনিষ্টকর জীবাণু তাড়াইয়া তাহাদের "সাঁজা"গুলিকে এমন সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করে যে, ইহাদের হাতের দধি কখনই খারাপ হইতে দেখা যায় না। খাঁটি দধি-জীবাণু দিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দই পাতা আমাদের দেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

চা-পান

প্রাতে শয্যাত্যাগ করার পরে যখন শরীরে জড়তা থাকে, সেই সময়ে এক পেয়ালা চা-পান যে কত প্রীতিকর, তাহা চা-পায়ী পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তা'র পরে অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যায় যখন দিবসব্যাপী শ্রমে শরীর অবসন্ন, তখন আর এক পেয়ালা গরম চা যে, কিপ্রকার স্ফূর্তিজনক, তাহাও চা পায়ীকে নূতন করিয়া বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। চা-পায়ীদের এইপ্রকার আরাম দেখিয়া যদি কেহ বলেন, চা-পান একটা নেশা,—আফিং, গাঁজা, সিদ্ধি বা তামাকের মত তীব্র নেশা না হউক, একটা মৃদু রকমের নেশা,—তাহা হইলে চা-পায়ীদের উপরে যথেষ্ট অবিচার করা হয়। নিকোটাইন্, মরফাইন্ প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিজ্জ-সামগ্রী দেহস্থ হইলে নেশার উদ্রেক করে, সেগুলির লেশমাত্র চায়ে নাই; কাজেই জিনিষটাকে গাঁজা, সিদ্ধি, আফিং বা তামাকের কোটায় ফেলিতে গেলে অন্যায় হয়। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যদি কোন চা-পায়ী বলেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীকে একটু উত্তেজিত করিয়া শরীরটাকে চাঙ্গা করিতে পারে এমন কোন বস্তু চায়ে নাই; তাহা হইলেও কথাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক হয়। পৃথিবীর উপরে যে-সকল গাছ-গাছড়া আছে, তাহা মানুষের উপকারের জন্য ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা জানি না, তবে বুদ্ধিমান্ মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া লতা পাতা ফল মূল আহরণ করিয়াই যে, নানা ঔষধপত্রের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ডাক্তারি, কবিরাজি বা হকিমি চিকিৎসকদের বোধ হয় প্রায় পনেরো আনা ঔষধ উদ্ভিদ্ হইতে সংগ্রহ করা, বাকি এক আনা হয় ত আকরিক বা অপর কিছু। উদ্ভিদের যে অংশটা প্রাণিশরীরে

প্রবেশ করিয়া শরীরে নানা প্রকার কার্য্য দেখায়, বিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণতঃ তাহাকে আল্‌কালইড্ (Alkaloids) বলে। কুইনিন্, সিন্‌কোনা, কোকেন্, ষ্ট্রিক্‌নাইন্ এগুলির সকলেই আল্‌কালইড্। রসায়নবিদ্‌গণ চা-কে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাতে ঐ প্রকার একটা বিশেষ গুণসম্পন্ন আল্‌কালইড্ দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় কাফিন্ (Caffeine) বলা হইয়া থাকে। আমাদের দেহের উপরে এই জিনিষটার যে একটুও প্রভাব নাই, একথা কখনই বলা যায় না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, যদি কোন চা-পায়ী বলেন, চিনি, দুধ ও গরম জলের সরবতে চায়ের ক্বাথ্ মিশাইলে, এই অপূর্ব্ব পানীয়টিতে একটা সুগন্ধ ও একটু স্বাদুতা আনা হয় মাত্র, তবে তাঁহার উক্তিকে কখনই পক্ষপাতদোষশূন্য বলা যায় না। চা'য়ে এমন কিছু আছে, যাহা চা-পায়ীদিগকে চা'য়ের পেয়ালার দিকে আকর্ষণ করে। জঠরানলকে এই আকর্ষণের কারণ বলিতে পারা যায় না; সম্মুখে স্তূপীকৃত গরম লুচি ও মিষ্টান্ন থাকা সত্ত্বেও কেবল এক পেয়ালা চা খাইয়া চলিয়া গেলেন, এমন চা-পায়ী অনেক দেখা যায়। ফ্যাসানও ইহার কারণ নয়, ভাঙা কড়াইয়ে জল গরম করিয়া ঘটির মধ্যে চা প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই চা পিতল বা কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া পান করিয়াছেন, এমন পাকা চা-পায়ীও দুর্লভ নয়। দু'চার জন একত্র বসিয়া চা পান না করিলে চায়ের সভা জমে না; সুতরাং মনে হইতে পারে, বন্ধুবান্ধবদের সহিত কিছুক্ষণের জন্য মিলনই চা'য়ের পেয়ালার দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এরকম লোকও অনেক দেখিয়াছি, যাঁহারা অন্তঃপুরের কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া একা একা চা-পান করেন এবং ইহাতে তাঁহাদের তৃপ্তিলাভের কোনই বিঘ্ন হয় না।

চা বিশ্লেষ করিলে কাফিন্ নামক যে একটি পদার্থ ধরা পড়ে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া টানিন্ বা ট্যানিক্

এসিড্ নামক একটি অম্ল এবং একপ্রকার সুগন্ধি তৈলবৎ পদার্থও ইহাতে পাওয়া যায়। পাকা হাতে প্রস্তুত চায়ে যে একটি সুগন্ধ অনুভব করা যায়, তাহা ঐ তৈলেরই গন্ধ। জিনিষটা সহজেই বাষ্পীভূত হইয়া যায়, এজন্য খুব দক্ষ লোক ব্যতীত কেহই চায়ের এই সুঘ্রাণটি রাখিতে পারে না। চা ঠাণ্ডা হইয়া গেলে বা ঠাণ্ডা চা'কে পুনরায় গরম করিয়া খাইতে গেলে সেই তৈল উড়িয়া যায়, সুতরাং চা মাটি হইয়া যায়। যাহা হউক আমরা একে একে চা'য়ের উপাদান-গুলির কার্য্য আলোচনা করিব, চায়ের কোন্ উপাদান মানুষকে এত মুগ্ধ করে, ইহাতে ধরা পড়িয়া যাইবে।

প্রথমে চা'য়ের গরম জলটার বিষয় আলোচনা করা যাউক। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা পাকা চা-পায়ী, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ বারো আনা লোক চায়ের ঐ গরম জলটার মোহে আবিষ্ট হইয়া চা পান করেন। কথাটা অদ্ভুত হইল, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা এপ্রকার অনেক লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা প্রাতে এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ জল পান না করিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের এই জলপানের নেশা ঠিক চা'য়ের নেশার মতই প্রবল। প্রথমে হয় ত ডাক্তার বা কবিরাজের পরামর্শে ইঁহারা গরম জল পান সুরু করেন, কিন্তু কালক্রমে ইহা এমন একটা অভাবে পরিণত হয় যে, প্রাতে গরম জল পান না করিয়া ইঁহাদের সুস্থ থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। জলের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, অপর পদার্থের তুলনায় ইহা অধিক তাপ ধরিয়া রাখিতে পারে। একসের লৌহে এবং ঠিক্ একসের জলে সমান তাপ প্রয়োগ কর। লৌহ তাহাতে অত্যন্ত গরম হইয়া দাঁড়াইবে, হয়ত তাহা স্পর্শ করাও অসম্ভব হইবে; কিন্তু জল তাহাতে সে প্রকার অসহ্য উষ্ণতা দেখাইবে না, অথচ তাপটা সম্পূর্ণ জলেই থাকিয়া

যাইবে। এই কারণে ৬০° ডিগ্রী উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড অপেক্ষা সেই প্রকার উষ্ণ জলে অধিক তাপ গুপ্তাবস্থায় থাকিয়া যায়। কাজেই আমরা যখন চা'য়ের সহিত বা চা-বর্জ্জিত গরম জল পান করি, তখন সেই জলের সহিত অনেকটা তাপ শরীরে প্রবেশ করাই। সুতরাং হঠাৎ এই তাপ হৃদ্‌পিণ্ড প্রভৃতি শারীরযন্ত্রের নিকটে পৌঁছিয়া যে তাহার নিজের ক্রিয়া দেখাইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পাক-যন্ত্রের এবং স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে গরম জলের যথেষ্ট প্রভাব আছে। অনেক স্নায়বিক পীড়ায় এক প্রকার গরম জলের চিকিৎসাও প্রচলিত রহিয়াছে; এই নূতন চিকিৎসায় অনেক রোগী সুস্থ হইয়া থাকেন; সুতরাং গরম জল পানে আমাদের দেহটিকে একটু উত্তেজিত করিবার ইচ্ছাটাই তলে তলে কাজ করিয়া আমাদিগকে গরম চা'য়ের দিকে আকর্ষণ করে, এই কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

যে সকল রোগে চা-পান নিষিদ্ধ, তাহাদের চিকিৎসায় ডাক্তারেরা চা-পানের পরিবর্ত্তে গরম জল পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। রোগী এই ব্যবস্থা-অনুসারে চলিয়া চা-পানের দুর্লভ আনন্দটুকু হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

এই সকল কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, চা-পায়ীদের মধ্যে সত্যই বারো আনা লোক অজ্ঞাতসারে গরম জলটুকুরই গুণে মুগ্ধ হইয়া চায়ের পেয়ালার দিকে আকৃষ্ট হন। গরম জলপান সহ্য করিতে পারেন না, অথচ চা-পান করেন, এ প্রকার অনেক লোক দেখা যায়। ইঁহাদের চা-পান শিশুদের কুইনিন্ সেবনের ন্যায়। কুইনিনের তিক্ত বটিকার উপরে চিনির পলস্তরা থাকিলে শিশু ঔষধ সেবনে আপত্তি করে না, হয় ত শেষে আগ্রহের সহিত কুইনিনের বড়ি চাহিয়া ভক্ষণ করে। ইঁহারাও সেই প্রকার স্বাদ-গন্ধবর্জ্জিত গরমজল পান করিতে না পারিয়া তাহার সহিত দুগ্ধ, চিনি ও চায়ের

পাতার সুগন্ধি ক্বাথ্ মিশাইয়া সেই গরমজলই পান করেন। চিনির পলস্তরা কুইনিনের গুণ হ্রাস করে না ; চায়ের ক্বাথ্ ও দুগ্ধ, চিনি মিশাইলে গরম জলেরও গুণ খর্ব্ব হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে, যাঁহারা খাঁটি গরম জল সেবন করিতে পারেন না, তাঁহারা দুগ্ধ চিনি ইত্যাদি মিশাইয়া সেই গরম জলই পান করেন। গরম জলই ইঁহাদিগকে চা'য়ের পেয়ালার দিকে অনেকটা টানিয়া আনে।

এখন চা'য়ের ক্বাথের দুইটি প্রধান উপাদান ট্যানিক্ এসিড্ এবং কাফিনের গুণাগুণ বিচার করা যাউক। ট্যানিক্ এসিড্ অনেক উদ্ভিদেরই পাতায় ও ছালে অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, চায়ের পাতাতেও ইহা আছে। সুস্থ প্রাণিদেহের উপরে এই দ্রাবকটির কার্য্য খুব ভাল নয়। জিনিষটা কষায় গুণ-বিশিষ্ট, কাজেই কষায় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে-সকল অনিষ্ট দেখা দেয়, ইহাতে কেবল তাহাই দেখা যায় মাত্র। ফিট্‌কিরি একটা কষায় দ্রব্য, দাঁতের মাজনের সহিত ইহা মুখে দিলে, মুখ-বিবরের চর্ম্মগুলি যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসে, জিহ্বায় যেন একটা টান্ পড়ে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া আসে। কেবল মুখেই যে কষায় দ্রব্যের এই প্রকার কার্য্য দেখা যায় তাহা নয়, ইহা আমাদের দেহাভ্যন্তরের যে অংশের সংস্পর্শে আসে, তাহাকে ঠিক ঐ প্রকারেই শুকাইয়া টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে ইহা পাকযন্ত্রের চর্ম্মগুলিকে ঐ প্রকারে শুষ্ক করিতে ও টানিয়া ধরিতে চায়, কাজেই পাকক্রিয়ার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মুখে থাকিবার সময়ে ইহা মুখ শুষ্ক করিয়া দেয় বলিয়া খাদ্যের সহিত যথেষ্ট লালা মিশ্রিত হইতে পারে না, কাজেই লালাহীন ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইয়া সহজে হজম হইতে চায় না। পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশিলেও ইহার ফল ভাল হয় না। উদরস্থ খাদ্য ইহার সংস্পর্শে আসিলে সঙ্কুচিত হইয়া এমন কঠিন দাঁড়ায় যে, তখন সেগুলিকে হজম করা

দায় হইয়া উঠে, কাজেই অজীর্ণ দেখা দেয়। মাংসের সহিত ট্যানিক্ এসিড বা অপর কষার দ্রব্যের ঘোর শত্রুতা আছে। ইহার সংস্পর্শে আসিলেই মাংস রবারের ন্যায় এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া দাঁড়ায়; যাঁহাদের জঠরানল খুব প্রখর, তাঁহারাও এই প্রকারে রূপান্তরিত মাংস সহজে হজম করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, মাংসে আল্‌বুমিন্ বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, তাহা ট্যানিক্ এসিডের সংস্পর্শে আসিলেই ঐ প্রকার শক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

ট্যানিক্ এসিডের পূর্ব্বোক্ত গুণগুলির কথা মনে করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, খাদ্যের সহিত ইহা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের পাকযন্ত্র কখনই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে চা-পায়ীদের শঙ্কিত হইবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। চা'য়ের পাতায় ট্যানিক্ এসিড্ অতি অল্পই আছে, এবং যাহা আছে তাহার সামান্য অংশই গরম জলের সাহায্যে তিন চারি মিনিটে বাহির হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, চায়ের পাতা গরম জলে ফেলিবার পরে চার মিনিট পর্য্যন্ত সেই কাফিন্ নামক বস্তুটিই পাতা হইতে বাহির হইতে থাকে; তা'র পরে এক একটু করিয়া ট্যানিক্ এসিড্ বাহির হইতে আরম্ভ করে। সমগ্র ট্যানিক্ এসিড্ বাহির করিতে হইলে চায়ের পাতাগুলিকে অন্ততঃ আধ্ ঘণ্টা ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখার প্রয়োজন। কিন্তু চা-গুলিকে আধ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া চা-প্রস্তুত করেন এমন আনাড়ি চা-খোর বোধ হয় সমগ্র জগতে দুর্লভ। অতএব পাকা হাতে প্রস্তুত চা-পানে যাঁহারা অভ্যস্ত, ট্যানিক্ এসিডের ভয় না করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দে চা-পান করিবার পরামর্শ দিতে পারা যায়।

এখন চা'য়ের অপর উপাদান কাফিন্ নামক উদ্ভিজ্জ-বস্তুটির বিষয় আলোচনা করা যাউক। এক কথায় বলিতে গেলে, কাফিনের ন্যায়

পরম উপকারী উদ্ভিজ্জ-বস্তু দুর্লভ। দেহস্থ হইলে ইহা স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, কিন্তু অপর উত্তেজক-পদার্থ গ্রহণ করিলে উত্তেজনার পশ্চাতে যে এক একটা অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। এটা বড় কম কথা নয়। সুরা, অহিফেন প্রভৃতি পদার্থ শরীরকে খুবই উত্তেজিত করে, কিন্তু উত্তেজনার শান্তি হইলে যে অবসাদ আসিয়া দেখা দেয়, তাহা পূর্ব্বের উপকার টুকুকে নষ্ট করিয়া মোটের উপর অপকারই আনিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত প্রাণীর মস্তিষ্কের উপরে কাফিনের প্রভাব অতি আশ্চর্য্যজনক। কুচিলার সার অর্থাৎ ষ্ট্রিক্‌নাইন্ (Strychnine) জিনিষটা কখন কখন মস্তিষ্কের উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহা কখনই প্রত্যক্ষভাবে মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিতে পারে না। কাফিন্ জিনিষটা কোন প্রকার অবসাদের সূত্রপাত না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিতে পারে।

কাফিনের পূর্ব্বোক্ত গুণগুলির কথা শুনিলে চায়ের সহিত কাফিন্-ভক্ষণে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। যাহা মস্তিষ্কের উত্তেজক তাহাই অনেক সময়ে সুনিদ্রার বিঘ্নকর, কাজেই চা জিনিষটাকে নিদ্রানাশক বলিতেই হইতেছে। কিন্তু চা'য়ের বহু গুণের মধ্যে এই ক্ষুদ্র দোষটুকু গুণগুলিকেই উজ্জ্বল করিতেছে বলিয়া চা-পায়ী পাঠক সান্ত্বনা পাইতে পারিবেন। তা'ছাড়া যে চা কাফি আমরা প্রতি-দিনই দুইবেলা ব্যবহার করিতেছি, তাহাকেই যখন অহিফেনসেবনে নিদ্রালু ও লুপ্তচেতন ব্যক্তিকে সজাগ করিয়া দিতে দেখা যায়, তখন বাস্তবিকই আনন্দ হয়। চা'য়ের যে ধর্ম্মটিকে, সাধারণ লোকে দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহাই সুচিকিৎসকের হাতে পড়িয়া গুণে পরিণত হয়।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমরা প্রাতে উঠিয়াই যখন এক পেয়ালা চায়ের জন্য তাগিদ দিতে আরম্ভ করি, তখন গরম-জল পানের ইচ্ছা এবং তাহারি সঙ্গে একটু

কাফিন্ ভক্ষণ করিয়া মাথাটাকে সজাগ করিবার চেষ্টা একত্র কার্য্য করিয়া আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে চা'য়ের পেয়ালার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। ভুলভ্রান্তি লইয়াই মানুষ, এবং এই বৃহৎ সংসারটাও ভুলভ্রান্তি ও মোহে আচ্ছন্ন। এগুলি না থাকিলে এই পৃথিবী স্বর্গ হইয়া পড়িত এবং মানুষগুলাও এক-একটা দেবতার স্থান অধিকার করিত। কিন্তু দেবতার আসন আজও মানুষে দখল করিতে পারে নাই, কাজেই কতকগুলা মানুষ চা-পানের প্রকৃত মর্ম্মটা ভুলিয়া গিয়া সেই অন্তর্নিহিত ইচ্ছার বশে চায়ের পেয়ালা লইয়া টানাটানি করে এবং আর এক দল লোক ইহা দেখিয়া আর এক ভুলের বশে চা-পায়ীদিগকে নেশা-খোর বলিয়া ফেলে।

আমরা যে প্রকারে চা প্রস্তুত করিয়া পান করি, তাহার দুইটি উপাদান চিনি ও দুধের কথা এখনো কিছু বলা হয় নাই। বলা বাহুল্য, কবোষ্ণ কাঁচা দুধ এবং পরিষ্কার চিনি উভয়ই অতি উপাদেয় সামগ্রী। এই দুইটি দ্রব্য অনেককে চায়ের পেয়ালার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং শেষে তাঁহারা নিত্য চা-সেবী হইয়াছেন ইহাও অনেক দেখিয়াছি। চিনি জিনিষটা সুস্বাদু হইলেও চায়ের সহিত ইহার অধিক ব্যবহার একবারেই ভাল নয়; কিন্তু দুধের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারে দোষ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চায়ের ট্যানিক্ এসিড্ স্বাস্থ্য হানি করে, কিন্তু চায়ের পাতা চারি মিনিটের ঊর্দ্ধকাল গরম জলে না রাখিলে উক্ত দ্রাবক পদার্থটি নির্গত হয় না; যদিই বা কিছু বাহির হয়, চায়ের ক্বাথে দুধ মিশাইলে এসিডের অনিষ্টকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে যাঁহারা অল্প দুগ্ধ সংযোগে চা-পান করেন, তাঁহাদের এই কার্য্যটিকে কখনই বিজ্ঞানানুগত বলা যায় না। বিনা চিনিতে চা খাওয়া বরং ভাল, কিন্তু বিনা দুগ্ধে চা-পান একবারে নিষিদ্ধ।

বাবিলোনীয় জ্যোতিষিগণ

য়ুরোপীয় প্রাচীন-লেখকগণ বাবিলোনীয়দিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকগণও প্রাচীনদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা-প্রতিষ্ঠার উচ্চাসন বাবিলোনীয়দিগকে দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারা এই উচ্চ সম্মানের উপযুক্ত পাত্র কি না, তাহা বড় কেহ এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন নাই, এবং অনেকেই প্রাচীন লেখকদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া পুরাতন মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীনগণের যুক্তিহীন কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আমূল ইতিহাস যথাসম্ভব পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এইপ্রসঙ্গে বাবিলোনীয় জ্যোতিষের ইতিহাসও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে বাবিলনে প্রথম জ্যোতিষ-চর্চ্চা আরম্ভ হয় তাহা আজও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, এবং কোন সময়ে হইবে কি না সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ বর্ত্তমান। প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে দুই এক স্থানে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অভ্যুদয়-কালনিরূপণের কোনই সহায়তা হয় না। কারণ, এই সকল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ কালে প্রায়ই একতা লক্ষিত হয় না এবং একাধিক গ্রন্থলিখিত, একই ঘটনার বিবরণ-মধ্যে অনেক সময়েই নানা পার্থক্য দেখা গিয়া থাকে; কাজেই এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির

গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত তাহা এখন নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অন্য উপায়ে নিরূপিত কাল ও বিবরণের উপরও সন্দেহ হইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বেলস্ নামক সুবিখ্যাত নৃপতির রাজত্বকালে জ্যোতিষ-চর্চ্চা বাবিলনে প্রথম আরম্ভ হয়। বেলস্ একজন নানা-বিদ্যাপারদর্শী গুণবান্ নৃপতি ছিলেন, ইঁহার রাজত্বকালে অনেক জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। যে-সকল প্রাচীন গ্রন্থ বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য্য বেরোসস্ লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, সেগুলির সমস্তই উক্ত বাবিলোনীয় নৃপতি বেলস্ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেরোসস্ কেবল গ্রন্থগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন মাত্র।

সকল শাস্ত্রের মূলে প্রায়ই কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এই সকল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে কাজ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কেবল বিশ্বাস দ্বারা কাজ করা শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা স্বতঃই একটি দৃঢ় অবলম্বন খুঁজিতে আরম্ভ করে, এবং শেষে পূর্ব্ব-বিশ্বাসের নানা সংস্কার করিয়া ও তাহাকে নানা প্রকারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অন্ধবিশ্বাসের মূলগত কারণ আবিষ্কার করে, এবং পূর্ব্বেকার ভিত্তিহীন শাস্ত্রকে সজীব ও সমূল করিয়া গড়িয়া তোলে। বাবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, অধিবাসিগণ গ্রহনক্ষত্রযুক্ত আকাশমণ্ডলকে পার্থিব ঘটনাবলির অবিকল প্রতিবিম্ব বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং গ্রহাদির ভেদযোগ প্রভৃতি সংঘটনকালে পৃথিবী যে অবস্থায় থাকে ও যে-সকল ঘটনা ইহাতে সংঘটিত হয়, গ্রহাদি সেই সেই অবস্থায় পুনরায় উপস্থিত হইলে, তত্তৎ ঘটনা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই লক্ষিত হইবে বলিয়া তাহাদের মনে

দৃঢ় সংস্কার ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা ভবিষ্য ঘটনা জানা যায়, এ প্রকার বিশ্বাস আদিম বাবিলোনীয় জ্যোতিষিগণের মধ্যে ছিল না। পৃথিবীতে কোন একটি ঘটনা সংঘটিত হইলে, নভঃস্থ জ্যোতিষ্কগণ পরস্পর কি প্রকার অবস্থায় থাকিবে, এবং এতদুভয় মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি, তাহা নির্ণয় করা ইঁহারা শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের মধ্যে আরও একটি বিশ্বাস অতি প্রবল ছিল। ইঁহারা বলিতেন,—অদ্য পৃথিবীতে যে-সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ হইল, তিনশত ষাইট হাজার বৎসর পূর্ব্বে অবিকল সেই সকল ঘটনা পৃথিবীতে লক্ষিত হইয়াছিল, এবং ৩৬০,০০০ বৎসর পরেও ঠিক ঐ ঘটনাগুলি সংঘটিত হইবে।

জ্যোতিষিগণ কি প্রকারে গণনা করিয়া এই তিনশত ষাইট হাজার সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেসম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। অনেকেই বলেন, গ্রহাদি-পরিদর্শন বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলম্বনে উক্ত সংখ্যা আবিষ্কৃত হয় নাই। সেমাইট্ (Semite) ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মূল সংখ্যা ছয়কে দশ (উভয় হস্তের অঙ্গুলিসংখ্যা) দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল ৬০কে বাবিলোনীয়গণ সস্ বলিত, এবং ইহাকে আর দশ দ্বারা গুণ করিয়া লব্ধ সংখ্যা ৬০০ শত "নার্" নামে অভিহিত হইত। এই শেষোক্তসংখ্যাটি তাহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, এবং ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে আগত পবিত্র সংখ্যা বলিয়া পূজ্য ছিল। ইহা হইতে আজকাল অনেকেই অনুমান করিতেছেন, এই স্বর্গীয় ও পবিত্র সংখ্যা ছয় শতের বর্গ করিয়াই সম্ভবতঃ বাবিলোনীয়গণ ৩৬০,০০০ সংখ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বাবিলনে জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রতিষ্ঠার এই প্রথম উদ্যমের ইতিহাসে কোনই বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। যে-কোন জাতির আদিম ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে পূর্ব্বোক্ত

প্রকার দুই একটি সংস্কার প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। পাশবপ্রকৃতি ঘোর অসভ্যজাতির মধ্যেও সৃষ্টিপ্রকরণাদি-সম্বন্ধে এইরূপ অনেক আজ্‌গুবি সিদ্ধান্ত বড় দুষ্প্রাপ্য নহে।

বাবিলনে প্রকৃত জ্যোতিষচর্চ্চার সূত্রপাত ঠিক কোন সময়ে হয় তাহার স্থিরতা নাই। আকাডিয়ানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব সাত সহস্র অব্দে লিখিত যে-সকল গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রহণাদির পূর্ণ বিবরণ ও গ্রহোপগ্রহাদির উদয়াস্ত-সম্বন্ধে নানা কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, খৃঃ পূঃ সপ্ত সহস্রাব্দে বাবিলোনীয় পণ্ডিতগণ কিঞ্চিৎ জ্যোতিষশাস্ত্র জানিতেন, এবং গ্রহতারকাদির পরিদর্শনপ্রথা তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। ব্রিটিশ্‌ মিউজিয়মে প্রাচীন বাবিলনের কয়েকখানি প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে, ইহার সাহায্যে জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রতিষ্ঠার কালনিরূপণার্থে কয়েক বৎসর হইল নানাবিধ চেষ্টা হইয়াছিল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তরফলকগুলি যথার্থই বাবিলনের খোদিত হইলে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু উক্ত প্রস্তরস্থ খোদিত গ্রহণাদির চিত্র ও বিবরণের মধ্যে কোনটিতেই সংঘটনকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ইহাতে এগুলি অপ্রকৃত এবং আধুনিক সময়ে খোদিত বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছেন। কাজেই জ্যোতিষচর্চ্চারম্ভের প্রকৃত কালনির্ণয় অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাবিলোনীয় পণ্ডিতগণ নভঃস্থ দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কগণকে নানা অংশে বিভক্ত করিতেন এবং এই গ্রহনক্ষত্রযুক্ত আকাশের অংশ সকল এক একটি পৃথক দেবতার নামে অভিহিত করিয়া তত্তৎ দেবতার নির্দ্দিষ্ট গুণাবলি তারকামণ্ডলিতে আরোপিত করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের এই শৈশবাবস্থায় গ্রহাদির নামকরণে পূর্ব্বোক্ত প্রথা প্রচলিত থাকায়

আকাশের তাৎকালিক অবস্থার সহিত আধুনিক অবস্থার তুলনা করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এক এক দিগংশস্থ সকল গ্রহ তারা একই নামে অভিহিত হওয়ায়, এবং কখন কখন গতিবৈচিত্র্য দ্বারা একই জ্যোতিষ্ক একাধিক নামে আখ্যাত হওয়ায়, প্রাচীন গ্রন্থোল্লিখিত গ্রহাদির সম্যক্ পরিচয় পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। এতদ্ব্যতীত এক জাতীয় সাতটি করিয়া জ্যোতিষ্ক লইয়া শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা নামকরণ-প্রথা কয়েকখানি গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক গ্রন্থে সপ্তগ্রহ ও সপ্ত যমজতারকা ডিফু ও মাসু নামে অভিহিত হইয়াছে শুনা যায়। এই গ্রন্থে নামকরণের আরও একটি অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। আকাশের যে অংশে যে জ্যোতিষ্ক অবস্থিত সেই অংশের নামানুসারে গ্রহগণের নামকরণ হইত, এবং এই প্রকার এক একটি নির্দ্দিষ্ট তারকাপুঞ্জ এক একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে কল্পনা করিয়া উক্ত দেবতাগণকে বৎসরের নানা অংশের অধিপতিরূপে উল্লেখ করা হইত।

প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থাদি পাঠ করিলে বাবিলোনীয়দিগের জ্যোতিষ-চর্চ্চার একটি গূঢ় কারণ দৃষ্টিগোচর হয়। আজকাল আমরা যে উদ্দেশ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনা করি তাহাদের সেই উচ্চতর উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না, কোন প্রকারে শুভাশুভ লক্ষণাদি জ্ঞাত হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বোধ হয়, এই হীন উদ্দেশ্যে জ্যোতিষচর্চ্চা আরম্ভ হওয়া বশতঃ ইহাতে আশানুরূপ উন্নতির কোনই লক্ষণ দেখা যায় নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটি পরিতৃপ্ত হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ গ্রহতারকাদির গতিবিধি-নির্দ্ধারণ তাহাদের নিকট একটি অনাবশ্যক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন একটি আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল স্থির করিতে হইলে বাবিলোনীয়গণ সাধারণতঃ আকাশকে আট সমানাংশে বিভক্ত

করিত এবং প্রত্যেক বিভাগস্থ নক্ষত্র সকল কি অবস্থায় আছে তাহা পরিদর্শন করিয়া আবার কোন্ সময়ে জ্যোতিষ্কগণ ঠিক উক্ত প্রকার অবস্থায় ছিল, তাহা পঞ্জিকার সাহায্যে দেখিত এবং সেই অতীত কালের সংঘটিত কার্য্যাদির যে ফল হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালেও অবিকল সেই ফল হইবে বলিয়া স্থির করিত।

মানবশিশুর মনে একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই প্রথমতঃ কাল ও স্থান, এই দুইটি জগতের চিরন্তন সামগ্রীর উপর তাহারা স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে এই অনন্ত ও অব্যয় ভাবদ্বয়কে বুদ্ধির ক্ষুদ্র ভাবমধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাদের একটা স্মৃতি যাহাতে থাকিয়া যায় তাহার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করে, এবং এই চেষ্টার ফলস্বরূপই সময়াদির পরিমাপের একটি স্থূল নিয়ম আবিষ্কৃত হয়। এই কারণেই বোধ হয়, সময়ের স্থূল পরিমাপবিষয়ে মহা অসভ্য জাতি হইতে সভ্যতম জাতির মধ্যেও একই নিয়ম বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঋতুপরিবর্ত্তনটি সহজদৃশ্য ও সুবৃহৎ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, ইহা দ্বারা সময়নির্দ্দেশ করিবার প্রথা সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। এক ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ঋতুর পুনরাগমন পর্য্যন্ত কালটিকে সকলেই স্থূল সময়গণনার পরিমাপদণ্ড-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানালোকবর্জ্জিত মহারণ্যবাসী কাফ্রির মধ্যেও কালগণনার এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই, সুসভ্য জাতিগণ সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা এই কালকে বৎসর-নামে অভিহিত করিয়া গণনাকার্য্যের সুবিধার্থে বৎসরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে মাত্র। বাবিলোনীয়দেরও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মে বৎসর-গণনাপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাস ইত্যাদির গণনাকার্য্যে ইহাদের সহিত অন্যান্য

জাতীয়-প্রথার কিছুই ঐক্য লক্ষিত হয় না; ইহারা বৎসরকে দশমাসে বিভক্ত করিত, কিন্তু ইহাদের বৎসর ঠিক কতদিনে পূর্ণ হইত তাহা জানিতে না পারায় মাসে দিনসংখ্যা কত ছিল তাহা এখন আর জানিবার যথার্থ উপায় নাই। তবে যে আজকালের মত চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল না সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, ত্রিশদিনে মাস গণিত হইলে দুই তিন বৎসর পরে মাসের সহিত ঋতুর একতা ক্রমে লোপ পাইয়া নানা বিভ্রাট উপস্থিত করিত। এইজন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বাবিলোনীয় মাস ৩৬ দিনে পূর্ণ হইয়া দশমাসে বৎসর শেষ করিত। ঈজিপ্টের ন্যায়, প্রাচীন বাবিলোনে মাসের বিশেষ কোন নাম ছিল না। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা মাসের পরিচয় পাওয়া যাইত। এই প্রথা বহু-কাল ধরিয়া বাবিলোনে প্রচলিত ছিল। আকাডিয়ান্‌দিগের অভ্যুদয়ের অনেক পরে ইহারা মাসের নামকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

বাবিলোনীয়গণ মাসগণনার পূর্ব্বোক্ত নিয়ম কয়েক শতাব্দী পরে পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে গণনাপ্রথার সংস্কার করিয়া অধুনাতন নিয়মে দ্বাদশ মাসে বৎসরগণনা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। বোধ হয় চন্দ্রপর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ত্রিশ দিনে মাস গণনা সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় এই নবপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৭০০০ অব্দে বাবিলোন্ আকাডিয়ান্‌গণ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে জেতৃগণের প্রভাবে বাবিলোনের প্রাচীন গণনাপ্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, এবং জেতৃগণেরও জাতীয় প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। আকাডিয়ান্‌গণ পূর্ব্বে ত্রয়োদশ ভাগে বৎসর বিভক্ত করিয়া ২৮ দিনে মাস পূর্ণ করিত। কিন্তু বাবিলোন্ জয়ের পর বিজিতগণমধ্যে মাসগণনার অভিনবপ্রথা দেখিয়া তাহারা ভ্রমসঙ্কুল জাতীয় প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বাবিলোনের

প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রতি মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করিয়া এই প্রকার দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু এই গণনা দ্বারা সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন অপেক্ষা কমিয়া যায় দেখিয়া কোন কোন বৎসর ত্রয়োদশ মাসে পূর্ণ করিয়া বৎসরের অল্পতা পূরণ করিত। এই পরিপূরক মাস পুরোহিতগণ কর্তৃক অনির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্ধারিত হইত। আকাডিয়ান্-অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাবিলোনীয়গণ বৎসরের পূর্ব্বোক্ত স্বল্পতা অন্য উপায়ে পূরণ করিত; ইহারা প্রতি বৎসরের একটি একটি নির্দ্দিষ্ট মাসে বিংশতি দিবসের পর উপর্য্যুপরি দুই দিবস একবিংশতি দিবস বলিয়া গণনা করিত।

জ্যোতিষের সকল ব্যাপারেই আকাডিয়ান্গণ প্রাচীন বাবিলোনীয়-দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিল, কিন্তু দুই একটি বিষয়ে আকাডিয়ান্দের প্রাধান্য দেখা যায়। দিন ও মাসের পৃথক পৃথক নামকরণ দ্বারা যে সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ইহারা বেশ বুঝিত। প্রতি মাস চারি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগস্থ দিন সকল পরিজ্ঞাত গ্রহাদির নামানুসারে আখ্যাত করা ইহাদের মধ্যে একটি সুন্দর প্রথা ছিল। অনেকে অনুমান করেন দিবসাদি নামকরণের আধুনিক প্রচলিত প্রথা আকাডিয়ান্ জ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

বাবিলোনীয়গণ তাহাদের প্রাচীন নামকরণ-প্রথা পূর্ব্বাপর এক অবস্থায় রাখে নাই। কালসহকারে ইহার অপকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে জ্যোতিষ্কগণ সুবিধাজনক নামে অভিহিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আকাডিয়ান্-প্রথা অনুসৃত হয় নাই। পরস্পর নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রকে এক এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া প্রত্যেক পুঞ্জকে পশু ইত্যাদির প্রতিকৃতি কল্পনা করিয়া তাহারা সেগুলিকে মেষ-বৃষ-মহিষাদি জীবগণের নামে অভিহিত করিত।

নক্ষত্র-নামকরণের অন্যান্য অনেক প্রকৃষ্টতর উপায় থাকিতে বাবিলোনীয়-গণ কেন যে, এই অপূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। যে যে জীবের নামে নক্ষত্রপুঞ্জকে অভিহিত করা হইত, তাহাদের সহিত জীবদিগের আকৃতিগত যে কোন সৌসাদৃশ্য ছিল তাহা কোনক্রমেই বোধ হয় না। অধুনাতন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, নক্ষত্রপুঞ্জের উদয়-ঋতুতে কর্ত্তব্য কৃষিবাণিজ্যাদির উল্লেখ করিয়া তদর্থে প্রয়োজনীয় জীবাদির নামে তারকাপুঞ্জগুলি আখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্যোতিষ্কগণের নামকরণকার্য্য শেষ হইলে বাবিলোনীয় জ্যোতিষিগণ উল্লিখিত জ্যোতিষিক সঙ্কেত ও প্রতিকৃতি ইত্যাদির সাহায্যে রাশিচক্র-বিভাগ দ্বারা তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল সকল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন,—এই রাশিচক্র-লিখনপ্রথা বাবিলোনীয়গণ সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন এবং বহু শতাব্দী পরে ইজিপ্টের জ্যোতিষীরা বাবিলোনে ইহা শিক্ষা করিয়া পরে পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এই প্রথার বিস্তার করেন।

যদিও বাবিলোনীয়গণ তাঁহাদের উন্নতি যুগের শেষাংশে জ্যোতিষ্ক-গণের নামকরণাদির উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিকগণের নিকট সেই সকল নাম সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ বহু গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিয়াও কোন্ জ্যোতিষ্কটি বাস্তবিক কি নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা এখন পরিজ্ঞাত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না। তবে অল্পদিন হইল পূর্ব্ববর্ণিত রাশিচক্রাঙ্কিত কয়েকখানি সুবৃহৎ প্রস্তর-ফলক একটি প্রাচীন বাবিলোনীয় ভজনালয়ের তলদেশে প্রাপ্ত হওয়ায় এবং বাবিলোনীয় ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের 'কয়েকখানি প্রাচীন পঞ্জিকারও

উদ্ধার সাধিত হওয়ায়, সেগুলি দ্বারা নক্ষত্রাদির পরিচয়-অবগতির কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাবিলোনীয়গণ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের গতিনির্দ্ধারণ-কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। জ্যোতিষ্ক সকল গতিশীল ও ইহারা রাত্রিকালে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করে, বাবিলোনীয়গণ ইহাই জানা যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিত। পৃথিবীর কক্ষে মেরুদণ্ড হেলিয়া থাকায় দক্ষিণাকাশস্থ যে-সকল নক্ষত্র প্রায়ই অদৃশ্য থাকে তাহাদের আকস্মিক উদয়, বাবিলোনীয়গণ বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ করিত, এবং এই সকল নক্ষত্রের উদয়কালে তাহারা নানাবিধ শুভ ও দৈবকার্য্য মহোৎসবে সম্পন্ন করিত। গ্রহদিগের জটিল গতির বিষয় ইহারা কিছুই জানিত না এবং বাহ্যতঃ ইহাদের গতি উচ্ছৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক দেখিয়া গ্রহগণকে অপদেবতা বলিয়া ভয় করিত ও শান্তপ্রকৃতি দেবগণের কৃপায় আশু বিঘ্নশান্তি-মানসে সর্ব্বাগ্রে জগতের নিয়মসংহারকারী দুষ্ট গ্রহগণকে পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিত। অনেকে অনুমান করেন, এই সময় হইতেই সুপ্রসিদ্ধ সেমেটিক্ ধর্ম্ম সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়। বাবিলোনীয়গণ কেবলমাত্র কাল্পনিক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া সপ্তগ্রহকে তাহাদের উপাস্য দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল এবং অবিকল একই কারণে দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, বজ্রাগ্নিভয়াদি আপদকেও দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহারা চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকে একটি মহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া ভয় করিত। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার এই মত পরিবর্ত্তন করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকে একটি শুভ চিহ্ন বলিয়া দেখিত।

আধুনিক জ্যোতিষীদিগের নিকট বাবিলোনীয় জ্যোতিষশাস্ত্র যে, সর্ব্বাংশে হীন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ডায়োডোনস্

নামক জনৈক খ্যাতনামা বাবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা তাঁহার এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণব্যাপার বাবিলোনের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কিছুই বুঝিতেন না, এবং কি উপায়ে গ্রহণের কাল নিরূপিত হয় সে বিষয়েও তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বেরোসস্‌ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বাবিলোনীয়গণ চন্দ্রের একার্দ্ধ উজ্জ্বল এবং অপরার্দ্ধ চিরতামসাবৃত বলিয়া বিশ্বাস করিত। দুই একখানি প্রাচীন গ্রীক্‌ ও লাটিন্‌ গ্রন্থেও, জ্যোতিষসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুই একটি ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ইহাও বাবিলোনীয়দিগের ভুল বিশ্বাসের ফল মাত্র। বাবিলোনীয় জ্যোতিষ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের পর ক্রমে ইজিপ্টে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী গ্রীক্‌ ও লাটিন্‌ গ্রন্থকারগণ তাৎকালিক সার্ব্বভৌম বিদ্যার কেন্দ্রস্থল আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে সম্ভবতঃ ঐ সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কি উপায়ে বাবিলোন হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র ইজিপ্ট ও অন্যান্য দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেসম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলেন, যে সময়ে য়িহুদী, সিরিয়ান্‌, ও বাবিলোনীয়গণ সিলুসিডিয়াগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইজিপ্টে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ে ইহারা বাবিলোনীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও তদানুষঙ্গিক কুসংস্কারাদিও সঙ্গে আনিয়া তৎসাহায্যে জাতীয় উৎসব ও পূজাদি সম্পন্ন করিত। নূতন অধিবাসিগণ এই প্রকারে তাহাদের জাতীয় বিশ্বাসাদি ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, ইজিপ্সীয়ান্‌ পণ্ডিতগণ বাবিলোনীয় জ্যোতিষের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া তাহা নানা দেশে বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এইমাত্র যে, অনেকে মনে করেন আধুনিক

উন্নত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বাবিলোনের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। বাবিলোনের প্রাচীন গ্রন্থকার বেরোসসের লুপ্ত গ্রন্থ সকলের যদি সম্পূর্ণ উদ্ধার হইত, তাহা হইলেও যে আমরা বিশেষ কোন শিক্ষণীয় বিষয় দেখিতে পাইতাম, এরূপও আশা করা যায় না। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঘোর তামসাচ্ছন্ন প্রাচীনকালেও জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করা বাবিলোনীয়গণ কর্ত্তব্যস্বরূপে জ্ঞান করিতেন, এবং অধুনাতন কালের পরম্পরাগত শিক্ষার সুফল ও আকাশ-পরিদর্শনার্থ আবশ্যক সুন্দর যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহা বড় কম গৌরবের বিষয় নহে!

পৃথিবীর শৈশব

যে বিশাল নীহারিকা-স্তূপ হইতে এই সসাগরা উদ্ভিদ্‌শ্যামলা ধরার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কোথায় ছিল এবং কি প্রকারেই বা তাহা বৃহস্পতি, শনি, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি করিল, আমরা তাহার আলোচনা করিব না। কোন বিশাল নীহারিকা-রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন পৃথিবীর সমগ্র উপাদান উত্তপ্ত বাষ্পাকারে ভীমবেগে আবর্ত্তিত হইতেছিল, সেই সময়টিকেই আমরা পৃথিবীর জন্মকাল বলিতেছি। এই জন্মকাল হইতে আমাদের পৃথিবী কি প্রকারে ধীরে ধীরে নদী সমুদ্র পাহাড় পর্ব্বত ও তরুলতাতে আবৃত হইয়া এখন প্রাণীর আবাসক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

পৃথিবী এখন যেমন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক্ খায়, তখন পূর্ণাবর্ত্তন দিবার জন্য শিশু পৃথিবী এত দীর্ঘকাল ক্ষেপণ করিত না। ঠিক কালটি নিরূপণ করা কঠিন; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবী যে, তিন চারি বার পূর্ণাবর্ত্তন সমাপন করিত, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পৃথিবী এখন চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করে, ইহাতে আমরা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখি; আমাদের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয়, সেই অতি প্রাচীন যুগে জীবশূন্যা বসুন্ধরায় প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ তিন চারিবার সূর্য্যের উদয়াস্ত হইত। তখন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানটি হয় ত জমাট বাঁধিয়া সদ্য কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল,

কিন্তু ইহার পৃষ্ঠভাগ তখনও অত্যুষ্ণ তরল ও বায়বীয় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। এই আবরণই কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া এখনকার নদীসমুদ্র পাহাড়পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের এখনকার আকাশে নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ বায়ুর আকার গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। তা' ছাড়া কিছু অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্পও আছে। মাথার উপরে কোন জিনিষ চাপিয়া থাকিলে, তাহা বাহকের মস্তকে বিলক্ষণ চাপ দেয়। আমাদের ধরিত্রী সর্ব্বংসহা হইলেও, তাহাকে ঘেরিয়া যে, নাইট্রোজেন্ অক্সিজেন্ প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ রহিয়াছে, তাহা ভূপৃষ্ঠে চাপ দিতে ছাড়ে না। হিসাব করিলে দেখা যায়, আকাশের বায়বীয় পদার্থ এখন প্রতি বর্গইঞ্চি-পরিমিত স্থানে প্রায় ৭॥০ সের চাপ দিয়া থাকে। নদনদী সাগর-মহাসাগরাদির জলরাশি এবং আমাদের ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ উপাদানই যখন বায়বীয় আকারে সদ্যোজাত পৃথিবীকে ঘেরিয়া ছিল, তখন পৃথিবীর উপরে আকাশের চাপের পরিমাণ যে, অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ শিশু পৃথিবীর উপরকার চাপের পরিমাণ হিসাব করিয়া, প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে অন্ততঃ ৬২ মণ হইতে দেখিয়াছেন। এখন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আকাশের বায়ুরাশি যে সাড়ে সাত সের চাপ দেয়, তাহার পরিচয় আমরা হঠাৎ পাই না, কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে উহা অনেক কাজ করে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহযন্ত্রগুলির কথা স্মরণ করিলে বায়ুর চাপ দ্বারাই ইহাদের অনেকগুলিকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যায়। সেই অত্যুষ্ণ দ্রব পদার্থময় ধরাপৃষ্ঠে তখন জীবের বাস ছিল না, কাজেই জীবের উপরে সেই বিশাল ৬২ মণ চাপের কোনই কার্য্য দেখা যাইত না, কিন্তু ইহা দ্বারা সেই সময়ে ভূপৃষ্ঠের যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই একথা বলা যায় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন নীহারিকা-রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া আমাদের পৃথিবী যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ভূপৃষ্ঠ অত্যুষ্ণ দ্রব পদার্থে আচ্ছন্ন ছিল, এবং ইহার উপরে আবার আবর্ত্তনবেগটাও অত্যন্ত অধিক ছিল; সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্তের (Equator) চারিদিকে দ্রব পদার্থগুলি একত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অনুমান যে যথার্থ, পৃথিবীর বর্ত্তমান আকৃতি হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়; আবর্ত্তন-বেগের প্রাবল্যে যে-সকল দ্রব পদার্থ নিরক্ষ-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কালক্রমে তাহাই জমাট বাঁধিয়া এখন নিরক্ষ-প্রদেশকে মেরুপ্রদেশের তুলনায় কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শিশু পৃথিবীর প্রবল আবর্ত্তন-বেগ কেবল মেরুপ্রদেশকে কিছু চাপা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; নানা বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ পৃথিবীর আকাশের উপরেও উহার কার্য্য ছিল বলিয়া মনে হয়। আকাশের বায়ব-পদার্থ-গুলি আবর্ত্তনের বেগে নিরক্ষ-প্রদেশের উপরকার আকাশে সঞ্চিত হইয়া সম্ভবতঃ পৃথিবীর বায়ব-আবরণের গভীরতা বৃদ্ধি করিত। বাষ্পাবরণ যেখানে গভীর তথাকার উষ্ণ দ্রব্য সহজে শীতল হইতে চাহে না; অগভীর আবরণের ভিতরকার জিনিষই তাপ ত্যাগ করিয়া অল্প সময়ে শীতল হইয়া পড়ে। নিরক্ষ-প্রদেশের উপরকার আকাশে অধিক বায়বীয় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া পড়ায়, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের বাষ্পাবরণের গভীরতা নিশ্চয় কমিয়া আসিয়াছিল এবং ইহাতে নিরক্ষ-প্রদেশের তুলনায় মেরুপ্রদেশের দ্রব পদার্থগুলি শীতলতর হইয়াছিল। জল গরম করিতে গেলে যেমন পাত্রের নিম্নের জল অগ্নির তাপে স্ফীত হইয়া উপরে উঠে এবং উপরকার শীতল জল নীচে নামিয়া পাত্রে এক প্রকার প্রবাহের উৎপত্তি করে, পৃথিবীর নিরক্ষ-প্রদেশের উষ্ণ দ্রব পদার্থ এবং মেরুপ্রদেশের অপেক্ষাকৃত শীতল তরলপদার্থ, এই দুইটির মধ্যে সম্ভবতঃ এই প্রকারেরই প্রবাহ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই প্রবাহ পৃথিবীর তাপক্ষয়ের বিশেষ সহায় হইত এবং আকাশের স্থান বিশেষে সঞ্চিত গভীর বাষ্পরাশি, অগভীর আকাশের দিকে ছুটাছুটি করিয়াও পৃথিবীর তাপ হরণ করিত।

ভূপৃষ্ঠের দ্রবপদার্থের স্তূপে এবং আকাশের ঘন বাষ্পরাশিতে পূর্ব্বোক্ত প্রবাহ কত কাল চলিয়াছিল, তাহা অনুমান করাও কঠিন, কিন্তু ইহার পরেই যে, অত্যুষ্ণ দ্রবপদার্থের স্থানে স্থানে ভাসমান কঠিন পদার্থ দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। এই সময়কেই পৃথিবীর স্থলসংস্থানের প্রারম্ভ বলিতে হয়। এখন আমাদের মহাসমুদ্রগুলি যেমন জলে আবৃত রহিয়াছে, প্রাচীনকালে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ সেইপ্রকার এক দ্রবপদার্থে আবৃত ছিল বটে, কিন্তু এই দ্রবপদার্থের ঘনতা সকল স্থানে সমান ছিল না। যেখানে অধিক তাপ সেখানে তাহা খুবই তরলাকারে থাকিত, এবং যেখানে অল্প উত্তাপ তথায় উহাই হয় ত জমিয়া দ্বীপের সৃষ্টি করিত।

সূর্য্য বহু দূরে অবস্থান করিয়াও পৃথিবীর উপরে প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না। এখন ধরাপৃষ্ঠ শীতল হইয়া কঠিন মৃত্তিকা ও শিলায় পরিণত হইয়াছে, কাজেই সূর্য্যের টানে ভূপৃষ্ঠের কোন প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, কিন্তু সমুদ্র-জলের উপরে ঐ টানের প্রভাব প্রতিদিনই দেখা যায়। আধুনিক সমুদ্রের জল টানিয়া সূর্য্য যে-সকল প্রবল জলোচ্ছ্বাস উৎপন্ন করে তাহার শক্তি নিতান্ত অল্প নহে, প্রাচীনকালে যখন দ্রবধাতুময় সমুদ্র ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে আর কিছুই ছিল না, সেই সময়ে সূর্য্যের আকর্ষণ-জনিত জোয়ার-ভাঁটা যে কত প্রবল বেগে চলিত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তখন পৃথিবীর কেন্দ্র স্থানটিও হয় ত সম্পূর্ণ কঠিনাকার প্রাপ্ত হয় নাই, কাজেই সূর্য্যের জোয়ারের টান ভূগর্ভের গভীরতম অংশ পর্য্যন্ত পৌছিত। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র বয়সে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক

ছোট,—আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে ইহা পৃথিবীরই আত্মজ। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবী যখন সদ্য সদ্য তরল পদার্থে পরিণত হইয়াছিল এবং এই তরল পদার্থের উপরে যখন সূর্য্যের আকর্ষণে প্রবল জোয়ার-ভাঁটা চলিতেছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়েই আমাদের চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। সূর্য্যের আকর্ষণই চন্দ্রের জন্মের কারণ। সূর্য্য পৃথিবীকে এখন যে প্রকার বলে টানিয়া সমুদ্রের জলে জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তি করে, তখনও উহা হয় ত ঠিক সেই প্রকার বলেই টানিত, কিন্তু তখনকার টান্ তরল পৃথিবীকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিত এবং এই টানে পড়িয়াই পৃথিবীর এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিয়াছিল। জ্যোতিষিগণ অনুমান করেন, চন্দ্রের জন্মকালে পৃথিবী তাহার ভ্রমণ-পথের সহিত এগারো বা বারো ডিগ্রি পরিমিত হেলিয়া দুই বা তিন ঘণ্টায় এক একবার পূর্ণাবর্ত্তন (Rotation) শেষ করিত। চন্দ্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক মতবাদ জ্যোতিষিক গ্রন্থে দেখা যায়, কিন্তু আজ এই সিদ্ধান্তটির উপরে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন।

উষ্ণ দ্রবপদার্থের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহা অনেক বায়বীয় পদার্থ শোষণ করিয়া রাখিতে পারে। যে উপাদানে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা যথেষ্ট উষ্ণ ছিল, তা'ছাড়া প্রতি বর্গইঞ্চি স্থানে ৬২ মণ পরিমিত চাপ পড়ায় তাহার অন্তর্নিহিত বাষ্পের পরিমাণ আরো বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই অবস্থায় যখন উহা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে উপনীত হইয়াছিল, তখন ঐ বাষ্পরাশি আর আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই; চাপমুক্ত হইয়া চন্দ্রদেহ হইতে বাহির হইবার জন্য তাহার এক স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলেন, চন্দ্রের দেহে যে অসংখ্য নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির চিহ্ন দেখা যায়, সেগুলি উক্ত আবদ্ধ বাষ্পেরই কাজ। যখন চন্দ্র

পৃথিবীর দেহাভ্যন্তরে ছিল, তখন পৃথিবীর আকাশের প্রবল চাপ ঐ বাষ্পকণিকাকে বাহির হইতে দেয় নাই ; কিন্তু যখনই উহা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চাপমুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতেই বাহির হইবার জন্য যেন উহাতে নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছিল। জমাট চন্দ্রদেহের আবরণ ভেদ করিয়া ঐ আবদ্ধ বাষ্পরাশি বাহির হইবার সময়ে যে সকল বৃহৎ গহ্বর রচনা করিয়াছিল, তাহাদিগকেই আমরা এখন দূর হইতে আগ্নেয়গিরির আকারে দেখিতেছি। কোন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ বারুদে আগুন দিলে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা পাত্রটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বহির্গত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের দুই চারিখানি ভগ্ন অংশও বহিয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। পণ্ডিতগণ বলেন, চন্দ্র-দেহের আবদ্ধ বাষ্প যখন সবেগে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের দেহের টুক্‌রা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল। এই টুক্‌রাগুলিই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের আকারে বহুদিন আকাশে ঘুরিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের সীমায় আসিলে এখন উল্কাপিণ্ডের আকারে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। অনেক উল্কাপিণ্ডই আমাদের আকাশের বায়ুর ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে, বায়ুর ঘর্ষণজ তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, এবং যেগুলি খুব বড় সেগুলিরই দগ্ধাবশেষ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এই সকল উল্কার গঠনোপাদান পরীক্ষা করিলে আমাদের পৃথিবীর শিলামৃত্তিকার সকল উপাদানগুলিই তাহাতে একে একে ধরা পড়িয়া যায়। উল্কাপিণ্ডগুলি এখন স্বাধীন জ্যোতিষ্কের আকারে বিচরণ করিলেও দূর অতীত কালে উহা যে, পৃথিবীর আত্মজ চন্দ্রেরই কুক্ষিগত ছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির কথা স্মরণ করিয়া অনেকেই ইহা স্বীকার করিতেছেন।

যাহা হউক চন্দ্রের জন্ম সময়ে পৃথিবীর যে এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াই দূরে গমন করে

নাই; পৃথিবী হইতে এখন চন্দ্রের যে দূরত্ব দেখিতেছি, তাহা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময়ে হইয়াছে। অতি নিকটে থাকিয়া চন্দ্র পৃথিবীর উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, এবং সেসম্বন্ধে কোন অনুমান করাও চলে না। ক্রমে দূরবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র যখন পৃথিবী হইতে ছত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ের অবস্থার কথা পণ্ডিতগণ অনুমান করিতে পারেন। এই ব্যবধানে যাইতে কত সময় লাগিয়াছিল তাহাও গণনা করা যায়। এই প্রকার গণনায় দেখা গিয়াছে, জন্মগ্রহণের পর অন্ততঃ পাঁচ কোটী ষাইট্‌ লক্ষ বৎসর অতিবাহন না করিয়া চন্দ্র কখনই পৃথিবী হইতে ছত্রিশ হাজার মাইল দূরে যাইতে পারে নাই।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি আছে, ইহা লইয়া আধুনিক ও প্রাচীন পণ্ডিতমহলে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন, আমরা ভূপৃষ্ঠে যে শিলামৃত্তিকা দেখিতেছি, তাহা ভূগর্ভের কেবল চারিশত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তাহার নীচে আকেন্দ্র সমস্ত স্থানই লৌহপ্রধান গুরুপদার্থে পূর্ণ। শিলামৃত্তিকাদি গড়ে জল অপেক্ষা তিন গুণ অধিক ভারি, কিন্তু গভীর-তর প্রদেশের সেই ধাতুজ দ্রব্যের গুরুত্ব জল অপেক্ষা প্রায় আট গুণ অধিক। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন পৃথিবীর ধাতুজ অংশটা বোধ হয় ভূ-কেন্দ্রে কঠিনাবস্থাতেই ছিল; কেবল ভূপৃষ্ঠের শিলামৃত্তিকারই উপাদান দ্রব ও বায়ব আকারে পৃথিবীকে ঘেরিয়া অবস্থান করিতেছিল। কাজেই চন্দ্র তাহার নিজের দেহখানি পৃথিবীর শিলামৃত্তিকা দিয়াই প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিল; ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে যে ধাতব দ্রব্য ছিল তাহা নিজের দৈহিক পুষ্টির জন্য স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, চন্দ্রের জন্মের কিছুকাল পরেই

পৃথিবী আমূল কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ কখনই সেণ্টিগ্রেডের এগারো শত সত্তর ডিগ্রির কম ছিল না, কাজেই সে সময়ে আকাশ এখনকার মত নির্ম্মল হইতে পারে নাই; প্রাথমিক বাষ্পের অবশেষ এবং জলীয়-বাষ্প আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। পৃথিবীকে আমরা এখন যে আকারে দেখিতে পাইতেছি, তাহা এই সময়েই একে একে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়টি লইয়া দীর্ঘ গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই অবস্থাটি আজ হইতে অন্ততঃ তুই কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে দেখা দিয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ কঠিনাকার প্রাপ্ত হইলেও তখন উহার উপরের কিছু দূর কর্দ্দমবৎ কোমল ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কাজেই ভূপৃষ্ঠের যে অংশে আকাশের চাপ অধিক পড়িত তাহা তখন নীচু হইয়া যাইত এবং যে-সকল স্থানের উপরে চাপ অল্প ছিল তাহা উঁচু হইত। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত পাহাড়পর্ব্বতে এবং নদীসমুদ্রে এখন যে উঁচুনীচু ভাবটা সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পৃথিবীর এই সময়টাকেই তাহার আরম্ভ বলা যাইতে পারে।

পৃথিবী নিজের দেহের তাপ বর্জ্জন করিতে করিতে যখন ৩৭০° ডিগ্রি পরিমিত উষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভূপৃষ্ঠের আর একটি বিশেষত্ব দেখা দিয়াছিল। আকাশের জলীয় বাষ্পরাশি তাপাধিক্য-প্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত জমাট বাঁধিতে পারে নাই, কাজেই ভূ-পৃষ্ঠে বিন্দু-প্রমাণ জলেরও অস্তিত্ব ছিল না। এই সময়ে উত্তাপ ৩৭০° ডিগ্রিতে নামিয়া পড়ায়, আকাশের জলীয় বাষ্পরাশি অত্যুষ্ণ বৃষ্টির ধারাকারে ভূতলে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তাহাই নিম্নভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আধুনিক সমুদ্রের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল।

ভূপৃষ্ঠের অগভীর প্রাথমিক সমুদ্রগুলি কিপ্রকারে গভীরতর হইয়া

বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেসম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা এগুলির মধ্যে কেবল একটিমাত্রের উল্লেখ করিব। ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে জড়ের একটি সুপরিচিত ধর্ম্মের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা পৃথিবীতে যত সামগ্রী দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ পাইলে দ্রব হয়। লৌহকে অল্প তাপ দিতে থাক, তাহা গলিবে না, কিন্তু প্রযুক্ত তাপের মাত্রা ১১৫০° ডিগ্রিতে উঠিলেই উহা গলিতে আরম্ভ করিবে। কেবল লৌহ নয়, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র শিলা মৃত্তিকা সকল বস্তু ঐ লৌহের ন্যায়ই এক একটি নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় গলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই প্রকারে দ্রব হওয়ার সহিত বাহিরের চাপের একটা অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। যে-পাত্রে ধাতুকে গালানো যাইতেছে, তাহার ভিতরে যদি কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সাধারণ বায়ুর চাপে উহা যে উষ্ণতায় গলিয়া যাইত, এখন আর সে উষ্ণতায় গলিবে না। উষ্ণতা অধিক লাগিবে। জড়ের এই সুপরিচিত ধর্ম্মটির কথা মনে রাখিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ভূ-গর্ভের কেন্দ্রসন্নিহিত স্থান খুব উষ্ণ হইলেও তথাকার ধাতু-মৃত্তিকা দ্রবাবস্থায় নাই; উপরিস্থিত চারি হাজার মাইল গভীর শিলা মৃত্তিকার স্তরগুলি কেন্দ্র-সন্নিহিত পদার্থে যে চাপ-প্রয়োগ করিতেছে তাহা অতিক্রম করিয়া লৌহ প্রভৃতি ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে পারে এমন উত্তাপ পৃথিবীর কেন্দ্রে নাই। কাজেই যদি কেহ বলেন, ভূ-পৃষ্ঠে এক শত বা দুই শত মাইল নীচেকার পদার্থ গলিতাবস্থায় আছে, তাহা বিশ্বাস করা যায়। কারণ সেখানে তাপের তুলনায় চাপ অল্প। কিন্তু যদি কেহ বলিয়া ফেলেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্র-প্রদেশ কেবল দ্রব ধাতুতেই পূর্ণ, তবে তাহা কোন ক্রমে বিশ্বাস করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক-

গণ সমুদ্রের ক্রমিক প্রসারতালাভের যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, এখন তাহা আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্রেরই গভীরতা আমাদের জানা আছে, সুতরাং সমগ্র সমুদ্রের জলের পরিমাণও হিসাব করা যায়। এই হিসাবে সমুদ্রের গড় গভীরতা দুই মাইল সাত শত গজের কিঞ্চিৎ কম হয়। পৃথিবীর জল, নদী ও সমুদ্রের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যদি সমভাবে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত থাকিত, তাহা হইলে জলের গভীরতা কত হইত তাহাও হিসাব করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে, সমুদ্রের জল ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িলে জলের গভীরতা এক মাইল বারো শত গজের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, সমুদ্রের জল যখন বাষ্পাকারে আকাশে ভাসমান ছিল তখন উহা এক মাইল বারো শত গজ উচ্চ জলের চাপের অনুরূপ বলে ভূপৃষ্ঠকে চাপিয়া রাখিত। এখন মনে করা যাউক, যেন এক দিন হঠাৎ আকাশের সমগ্র জলীয় বাষ্প জমিয়া ভূপৃষ্ঠের নিম্ন ভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে স্থলভাগের উপরকার চাপই কমিয়া আসিবে, এবং নিম্ন ভূমির যে-সকল অংশে জল সঞ্চিত হইল তাহার উপরকার চাপ বাড়িয়া যাইবে। সমুদ্রের উৎপত্তির পরে, এই প্রকারে স্থলভাগের উপরকার চাপ বৃদ্ধি হওয়াকে অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতগণ সমুদ্রের ক্রমিক প্রসারের ব্যাখ্যান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, স্থলভাগে যখন জলীয় বাষ্পের চাপ ছিল, তখন প্রচুর উষ্ণ থাকা সত্ত্বেও ভূগর্ভের অনেক দূর কঠিনাবস্থায় ছিল, কারণ চাপের আধিক্য থাকিলে কোন জিনিষ সহজে গলিতে চায় না। কিন্তু জলের উৎপত্তির সহিত এই চাপ অন্তর্হিত হইবামাত্র স্থলভাগের নিম্ন স্তরগুলি আর কঠিনাকারে থাকিতে পারে নাই। ভূগর্ভস্থ

তাপ এই অবস্থায় পূর্ব্বের কঠিন শিলা মৃত্তিকাগুলিকে গলাইয়া স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল; কাজেই জলাচ্ছাদিত অংশ অপেক্ষা জলবর্জ্জিত স্থলভাগটাই উচ্চ হইয়া সমুদ্রকেই তুলনায় গভীরতর করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি কেবল অনুমানমূলক নহে। চাপ প্রয়োগ করিয়া কোন অত্যুষ্ণ জিনিষকে গলিতে না দিয়া, চাপের বা তাপের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি করিতে থাকিলে তাহাতে যে, আকুঞ্চন-প্রসারণ দেখা যায়, নানা পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অঙ্গারক বাষ্পকে শীতল করিলে তাহা তরলাকার প্রাপ্ত হয়। এই তরল অঙ্গারক-বাষ্পের ১২০ ঘন ইঞ্চি লইয়া ৩০° ডিগ্রি উত্তাপ দিলেই তাহা ১৫০ ঘন ইঞ্চি হইয়া দাঁড়ায়, অথচ জিনিষটা তরলাবস্থাতেই থাকে। এই সকল প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়, শিশু পৃথিবীতে উচ্চ-নিম্ন ভূমির উৎপত্তি এবং জলস্থলের সংস্থান-সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা একবারে অযৌক্তিক নয়।

ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যবিধানে রাসায়নিক কার্য্যের প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। বায়ু ও জলের প্রবাহ প্রভৃতি শক্তি ভূতলের মূর্ত্তি ফিরাইয়া দেয় সত্য, কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ যে-সকল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর শৈশবের শেষ ভাগে অপরাপর শক্তির সহিত রাসায়নিক শক্তিও কার্য্য করিয়াছিল। ভূতলে যখন প্রাথমিক সমুদ্রগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন সমুদ্র-জল কখনই এখনকার জলের ন্যায় শীতল ছিল না। ইহার উষ্ণতা নিশ্চয়ই এখনকার ফুটন্ত জলের উষ্ণতা অপেক্ষাও অধিক ছিল। ভূপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধ স্তরগুলি যে-সকল উপাদানে গঠিত, তাহার সহিত

গরম জল প্রবল রাসায়নিক কার্য্য সুরু করিয়া থাকে ; কাজেই সমুদ্রের উৎপত্তি হইবামাত্র ভূপৃষ্ঠে রাসায়নিক শক্তি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। সমুদ্রতলের গভীর প্রদেশে যে নানা রাসায়নিক পদার্থের স্তর দেখা যায়, তাহা ঐ কার্য্যেরই চিহ্ন।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর শৈশব-ইতিবৃত্ত যতটুকু সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা মোটামুটিভাবে লিপিবদ্ধ হইল। ইহার পরে স্তরবিন্যাস প্রভৃতিতে পৃথিবীর যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে যে হরণ-পূরণ চলিয়াছিল, তাহার ধারা আজও লোপ পায় নাই। এই পরিবর্ত্তনের ধারা কি প্রকারে শিশু পৃথিবীকে যৌবনে উপনীত করিয়া শেষে প্রৌঢ়ত্ব প্রদান করিয়াছে, তাহা আমরা পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

মঙ্গলগ্রহ

মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্যোতিষিগণ ইঁহাকে অনেকদিন হইতে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে গ্রহটির গতিবিধি ও প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। গত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। নানা দেশের শত শত জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ সাহায্যে মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার পর সে প্রকার সুযোগ বহুকাল পাওয়া যায় নাই। আজ কয়েক মাস হইল, আবার সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। দেশবিদেশের জ্যোতিষিগণ সেই দুর্লভ সময়ে বড় বড় দূরবীক্ষণ দ্বারা আবার নূতন করিয়া মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে যে-সকল যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল, এই ১৬ বৎসরে তাহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে; সুতরাং এই সকল উন্নত যন্ত্রাদি-সাহায্যে যে পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছে, তাহা দ্বারা মঙ্গললোকের অনেক নূতন খবর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, প্রত্যেক গ্রহ এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট বড় সকল গ্রহই সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রহগণের ভ্রমণপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়। এককেন্দ্র (Concentric) বৃত্তদ্বয়ের পরিধির মধ্যেকার ব্যবধান যেমন অপরিবর্ত্তিত থাকে, পথগুলি বৃত্তাকার হইলে প্রত্যেক দুই

গ্রহের ভ্রমণপথের মধ্যেকার ব্যবধানকেও ঠিক সেই প্রকার অপরিবর্ত্তিত দেখা যাইত। গ্রহমাত্রেই এক একটি বৃত্তাভাস, অর্থাৎ ডিম্বাকার (Elliptical) পথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সূর্য্য সেই বৃত্তাভাস ক্ষেত্রেরই একটি অধিশ্রয় (Focus) অবলম্বন করিয়া স্থির থাকে। কাজেই পরিভ্রমণপথগুলির পরস্পর ব্যবধান কখনই এক দেখা যায় না। মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবী সূর্য্যের নিকটতর। এজন্য পৃথিবী যে বৃত্তাভাসপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা মঙ্গলের পথের ভিতরে থাকিয়া যায়। তা'ছাড়া পথ দুইটির অবস্থান এরূপ বিচিত্র যে, যখন মঙ্গল সূর্য্যের নিকটতম স্থান অধিকার করে, তখন পৃথিবী সূর্য্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে।

পৃথিবীর ভ্রমণপথ মঙ্গলের ভ্রমণপথের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, মঙ্গলের পথের তুলনায় পৃথিবীর পথ কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে, এবং তা'র উপর আবার পৃথিবীর পরিভ্রমণ-বেগ মঙ্গলের বেগের তুলনায় কিঞ্চিৎ দ্রুততর। এই সকল কারণে পৃথিবী যে সময়ে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, মঙ্গলের পূর্ণ প্রদক্ষিণ সে সময়ে শেষ হয় না। কাজেই নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা সাক্ষাৎ করা প্রতি বৎসর ইহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গল ও পৃথিবী তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় দুই বৎসরে এক একবার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী ও মঙ্গলের ভ্রমণপথের ব্যবধান সকল স্থানে সমান নয়; সুতরাং উভয়ের মিলনকালে ব্যবধানটা যদি খুব ছোট না হয়, তবে পর্য্যবেক্ষণের অত্যন্ত অসুবিধা আসিয়া পড়ে। গ্রহদ্বয়ের ভ্রমণপথের যে দুইটি স্থানের দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, ১৮৯২ সালে এবং গত বৎসরে মঙ্গল ও পৃথিবী সেইস্থানে আসিয়া মিলিয়াছিল। জ্যোতিষিগণ এই দুই বৎসরে মঙ্গললোকের অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ভ্রমণপথ যে সমতলে অবস্থিত, পৃথিবী তাহার উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া চলা-ফেরা করে না। ইহার অক্ষরেখা (Axis) সেই সমতলের সহিত প্রায় ২৩° অংশ পরিমিত কোণ করিয়া হেলিয়া রহিয়াছে। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অক্ষরেখার এই বক্রতাই ভূপৃষ্ঠের শীতগ্রীষ্মাদি নানা ঋতুকে ডাকিয়া আনে। মঙ্গল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার অক্ষরেখা পরীক্ষা করিয়া, তাহাতেও ঠিক ঐ পরিমাণ বক্রতা দেখা গিয়াছে, এবং মাঙ্গলিক দিন ও পার্থিব দিনের মধ্যেও একতা ধরা পড়িয়াছে। হিসাব করিলে দেখা যায়, মাঙ্গলিক দিন পার্থিব দিন অপেক্ষা চল্লিশ মিনিটের অধিক দীর্ঘ নয়; সুতরাং শীত-গ্রীষ্মাদি নানা ঋতু যে, কেবল পৃথিবীতেই বিরাজ করিতেছে, এখন আর সে কথা বলা যায় না। মঙ্গললোকেও ষড়্‌ঋতু নিয়মিতভাবে যাওয়া-আসা করে।

পৃথিবীর সহিত মঙ্গলগ্রহের ইহাই একমাত্র ঐক্য নয়। পুনঃপুনঃ মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয়ের মধ্যে আরো অনেক একতা দেখা গিয়াছে। মঙ্গলের ব্যাস ৪২০০ মাইল। কাজেই আয়তনে মঙ্গল, পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, এবং গুরুত্বেও অনেক লঘু। হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবী তাহার পৃষ্ঠস্থ বস্তুগুলিকে যে বলে টানে, মঙ্গল তাহার পাঁচভাগের দুইভাগ মাত্র বলে টানিতে পারে। এক মণ পঁইত্রিশ সের ওজনের মানুষ পৃথিবী হইতে সহসা মঙ্গললোকে নীত হইলে, সেখানে তাহার ওজন আধমণের অধিক হইবে না; সুতরাং পার্থিব মানব মঙ্গললোকে গিয়া মৃত্তিকা হইতে বহু উর্দ্ধে লাফাইতে পারিবে, এবং তাহার হস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পৃথিবীর তুলনায় আড়াইগুণ উচ্চে উঠিয়া, ধীরে ধীরে নামিয়া মাটিতে পড়িবে।

গ্রহের লঘুতা তাহার উপরিস্থিত পদার্থগুলিকে লঘু করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। লঘুতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকর্ষণের পরিমাণ কমিয়া

আসে বলিয়া, সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গ্রহাদির গুরুত্বের তুলনায় সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি বৃহৎ জ্যোতিষ্কগুলির গুরুত্ব অনেক অধিক; সুতরাং ইহাদের আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই শ্রেণীর বড় জ্যোতিষ্কগুলি হাইড্রোজেন, হেলিয়ম্ প্রভৃতি অতি লঘু বাষ্পগুলিকেও তাহাদের আকাশ হইতে যাইতে দেয় নাই। নক্ষত্রদিগের আকাশ সর্ব্বদাই লঘু-গুরু নানাজাতীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে। পৃথিবীর গুরুত্ব মঙ্গলের তুলনায় অধিক হইলেও, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির তুলনায় অতি অল্প। কাজেই পৃথিবী তাহার দুর্ব্বল আকর্ষণে হাইড্রোজেন, হেলিয়ম্ প্রভৃতি লঘু-বাষ্পগুলিকে আকাশে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এগুলি বহুকাল পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া মহাকাশে চলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গুরুতর বাষ্পগুলিই আমাদের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রের গুরুত্ব ও আয়তন উভয়ই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক অল্প। এইজন্য ইহার আকাশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ন্যায় গুরু বাষ্পকেও চন্দ্র টানিয়া রাখিতে পারে নাই। কাজেই চন্দ্রের দেশে আকাশ এক-প্রকার শূন্য হইয়াই রহিয়াছে। চন্দ্রগর্ভ হইতে যে জলীয় ও অঙ্গারক বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই ক্ষণকালের জন্য আকাশে বিচরণ করিয়া ক্রমে চিরকালের জন্য মহাকাশে অন্তর্হিত হইয়া যায়। মঙ্গলের গুরুত্ব, চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত অল্প নয়; সুতরাং ইহাতে নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের ন্যায় গুরু বাষ্প থাকারই সম্ভাবনা অধিক।

মঙ্গলপৃষ্ঠে যে জলীয় বাষ্প আছে, গত ১৮৯২ সাল এবং তৎপূর্ব্বকার পর্য্যবেক্ষণে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মেরু-সন্নিহিত প্রদেশ যেমন শীতকালে বরফে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, মঙ্গলগ্রহে শীতকাল উপস্থিত হইলে, তাহার মেরুপ্রদেশকেও ঠিক সেই প্রকারে

তুষারাচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীরই মত সেই মাঙ্গলিক তুষাররাশি গলিয়া মেরুপ্রদেশের শুভ্রতা নষ্ট করিয়া ফেলে।

মেরুপ্রদেশের পূর্ব্বোক্ত শুভ্রমুকুটকে কয়েকজন পণ্ডিত কঠিন অঙ্গারক-বাষ্প বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের প্রধান-জ্যোতিষী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিঙ্ সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন,—যতই শীতল করা যাউক না কেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের অন্ততঃ পাঁচগুণ চাপ না পাইলে অঙ্গারক বাষ্প জমাট বাঁধিতে পারে না; কিন্তু মঙ্গলের আকাশের চাপ ভূ-বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম; সুতরাং জলীয় বাষ্পই যে জমাট বাঁধিয়া মঙ্গলে শ্বেতমুকুটের রচনা করে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু পৃথিবীর মত মঙ্গলে প্রচুর জল নাই, এবং মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও পৃথিবীর সমুদ্রের ন্যায় গভীর নয়। পৃথিবীর জলাভূমিগুলি যেমন অগভীর, মাঙ্গলিক সমুদ্রগুলিও প্রায় তদ্রূপ। শীতের পর বসন্ত উপস্থিত হইলে মেরুপ্রদেশের তুষাররাশি গলিয়া এই নিম্ন ভূমি-গুলিকে জলপ্লাবিত করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলের তুলনায় পৃথিবীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কাজেই ইহার আকর্ষণের পরিমাণও মঙ্গল অপেক্ষা অনেক অধিক। এই আকর্ষণে পৃথিবী খুব লঘু বাষ্পগুলিকে টানিয়া রাখিতে পারে নাই বটে, কিন্তু জলীয় বাষ্পকে সে সহজে ছাড়িতেছে না। এই কারণে ইহা নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা ভূপৃষ্ঠে ও আকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু মঙ্গল তাহার দুর্ব্বল টানে জলীয় বাষ্পকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। কাজেই এই বাষ্পগুলি ধীরে ধীরে গ্রহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। পিকারিঙ্ সাহেব বলিতেছেন, গ্রহের গর্ভ হইতে যে-সকল জলীয় বাষ্প সদ্য উত্থিত হইতেছে, তাহা

মঙ্গলগ্রহ

দক্ষিণের চিত্রের উপর তুষারের শুভ্র মুকুট,
বামের চিত্রে মঙ্গলের তুষারপ্লাবন

জমিয়াই মেরুপ্রদেশের তুষারাবরণ উৎপন্ন করে, এবং বসন্তাগমে গলিয়া জল ও বাষ্পাদির আকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সমস্তই গ্রহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় মঙ্গলে জল থাকিলেও, যখন গর্ভস্থ জলভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে, তখন আর একবিন্দু জলও মঙ্গলপৃষ্ঠে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ ত্রিশ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভারকে অনায়াসে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মঙ্গলের আকাশের চাপ সাত ইঞ্চির অধিক উচ্চ পারদকে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ কত তরল বায়ুর মধ্যে থাকিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, বায়ুকে তরল করিতে করিতে যখন তাহার চাপ পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ পারদের ভারের অনুরূপ হয় তখন সেই বায়ু দ্বারা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে না। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় সাত ইঞ্চি পারদের ভারের তুল্য সুতরাং এই বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া, এবং গ্রহপৃষ্ঠস্থ জল ব্যবহার করিয়া, কোন জীবের প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয় ; কিন্তু এইপ্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ঠিক আমাদিগের মত বুদ্ধিমান প্রাণী মঙ্গলগ্রহে জন্মিতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

দূরবীক্ষণসাহায্যে মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহার উপরে কতকগুলি সুবিন্যস্ত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে লইয়া আজ কয়েক বৎসর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এই রেখাগুলি মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বড় বড় খাল ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরফগলা জলকে মেরুপ্রদেশ হইতে দূরদেশে লইয়া আসিবার জন্য মাঙ্গলিক প্রাণিগণ এই খালগুলিকে কাটিয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা কোনক্রমে এগুলিকে স্বাভাবিক খাল

বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। দূরবীক্ষণে এগুলিকে যে প্রকার সরল ও সুবিন্যস্ত দেখা যায়, কোন নদনদীকে স্বাভাবিক অবস্থায় সে প্রকার দেখা যায় না। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহারা বলিতেছেন, মানুষ অপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমান্ কোন প্রাণী নিশ্চয়ই মঙ্গলে বাস করিতেছে, এবং ইহারাই বুদ্ধিকৌশলে ঐসকল বৃহৎ খাল খনন করিয়া গ্রহের সর্ব্বাংশে জল যোগাইতেছে।

মঙ্গলে খালের রেখা

মঙ্গলগোলকস্থ কৃষ্ণরেখাগুলি যে সত্যই জলপ্রণালী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে, ঐ রেখাগুলিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলেন,—ববফের জলে খালগুলি পূর্ণ হইলে, তাহার উভয় তীরের সিক্ত মৃত্তিকায় যে-সকল উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহাই খালগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেয়।

আর একদল পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, মাঙ্গলিক খালের ন্যায় সুবিন্যস্ত ছোট ছোট খাল চন্দ্রমণ্ডলের স্থানে স্থানে দেখা যায়। চন্দ্র যে সম্পূর্ণ নির্জ্জীব, তাহাতে আর এখন মতদ্বৈধ নাই; সুতরাং যে প্রাকৃতিক শক্তিতে চন্দ্রে খালের উৎপত্তি হইয়াছে, মঙ্গলের খালগুলি সেই শক্তি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা অযৌক্তিক নয়। তা'ছাড়া মঙ্গলের যে-সকল অংশকে জ্যোতিষিগণ সমুদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক খালকে সেই সকল সমুদ্রের উপরেই অবস্থিত দেখা যায়; সুতরাং জল-চালনাই যদি খাল-

খননের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ সকল খালের কোনই সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে মাঙ্গলিক জীব সমুদ্রগর্ভে খাল খনন করিতে পারে, তাহাকে কখনই সুবুদ্ধি প্রাণী বলা যাইতে পারে না।

মঙ্গলগ্রহ, বুদ্ধিমান্ প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া যে তর্ককোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আজও নিবৃত্তি হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্‌মাত্রেই কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রশ্নটির মীমাংসাচেষ্টায় যে-সকল তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে মঙ্গলসম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তথাপি এখনো এসম্বন্ধে অনেক জানিতে বাকি। এগুলি নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত না হইলে, মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সিয়াপারেলি (Schiaparelly) সাহেব বহুপূর্ব্বে মঙ্গলে যে-সকল রেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন, গত ১৮৯২ সালের পর্য্যবেক্ষণে সেগুলিকে দেখা যায় নাই; কিন্তু ১৯০৩ সালের পর্য্যবেক্ষণে সেগুলি আবার যথাস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। মঙ্গলগ্রহের এইপ্রকার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যানই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মধ্যে মধ্যে মঙ্গলগ্রহ এক একবার পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানের সুযোগ উপস্থিত করিবে। দেশ-বিদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন; সুতরাং আশা করা যাইতে পারে, এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ হইতে রহস্য-যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বনাথের সৃষ্টিমহিমাকে আরো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইব।

নূতন নীহারিকাবাদ

সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া যে, গ্রহগণ নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা অতি প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের জানা ছিল। কিন্তু ইহারা গ্রহের ভ্রমণপথগুলিকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার বলিয়া মনে করিতেন। পথ ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ না হইয়া কেন বৃত্তাকার হইল, জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা
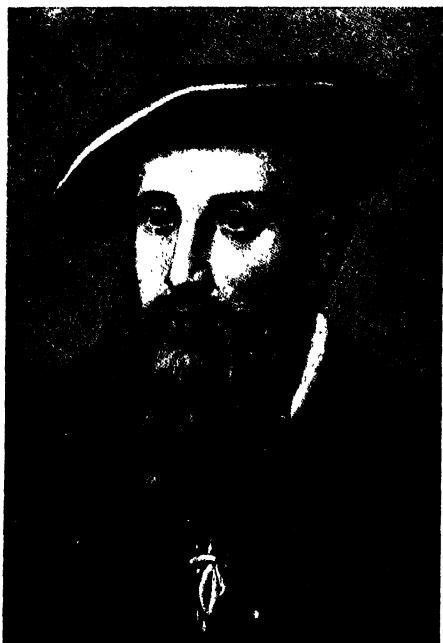
জর্ম্মান্ জ্যোতিষী কেপ্‌লার

বলিতেন, সমস্ত জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এক বৃত্তেরই গঠনে সর্ব্বাঙ্গীণ সুশৃঙ্খলা বর্ত্তমান। এ জন্যই ভগবান গ্রহদিগকে বৃত্তাকার

ছয় শত লক্ষ মাইল নীহারিকারাশি হইতে সূর্য্য পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ উপগ্রহের জন্ম

পথে ঘুরাইয়া থাকেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই ঔপন্যাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে দিন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ কেপ্লার (Kepler) গ্রহদিগকে বৃত্তাভাস (Elliptical) পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনই নব্য জ্যোতিষের জন্মদিন। কেপ্লার সাহেব এই নূতন তথ্যটি কেবল সংগ্রহ করিয়াই গিয়াছিলেন; বৃত্তাভাস পথের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কোন নূতন কথা তাঁহার নিকট হইতে শুনা যায় নাই। প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রায় শত বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল; গত ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত লাপ্লাস্ সাহেব জগৎ-উৎপত্তির একটা ব্যাখ্যান দিয়া বিষয়টির মীমাংসা করিয়াছিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহোপগ্রহের উপাদান এককালে জ্বলন্ত নীহারিকার আকারে আকাশে ঘুরিতেছিল বলিয়া ইহার বিশ্বাস হইয়াছিল, এবং কালক্রমে উহাই জমাট বাঁধিয়া এই জগতের উৎপত্তি করিয়াছে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। দ্রব জিনিষ কঠিন হইয়া গেলে, একটিমাত্র জমাট পিণ্ড পাওয়া যায়। একই নীহারিকা জমাট বাঁধিয়া কি প্রকারে বহু জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি করিল জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, সেই বিশাল নীহারিকা কঠিন হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময়, উহার দেহের কিয়দংশ মাঝে মাঝে বলয়াকারে রাখিয়া গিয়াছিল। এখন সেইগুলিই পুঞ্জীভূত হইয়া মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে। উপগ্রহের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেও লাপ্লাস্ সাহেব ঐ ব্যাখ্যান দিতেন। গ্রহগণ যে-সকল বলয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সামগ্রীগুলি একত্র হইয়া পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে, ইহাদেরও চারিদিকে ছোট ছোট বলয়ের উৎপত্তি হইত। আমাদের চন্দ্র এবং বৃহস্পতি শনি ও মঙ্গলের উপগ্রহগুলি সেই সকল বলয়েরই জমাট মূর্ত্তি।

যাহা হউক ঘূর্ণ্যমান বৃহৎ নীহারিকা হইতে বিচ্যুত হইয়াই যে,

এই গ্রহ উপগ্রহাদির সৃষ্টি হইয়াছে গত এক শত বৎসর ধরিয়া তাহা অবিসম্বাদে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যকে সেই নীহারিকাস্তূপের মূল অংশ এবং গ্রহউপগ্রহাদিকে তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া সকলেই মানিতেছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক সি, (J. J. See) সৃষ্টি-তত্ত্বের এই প্রাচীন সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। সি, সাহেব আমেরিকার একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী এবং নানা জ্যোতিষিক গবেষণায় তাঁহার নাম এখন জগদ্বিখ্যাত। বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রগুলির পাতায় পাতায় আজকাল যে-সকল নব সিদ্ধান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সি সাহেবের কথাগুলিকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ইহার প্রত্যেক উক্তিই গাণিতিক প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তা' ছাড়া দীর্ঘকাল আকাশ-পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত নব সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে। এই সকল কারণে হঠাৎ ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলিতেছে না। দেশবিদেশের জ্যোতিষিমহলে আজকাল ইহার খুবই আলোচনা চলিতেছে।

শিশু সূর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া যে, এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে এ কথাটা সি, সাহেব প্রথমেই অস্বীকার করিয়াছেন। প্রথম কালের এক বিশাল নীহারিকাস্তূপের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া ইনি বলিতেছেন, সেই নীহারিকারই নানা অংশ জমাট বাঁধিয়া বৃহস্পতি শনি, প্রভৃতি গ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে। এই সকল জমাট অংশগুলির মধ্যে সূর্য্যেরই গুরুত্ব ও আয়তন বৃহৎ ছিল, কাজেই নিজের প্রবলতর আকর্ষণে সে দূরবর্ত্তী সকল গ্রহকেই টানিয়া নিকটে আনিয়াছে। উপগ্রহের উৎপত্তিপ্রসঙ্গেও তিনি এই কথা বলিতেছেন। আমাদের চন্দ্র এবং শনি বা বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি কখনই মূলগ্রহের অঙ্গীভূত ছিল না। আকর্ষণের সীমার মধ্যে জমাট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল
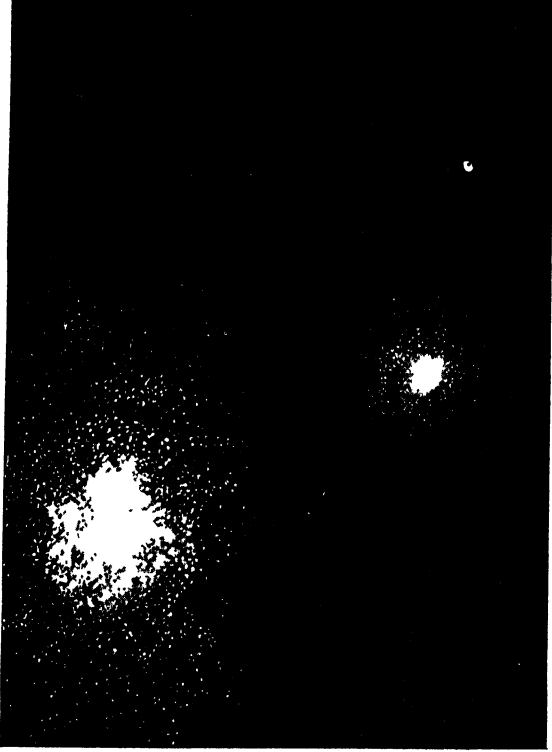
হাব্‌কিউলিস্‌ রাশির বিখ্যাত নক্ষত্রপুঞ্জ

বলিয়াই এগুলি গ্রহদিগের নিকট ধরা দিয়াছে। আকর্ষণের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইবার সামর্থ্য এখন ইহাদের কাহারো নাই।

পূর্ব্বের কথাগুলি হইতে বুঝা যায়, সিদ্ধান্তটি প্রচলিত নীহারিকা-বাদেরই এক নূতন সংস্করণ। প্রচলিত সিদ্ধান্তে আমরা এক ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার অস্তিত্ব মানিয়া থাকি, এবং তা'র পর আবর্ত্তনের চাপে উহার সীমান্তবর্ত্তী কতক অংশ বিচ্যুত হইয়া পড়ে বলিয়া স্বীকার করি। সি. সাহেব এইগুলিই মানিতে চাহিতেছেন না; ইনি বলিতেছেন, প্রাথমিক নীহারিকায় আবর্ত্তনের চাপ ছিল না। চিনির রসে দানা বাঁধিতে সুরু হইলে রসভাণ্ডের স্থানে স্থানে যেমন আপনা হইতেই দানা বাঁধা সুরু হয়, কতকটা সেই প্রকারে নীহারিকার গ্রহগুলি জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে ধূমকেতুর এক নূতন জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়াছে। সি. সাহেব বলিতেছেন, এই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগুলি প্রাথমিক নীহারিকারই সীমান্ত প্রদেশে জন্মিয়াছিল; বোধ হয় নীহারিকার ভিতরকার অংশটা গ্রহোপগ্রহের রচনাতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন সূর্য্যের আকর্ষণে এক একবার জগতের কেন্দ্রের নিকট আসিয়া তাহা আবার সেই সীমান্তবর্ত্তী জন্মস্থানের কাছা-কাছি হইতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে জ্যোতিষিগণ আকাশের নানা অংশে বহু নীহারিকা দেখিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এগুলির উৎপত্তিতত্ত্ব অদ্যাপি জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা বলিতেছেন, শত সূর্য্যোপম নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি ছোটবড় সকল জ্যোতিষ্কই নিজ নিজ দেহ হইতে নিয়তই অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ত্যাগ করিতেছে। এই গুলিই দীর্ঘকাল এলোমেলো ভাবে আকাশে ভাসিয়া শেষে একত্র হইয়া

নীহারিকার উৎপত্তি করে। প্রায় সমগ্র আকাশই যে জ্যোতিষ্ক-দেহচ্যুত ধূলিতে আচ্ছন্ন, তাহা আকাশের ফোটোগ্রাফ্ চিত্রে এখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, জ্যোতিষ্কের দেহই ক্ষয় পাইয়া নীহারিকার উৎপত্তি করে এবং কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া আবার নূতন সৃষ্টির কারণ হয়। জন্মমৃত্যু ও ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপার কেবল আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর ঘটনা নয়। অনন্ত নক্ষত্রলোকেও অনন্তকাল ধরিয়া সেই লীলা চলিতেছে। সর্ব্বত্রই মৃত্যু পুরাতনকে নূতন জীবন দান করিতেছে।

নীহারিকাগুলির অবস্থান পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ইহাদের প্রায় সকলেই ছায়াপথ (Milky Way) হইতে দূরে অবস্থিত। এই ব্যাপারটি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার্ উইলিয়ম্ হার্সেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং পরে তাঁহারই স্বনামখ্যাত পুত্র সার জন্ হার্সেল উহা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে আকাশের অপরাংশ ছাড়িয়া নীহারিকাগুলি ছায়াপথ হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় নাই। অধ্যাপক সি. গত দশ বৎসর জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফল অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে নীহারিকার অবস্থানসম্বন্ধে একটা নূতন তত্ত্ব তাঁহার মনে হইয়াছিল। এখন তাহাই অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, যখন বিকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে তাড়িত হইয়া নক্ষত্রদিগের দেহের কণাই নীহারিকার রচনা করে, তখন সেগুলি যে, নক্ষত্রবহুল ছায়াপথের নিকট পুঞ্জীভূত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি সত্য হইলে ছায়াপথে নক্ষত্রের যে বিন্যাস দেখিয়া হার্সেল্ সাহেব অবাক্ হইয়াছিলেন, তাহার একটা সুব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সি. সাহেব বলিতেছেন, নীহারিকাগুলি ছায়াপথের
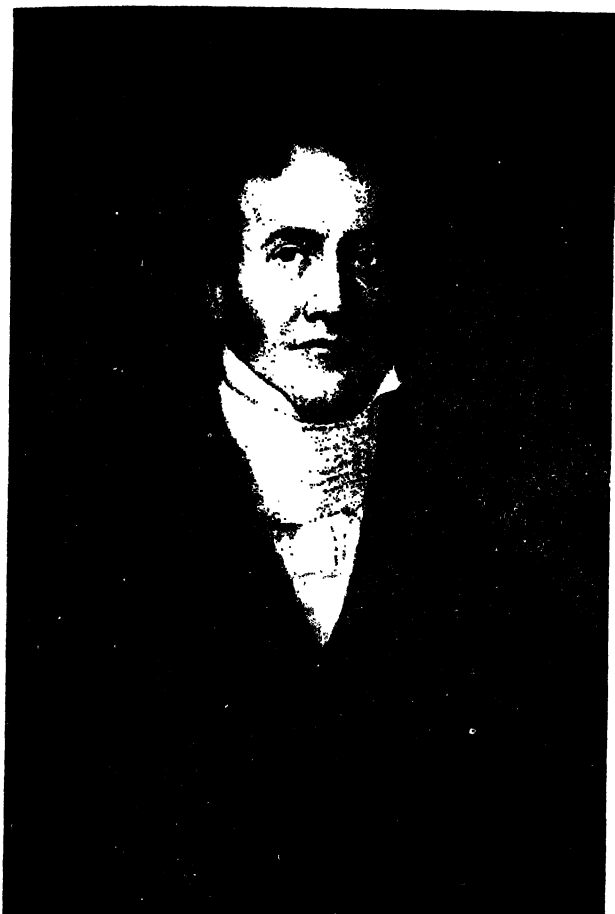
ইংরাজ-জ্যোতিষী সার্ জন হার্সেল্

বাহিরে থাকিয়া যখন কালক্রমে বহুগ্রহবেষ্টিত নক্ষত্রের মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তখন সেই ছায়াপথেরই বৃহৎ নক্ষত্রদিগের টানে উহাদিগকে সাড়া দিতে হয়। কাজেই দূরে জন্মগ্রহণ করিয়াও শেষে তাহাদিগকে ছায়াপথের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে।

কেবল আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূলতত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক সি. এই প্রকারে রহস্যময় নক্ষত্রলোকের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তা' ছাড়া যুগলনক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি সকল জ্যোতিষ্কেরই উৎপত্তিতত্ত্ব এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে জানা যাইতেছে। গোঁজামিলের জন্য অনেক সময় যেমন কতকগুলি অদ্ভুত ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, ইহাতে তাহার প্রয়োজন হয় নাই। জড়ের যে-সকল ধর্ম্ম অতি সুপরিচিত, এবং শত শত পরীক্ষায় যে-গুলির অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, সি. সাহেব কেবল তাহাদেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মানুষের হাতে-গড়া বিধি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রকৃতি নিষ্করুণভাবে সমগ্র বিশ্বকে অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার চিরন্তন নিয়মের অনুগত রাখে। প্রকৃতির অধিকারে খণ্ডরাজ্য নাই, একই ব্যাপক এবং কঠোর নিয়ম চিরদিনই বিশ্বকে শাসন করে। এই কথাটা স্মরণ করিলে, প্রাকৃতিক ব্যাপারের যে-সকল ব্যাখ্যান আমাদের চিরপরিচিত ও পরীক্ষিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা যায়। সি. সাহেবের সিদ্ধান্তে এই গুণটা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার কথাগুলি লইয়া আজকাল এত আলোচনা চলিতেছে।

পরিবর্ত্তনশীল (Variable) নক্ষত্রের কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এই শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা স্থির থাকে না, এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এবং কখন কখন অনিয়মিতভাবে ইহারা হঠাৎ উজ্জ্বল

হইয়া পড়ে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ এই ঘটনার নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলেন। সি. সাহেব বলিতেছেন, জ্যোতিষ্কদিগের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া, যে ধূলিপুঞ্জ মহাকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাই এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার সময় কোন অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যদি ঘন ধূলিপুঞ্জের সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইহার তাপে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। এই প্রকারে আকস্মিক উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকেই আমরা দূর হইতে পরিবর্ত্তনশীল তারকার আকারে দেখি। যে-সকল নক্ষত্র জোড়া জোড়া বা তিন চারিটি করিয়া একত্র অবস্থান করে, তাহাদেরও উজ্জ্বলতার নিয়মিত পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে এই ব্যাখ্যান প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে-গুলিকে আমরা যুগল নক্ষত্র বলি, তাহা সত্যই খুব কাছাকাছি থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট-কালে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং ইহাদের কাহারো কক্ষার মাঝে যদি কোন ধূলিপুঞ্জ আসিয়া দাঁড়ায়, তবে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের শেষে উহাকে ধূলির সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠিতে হয়।

নবীন জ্যোতিঃশাস্ত্রে অদ্যাপি কোন নক্ষত্রের মৃত্যু সংবাদ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোটি কোটি বৎসরজীবী নক্ষত্রগুলি যে, দুই হাজার বৎসরের শিশু পৃথিবীকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইবে, তাহাও আশা করা যায় না। কিন্তু নক্ষত্রের জন্ম বড় দুর্লভ ঘটনা নয়। আকাশের যে সকল স্থান সম্পূর্ণ নক্ষত্রবর্জ্জিত, কখন কখন সেখানে হঠাৎ নূতন নক্ষত্রের প্রজ্বলন দেখা গিয়াছে। এগুলি প্রায়ই কয়েকদিন মাত্র উজ্জ্বলালোক বিতরণ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক অধ্যাপক সি. ইহাদের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, অনুজ্জ্বল বা স্বল্পোজ্জ্বল নক্ষত্র যখন গন্তব্য দিক্ ধরিয়া যাইতে যাইতে সেই ধূলিপুঞ্জ বা অপর কোন অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয় তখন উভয়েই সংঘর্ষণ তাপে জ্বলিয়া উঠে। আমরা দূর হইতে এই বিশাল অগ্নিকাণ্ডকেই নূতন নক্ষত্রের আকারে দেখি।
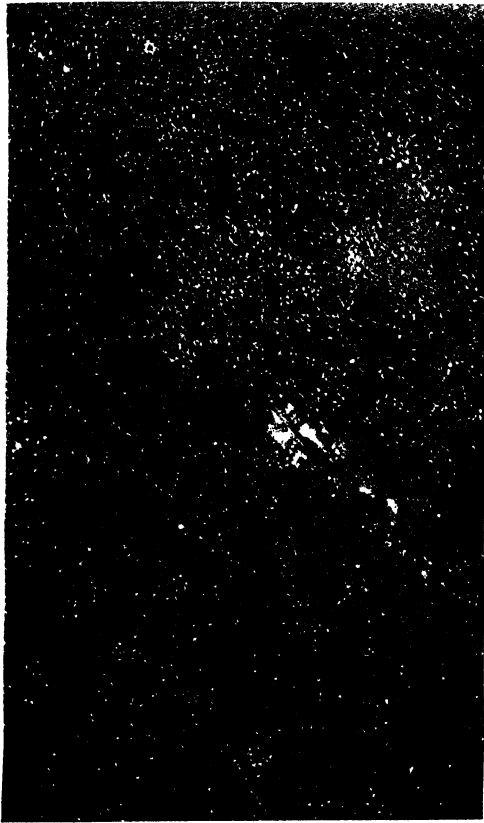
ছায়াপথের এক ক্ষুদ্র অংশের নক্ষত্রপুঞ্জ—২৪৮ পৃঃ

দূরবীক্ষণযন্ত্র দিয়া চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আগ্নেয়গিরির গহ্বরের অনুরূপ কতকগুলি চিহ্ন চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। আধুনিক জ্যোতিষিগণ এগুলিকে নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির বিবর বলিয়াই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। নূতন নীহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সি. সাহেব এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিতেছেন না। ইঁহার মতে সেগুলি উল্কাপাতের চিহ্ন। কাদায় ঢিল ফেলিলে যেমন তাহাতে এক প্রকার চিহ্ন রহিয়া যায়, কোমল চন্দ্রদেহে সেই প্রকার বহু উল্কা পড়িয়া এক সময়ে ঐ চিহ্নগুলি উৎপন্ন করিয়াছিল।

নূতন নীহারিকাবাদের সাহায্যে গ্রহদিগের আবর্ত্তন (Rotation) ও পরিভ্রমণ (Revolution) এই দুইয়েরই সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে, এবং গ্রহদিগের কক্ষ বৃত্তাকার না হইয়া কেন বৃত্তাভাস হইল, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা চলিতেছে। সি. সাহেব এই সকল ব্যাপারে গণিতের প্রমাণ দিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জ্যোতিষিগণ সৌরজগৎকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেন। শনিগ্রহের বাহিরে সৌরপরিবারভুক্ত অপর কোন জ্যোতিষ্ক নাই বলিয়াই ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন্ গ্রহযুগলের আবিষ্কারে সৌরজগতের প্রসার খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সি. সাহেব তাঁহার নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমাদের জগৎকে আরো বৃহৎ বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। নেপ্‌চুন-গ্রহের কক্ষ সূর্য্য হইতে বহু দূরবর্ত্তী থাকিয়াও, আকারে প্রায় বৃত্তের ন্যায় রহিয়াছে। ইনি গণিতের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন, নেপ্‌চুন্ সৌরজগতের সীমান্তবর্ত্তী হইলে ইহার কক্ষ বৃত্তের অনুরূপ না হইয়া সুস্পষ্ট ডিম্বাকৃতি হইত। কাজেই বলিতে হইতেছে, নেপ্‌চুনের বাহিরে এখনো একাধিক বৃহৎ গ্রহ বর্ত্তমান আছে। সূর্য্য

হইতে বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া ইহারা আমাদের অলক্ষ্যে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এ গুলি একদিন ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুনের ন্যায় হঠাৎ ধরা দিবে।

অপর জ্যোতিষ্কাদিতে জীববাস আছে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া যে সুদীর্ঘ আলোচনা চলিতেছে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতিষিগণ বহু বিচার করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বহু দূরের জ্যোতিষ্কগুলির কথা ছাড়িয়া আমাদেরই গৃহদ্বারে যে শুক্র ও মঙ্গল অবস্থান করিতেছে, তাহাদের ঘরের খবর জানিতে গেলেও হতাশ হইতে হয়। কোন জ্যোতিষীই ইহাদের আকাশ এবং পৃষ্ঠদেশের অবস্থা নিঃসন্দেহে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে সি. সাহেব বলিতেছেন, যে এক মহানিয়মের শাসনে এই বিশ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা কখনই বিশেষভাবে পৃথিবীতে কার্য্য করে নাই। ধরাপৃষ্ঠ জীববাসের উপযোগী হওয়া এবং জড়কে জীবে পরিণত করা যখন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একই মহাশক্তির কার্য্য, তখন সেই শক্তিরই লীলাভূমি অপর জ্যোতিষ্কগুলিতে কেন জীব জন্মগ্রহণ করিবে না, তাহার সঙ্গত কারণ নাই।

গ্রহদিগের কক্ষা

কি প্রকারে অনন্ত মহাকাশে সহস্র সূর্য্যের সমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হইল এবং এক একটি জ্যোতিষ্ককে ঘেরিয়া যে-সকল গ্রহ-উপগ্রহ ধূমকেতু অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে তাহারাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, এই মহাপ্রশ্ন প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানবের মনে উদিত হইয়াছিল। অনৈতিহাসিক যুগ হইতে যে, কত কিম্বদন্তী কত অনুমান এই ব্যাপারের সহিত জড়িত হইয়া আছে, সত্যই তাহার ইয়ত্তা হয় না। জড়ের নব নব ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া এবং জড়কে নব নব মূর্ত্তিতে দেখিয়া যে বিজ্ঞান এখন উন্নতির পথে প্রতিদিনই অগ্রসর হইতেছে, তাহাও প্রাচীন মানবের মনের সেই প্রাচীন প্রশ্নটির উত্তর দিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। এই চেষ্টা কতদিনে সার্থকতা লাভ করিবে জানি না। যুগে যুগেই সৃষ্টিতত্ত্বের নূতন নূতন কথা শুনা যাইতেছে; আমাদের পিতামহগণ, যে সিদ্ধান্তের পরিচয় পাইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের একটা কিনারা হইল ভাবিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে আমরা তাহাকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি এবং কোন নূতন সিদ্ধান্ত দ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই প্রকারে অবিরাম পুরাতনের বর্জ্জন এবং নূতনের প্রতিষ্ঠা চলিতেছে বলিয়া আমাদের খেদ করিবার কিছুই নাই; প্রত্যেক সিদ্ধান্তই আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন নূতন সম্পদ প্রদান করিতেছে, এবং সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলাইতে গিয়া আমরা নব নব প্রাকৃতিক তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছি। প্রকৃতির কার্য্যের কারণনির্দ্দেশ

করিতে গিয়া আমরা এই প্রকারে যাহা লাভ করিতেছি তাহা বাস্তবিক অতুলনীয়।

জর্ম্মান্ পণ্ডিত কাণ্ট্ সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গে আভাস দিয়াছিলেন, এই যে বুধ বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ পরিবৃত হইয়া সূর্য্য মহাকাশে বিরাজ করিতেছে তাহা কোন জ্বলন্ত বাষ্পাকার নীহারিকা-রাশি হইতেই উৎপন্ন। ফরাসী গণিতবিৎ লাপ্লস্ (Laplace) সাহেব কাণ্টের ঐকথারই সমর্থন করিয়া তাঁহার নীহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ্জ ডারুইন্ প্রভৃতি মনীষিগণ নীহারিকাবাদের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। নীহারিকাবাদের মূল অবলম্বন করিয়া যে-সকল জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, এখন সেগুলিই তাঁহাদের নজরে পড়িতেছে এবং অব্যাখ্যাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়া কোন নূতন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে নূতন সিদ্ধান্তের আভাস দিতেছেন, তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাপক
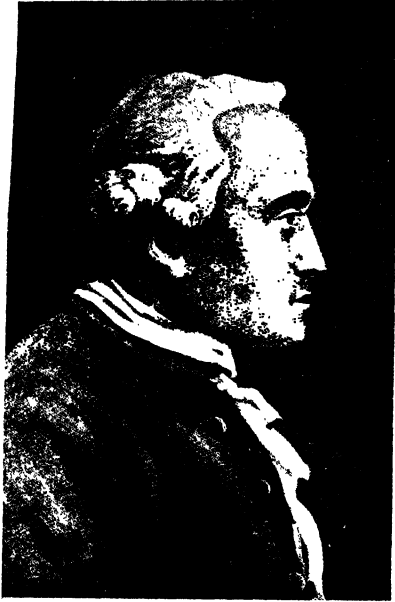
নীহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমানুয়েল্ কাণ্ট

জর্জ্জ ডারুইন্ তাঁহার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া যে এক অব্যাখ্যাত জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই আভাস দিব।

পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট বড় গ্রহগুলি, যে পথে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সহস্র সহস্র বৎসরের পর্য্যবেক্ষণে গ্রহগণকে সেই সকল পথ হইতে একটুও বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। এই ব্যাপারটি আমাদের খুব সুপরিচিত হইলেও বড়ই বিস্ময়কর। কেবল ইহাই নয়,—সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের দূরত্ব পরিমাপ করিলে, দূরত্বগুলির মধ্যে যে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহা আরো বিস্ময়কর। ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শূন্যকে ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক রাশিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাশির দ্বিগুণ হইতে দেখা যায়। এখন যদি প্রত্যেকের সহিত চারি যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি—৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, এবং ১০০ হইয়া দাঁড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের দূরত্বের অনুপাত প্রায় ৪, ৭, ১০ ইত্যাদিরই অনুরূপ।

গ্রহগণের দূরত্বের এই অদ্ভুত নিয়মটি জর্ম্মান্ জ্যোতিষী বোড্ (Bode) সাহেব হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন জ্যোতিষীই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সৌরজগতের সীমান্তবর্ত্তী নেপ্চুন্ গ্রহটিকে ও তাহার উপগ্রহগণকে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রহ-বিন্যাসের নিয়মটি যে, প্রকৃতির একটা খেয়াল এ কথা কখনই বলা যায় না। গ্রহগণের কক্ষার (অর্থাৎ পরিভ্রমণ-পথের) স্থিরতা এবং সূর্য্য হইতে তাহাদের দূরত্বের শৃঙ্খলা যে, সৃষ্টির

সময়কার কোন বিশেষ অবস্থা দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

জর্জ্জ ডারুইন্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নীহারিকাবাদে অবিশ্বাসী হইয়া বলেন, এই যে নানা গ্রহ-উপগ্রহাকীর্ণ সৌরজগৎ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে এক সূর্য্যই বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্য হয় ত কোন নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিন্তু পৃথিবী, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ প্রথমে সেই নীহারিকার অঙ্গীভূত ছিল না। বৃহদাকার সূর্য্যই মহাশূন্য হইতে উল্কাপিণ্ডাকার বহু জ্যোতিষ্ক টানিয়া লইয়া নানা গ্রহাদির উৎপত্তি করিয়াছে। জর্জ্জ ডারুইন্ তাঁহার নব সিদ্ধান্তে এই মূল কথাটিকে ধরিয়াই গ্রহ-উপগ্রহাদির কক্ষার স্থিরতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ডারুইন্ যে গবেষণা করিয়াছেন তাহার আমূল উচ্চ অঙ্গের গণিতে পূর্ণ, আমরা গণিতের কথা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া বিষয়টি মোটামুটি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

জ্যোতির্ব্বিদ্যার যে-সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জ্যোতিষ্ক-লোকের অতীত জীবন আলোচনার ফলেই সুলভ হইয়াছে। দূর ভবিষ্যতে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহার আভাস বর্ত্তমান অবস্থায় পাওয়া যায় না; ইহারা অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইবার সময়ে যে-সকল পদচিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহাই জীবনের ধারা দেখাইয়া দেয়। এই কারণে কোন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে গ্রহনক্ষত্রের জটিলতা-বর্জ্জিত প্রথম অবস্থার কথা স্মরণ করিতে হয় এবং সেই অবস্থাটাই ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে কি প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিতে হয়। জর্জ্জ ডারুইন্ এই প্রকারেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মনে করা যাউক, যেন সৌরজগতে সূর্য্য এবং আর একটি

Path of Neptune
NEPTUNE
and his Moon
Path of Uranus
URANUS
and his 4 Moons
SATURN
with his Rings
and 10 Moons
Path of Saturn
Path of Jupiter
JUPITER
and his 8 Moons
Zone of the Minor Planets
Path of Mars
Path of the Earth
Path of Venus
Path of Mercury
SUN
VENUS
MERCURY
EARTH
MOON
MARS
and his 2 Moons
Part of Saturn's Path
Part of Saturn's Path
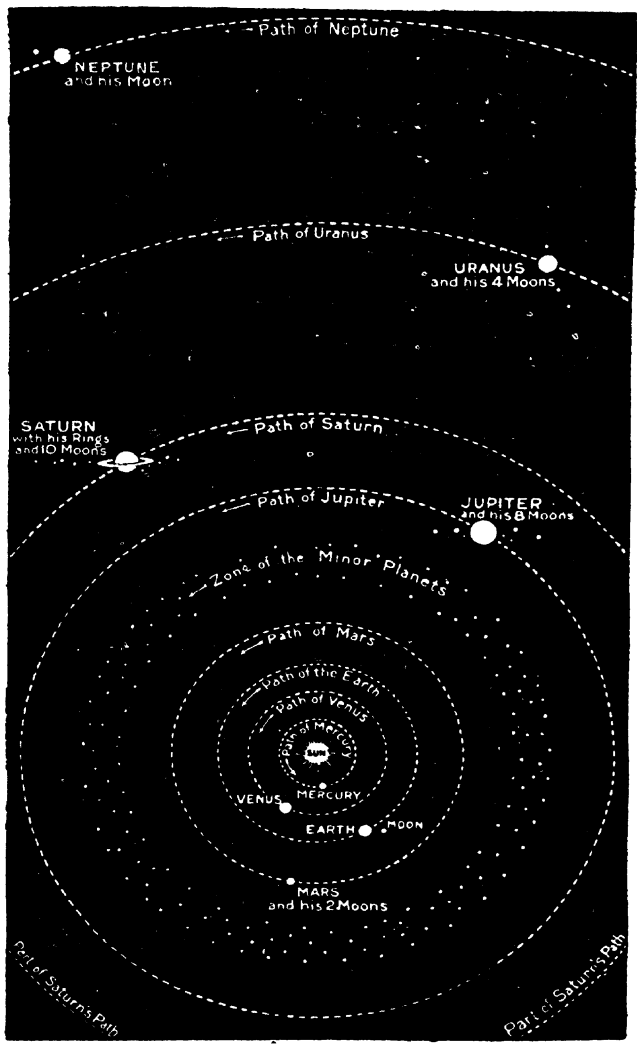
গ্রহদিগের কক্ষা

জ্যোতিষ্ক ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই জ্যোতিষ্কটিকে বৃহস্পতিই বলা যাউক; ইহা যেন কোন চক্রাকার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তা'র পরে মনে করা যাউক, একটি উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহ সৌরজগতে প্রবেশ করিল এবং যে সমতলে বৃহস্পতি সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, নূতন জ্যোতিষ্কটি সেই তল অবলম্বন করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটিয়া চলিল। এই প্রকার অবস্থায় এই তৃতীয় জ্যোতিষ্কটির গতিবিধি কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সহজ বুদ্ধিতে হয় ত একটা উত্তর দিয়া ফেলি। কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া এত সহজ নয়। নিপুণ গণিতবিদ্‌গণকেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন তিনটি জ্যোতিষ্কের গতিবিধি-নির্দ্ধারণে পরাভবস্বীকার করিতে হইয়াছে। গণিতের চুল-চেরা গণনার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আমরা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় দুইটা বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র গ্রহটির গতি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে। নিজের গন্তব্যপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য বা বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা অতি দ্রুত-বেগে উক্ত গ্রহদের নিকটে ছুটিয়া যাইবে এবং কোন প্রকারে যদি উহাদের কবল হইতে রক্ষা পায়, তবে সে অতি মন্থর গতিতে দূরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সূর্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় দুইটা প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ককে ফাঁকি দেওয়া অধিক দিন কখনই চলিবে না; সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে গিয়া এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন তাহা ভীম গতিতে সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কাজেই সূর্য্য ও বৃহস্পতির রাজ্যে নবাগত ক্ষুদ্র অতিথিটির আর অস্তিত্বই থাকিবে না।

এখন মনে করা যাউক, যেন সূর্য্য ও বৃহস্পতির রাজ্যে একটি গ্রহাকার অতিথির পরিবর্ত্তে শত শত ছোট উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিয়া বিচিত্র পথে বিচিত্র গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ছোট হওয়া বড় বিপদ্; বড় ছোটকে নিজের অধীনে রাখে; তার পরে ছোটরা যে দল পাকাইয়া

পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে, তাহারও উপায় থাকে না, কারণ ছোটদের শক্তি অল্প। কাজেই এই শত শত অতিথির দশা পূর্ব্ব উদাহরণের একক অতিথির অনুরূপই হইবে। রাজ্যে প্রবেশলাভ করিবামাত্র কতকগুলিকে সূর্য্য এবং আর কতকগুলিকে বৃহস্পতি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অবশিষ্ট অতিথিরা হয়ত দুই চারবার সূর্য্য বা বৃহস্পতির অতি নিকটে আসিয়া পলাইতে পারিবে, কিন্তু একেবারে মুক্তিলাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটিবে না। ইহাদের অধিকাংশই সূর্য্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অবশিষ্টগুলি বৃহস্পতির ভাগে পড়িবে। কোন্ উল্কাপিণ্ড সৌররাজ্যে প্রবেশ করিয়া কতদিন পরে সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে নির্ব্বাণ লাভ করিবে তাহা বলা কঠিন। যে দিক্ ধরিয়া এবং যে গতিতে উল্কাপিণ্ডগুলি সৌরজগতে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রত্যেকের নির্ব্বাণলাভের কাল সেই দিক্ ও গতির উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেটি খুব অনুকূল গতি ও দিক্ লইয়া বৃহস্পতি ও সূর্য্যের অধিকারে প্রবেশ করিবে, তাহার জীবনও দীর্ঘ হইবে। সহস্র সহস্র উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহের মধ্যে অন্ততঃ দু'চারিটির এইপ্রকার অনুকূল পথে অনুকূল গতি লইয়া প্রবেশ করা একটুও আশ্চর্য্য নয়। কাজেই সূর্য্য বা বৃহস্পতির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমাদের সুপরিচিত গ্রহদের ন্যায় ইহাদের নিরাপদে পরিভ্রমণ করাই স্বাভাবিক। জর্জ্জ ডারুইন্ বলিতে চাহিতেছেন, সৌরজগতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি যে-সকল গ্রহ নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারা সকলেই অনুকূল গতি ও দিক্ লইয়া সৌর অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল, এই কারণেই তাহাদের কক্ষা স্থির রহিয়াছে; যাহারা প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়াছিল, তাহারা সূর্য্য বা অপর কোন প্রতাপশালী গ্রহের টানে ঐ সকল জ্যোতিষ্কে পড়িয়া নিজেদের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে; ইহারা এখন সূর্য্য বা অপর কোন বৃহৎ গ্রহের অঙ্গীভূত।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, মানুষ যেমন স্বাস্থ্য-হিসাবে অল্পায়ু বা দীর্ঘজীবী হয়, নক্ষত্র-জগতের গ্রহ-উপগ্রহগণও ঠিক সেই প্রকারে তাহাদের গৃহ-প্রবেশকালের গতিবিধির অবস্থা-অনুসারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, মানুষের জীবন এক দুই দশ বা শত বৎসরব্যাপী, জ্যোতিষ্কের জীবন দুই চারি দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি বৎসরব্যাপী। কোন-গতিকে সূর্য্যের আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করিবার মত অবস্থা লইয়া যে গ্রহটি সৌর জগতে প্রবেশ করিয়াছে সেটি হয় ত দু'চার লক্ষ বৎসর বাঁচিবে, এবং যাহারা আরও অনুকূল অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের জীবন সম্ভবতঃ কোটি কোটি বৎসরেও অবসান হইবে না। কিন্তু মৃত্যুমুখ হইতে কাহারও নিস্তার নাই, চিরস্থির কক্ষায় ঘুরিতে পারে এ প্রকার হিসাব-পত্র করিয়া এবং তদনুসারে গতিসম্পন্ন হইয়া হয় ত কোন গ্রহ গৃহপ্রবেশ করে নাই।

মানুষের জীবনটা যেমন ক্ষুদ্র, তাহাদের অভিজ্ঞতাও তেমনি অল্প। অধিক কি, আমরা দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকারও খবর লিপিবদ্ধ রাখি নাই। সুতরাং যে জ্যোতিষ্ক দশ কোটি বৎসর ধরিয়া নিরাপদে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যের কবলিত হইবে, আমরা যদি তাহাকে স্থির-কক্ষা গ্রহ বলি, ইহাতে বোধ হয় ভুল হয় না। জর্জ্জ ডারুইন্ ও তাঁহার শিষ্যগণ এই শ্রেণীর দীর্ঘজীবী গ্রহগণকেই স্থিরকক্ষা-সম্পন্ন বলিতে চাহিতেছেন।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সৌর-জগৎ বা অপর কোন নক্ষত্র-জগতের অতিথি গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলি যেন মোটামুটি স্থির-কক্ষা হইল; কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের সুদীর্ঘ বা অনন্ত জীবনের মধ্যে আর কোন বিপদ্ নাই? জর্জ্জ ডারুইন্ এই প্রশ্নের একটা বড় অশুভ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যে আমাদের পৃথিবী একটা নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্টকালে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে,

কোন কারণে যদি সে তাহার কক্ষা হইতে একটু বিচলিত হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! এই যে, একটু অকল্যাণ হইল, তাহা কালে কালে বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে, তখন আর পৃথিবীর নিস্তার থাকিবে না; অল্পায়ুঃ ভ্রাতৃগণের ন্যায় তাহাকেও সূর্য্যের গ্রাসে পড়িতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগণের ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে কি না জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পণ্ডিতগণ এই প্রসঙ্গের যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ধ্বংসের সম্ভাবনাই দেখা যায়। জর্জ্জ ডারুইন্ যখন সূর্য্য এবং বৃহস্পতি বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গণনা করিয়াছিলেন, তখন নবাগত উল্কাপিণ্ডদিগকে গুরুত্বহীন বলিয়াই ধরিয়াছিলেন এবং আরও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মহাকাশে পরিভ্রমণকলে তাহারা বাহির হইতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য, হিসাবের জটিলতা-বর্জ্জনের জন্যই তিনি এই প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারের কথা মনে করিলে বুঝা যায়, উল্কাপিণ্ডগুলি আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাদের ভার আছে এবং ভ্রমণ-পথেও তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই আমাদের গ্রহ-উপগ্রহগণ এখন যে কক্ষায় সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা হইতে কালক্রমে উহাদিগকে অত্যল্প বিচলিত হইতেই হইবে এবং বিচলিত হইলে নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, গ্রহ-উপগ্রহের মৃত্যুবীজ তাহাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে মানবজাতির বিচলিত হইবার কারণ নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহগণের মৃত্যুর আরও শত শত বীজ প্রোথিত হইয়াছে এবং সেগুলি অঙ্কুরিত হইতেও আরম্ভ করিয়াছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে এগুলির কুফলেই সৃষ্টিলোপের সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বের কথাগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলির মোটামুটি হিসাবে স্থির-কক্ষা আছে, এবং কতকগুলির নাই। যাহাদের নাই, তাহারা জীবন-সংগ্রামে কিছুদিন যুঝিয়া বৈরি-হস্তে আত্মসমর্পণ করে। যাহাদের আছে, তাহারা বাহিরের প্রবল শত্রুর সহিত আপোস করিয়া এবং বাহিরের সহিত নিজের চালচলন মিলাইয়া বর্ত্তিয়া থাকে। এখানেও সেই বৃদ্ধ ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সূত্র তলায় তলায় কাজ করিতেছে।

কি প্রকারে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলাদি-গ্রহযুক্ত এই বিশাল সৌরজগতের সৃষ্টি হইল এখন বোধ হয় বুঝা কঠিন হইবে না। প্রথমে সূর্য্য এবং বৃহস্পতিই সৌরজগতে রাজত্ব করিত; তার পর দলে দলে উল্কাপিণ্ড বা ক্ষুদ্র গ্রহাকার নূতন অতিথির আগমন হইল। এগুলি যথেচ্ছ প্রকারে যথেচ্ছ পথে ছুটিয়া চলিত। সূর্য্য এবং বৃহস্পতি সুবিধা বুঝিয়া অধিকাংশকে গ্রাস করিয়া পুষ্টাঙ্গ হইল; সৌরজগতে ছোটখাট উল্কাপিণ্ড বা ধূলিকণাও রহিল না; যাহারা সৌরাধিকারে প্রবেশকালে অনুকূল গতিবিধি লইয়া আসিয়াছিল, কেবল তাহারাই টিকিয়া থাকিল। এই টিকিয়া-থাকা অতিথিগণই এখন এক এক নির্দ্দিষ্ট পথে, নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদিগকে লইয়াই সৌরজগৎ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে-সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, প্রায়ই তাহাদের গোড়ার একটি নিয়মের সন্ধান পাইয়াছেন। জর্জ্জ ডারুইন্ সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যান দিতেছেন, তাহাতে তিনি এখনো কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান পান নাই। ঠিক কোন্ অবস্থায় সৌরজগতে প্রবেশ করিলে নবাগত গ্রহগণ চিরনির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিতে পারে, তাহার সূত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই; তা'ছাড়া কোন্ গ্রহের কক্ষা স্থির এবং কোন্‌টির কক্ষা বিচলনশীল তাহা নির্ণয় করিবার নিয়ম আজও ধরা পড়ে নাই। কিন্তু এই সকল মূল সূত্রগুলি

যে শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে ;—বোড্ সাহেব গ্রহগণের দূরত্বের মধ্যে যে সুশৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

সমগ্র বিশ্ব যে গোড়ায় এক মহানিয়মের অধীন হইয়া মূর্ত্তিমান্ হইয়া পড়িয়াছে, আজকালকার নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর গঠনের সহিত বিরাট্ সৌরজগতের সংগঠনের তুলনা করিলেও ইহার লক্ষণ দেখা যায়। জর্জ্জ ডারুইন্ যেমন একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের চারিদিকে শত শত ক্ষুদ্র উল্কা-পিণ্ডের অস্তিত্ব মানিয়া জগতের অভিব্যক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর গর্ভে অপর বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্ সেইপ্রকার শত শত অতি-পবমাণুকে (Corpuscles) নিয়ত ভ্রাম্যমাণ দেখিতে পাইয়াছেন। জ্যোতিষ্কদিগের ন্যায় অতি-পরমাণুদিগের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোগ-বিয়োগ এবং এক এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না, বরং তাহারই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং যদি বলা যায়, কোন এক শুভদিনে বিরাট্ জ্যোতিষ্ক-জগতের অভিব্যক্তির সূত্র আবিষ্কৃত হইলে, অতি-সূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে যে সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড-গুলি রহিয়াছে, তাহারও মূল তত্ত্ব জানা যাইবে, তাহা হইলে বোধ হয় অধিক কিছুই বলা হয় না।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্মগণনা

সূর্য্যের অতি নিকটে যে বুধ নামক গ্রহটি রহিয়াছে, তাহার তুলনায় সূর্য্যের গুরুত্ব একাত্তর লক্ষ গুণ অধিক কি বাহাত্তর লক্ষ গুণ অধিক, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের কিছুই যায় আসে না, এই প্রকার অভিযোগ 'অবৈজ্ঞানিক' বন্ধুগণের নিকট হইতে অনেক সময়ে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞানে এত চুল চেরা হিসাব কেন? পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি আটাশ লক্ষ আশী হাজার মাইল, এই কথাটা শুনিলে, তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলেন, "হাঁ, সূর্য্যটা খুব দূরে আছে বটে।" কিন্তু যখন বলা যায়, আধুনিক গবেষণায় সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তখন এই কথাটা তাঁদের মনে একটুও বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তাঁহারা হয়ত বলিয়া ফেলেন, এই এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের ন্যূনাধিক্যে আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল কোথায়! এই চুল চেরা হিসাবের ত কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্মগণনার প্রয়োজন এই অভিযোগকারীদিগকে এক কথায় বুঝানো কঠিন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দিয়া ঐ প্রয়োজনের বিষয় পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের কথাই আলোচনা করা যাউক; প্রাচীনত্বে বিজ্ঞানের কোন শাখাই ইহার সমকক্ষ নয়। অতি প্রাচীনযুগের সভ্য মানবগণ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও উদয়াস্তের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিয়া যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহা আমরা অনায়াসেই

অনুমান করিতে পারি। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ ও গ্রহগণের উদয়াস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেন, তাহাই বোধ হয় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণকে বিস্মিত করিত। আজও ইংরাজি নৌপঞ্জিকা (Nautical Almanac) এবং আমাদের দেশীয় পঞ্জিকায় গ্রহণাদিসম্বন্ধে যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা মিলিয়া গেলে, জনসাধারণকে কম বিস্মিত করে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই মোহিনী শক্তিটির উৎপত্তি কোথায়? বিজ্ঞ পাঠককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জ্যোতিষিক ব্যাপারগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের সামর্থ্য মানব কখনই একদিনে পায় নাই। বৎসরের পর বৎসর বহু অনুসন্ধিৎসুকে রাত্রি জাগিয়া জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে, কত গণনায় সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে, কত পরিমাপ করিতে হইয়াছে, তবে তাঁহারা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, কিছুকাল ভাল করিয়া জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণে আমরা তাহাদের গতিবিধির মধ্যে যে নিয়ম দেখিতে পাই, ভবিষ্যতে গ্রহ-নক্ষত্রেরা বুঝি সেই নিয়মেই চলে, কাজেই জ্যোতিঃশাস্ত্রটা চরমে জ্যোতিষীদের হাত হইতে গণিতবিশারদদিগের হাতে পড়াই উচিত। এই অবস্থায় গণিতজ্ঞেরাই কেবল কাগজকলমের হিসাবে জ্যোতিষিক ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারিবেন। যাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতিষিক আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্যই এই প্রকার উক্তি আশা করা যায় না। দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের উপরেই ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জ্যোতিষিক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যতই সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক না কেন, যন্ত্রের দোষে বা পর্য্যবেক্ষণের

অসতর্কতায় একটু আধটু ভ্রম হিসাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রারম্ভের এই অবশ্যম্ভাবী ক্ষুদ্র ভ্রম কালক্রমে জমিতে জমিতে এত বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায় যে, পূর্ব্বেকার গণনায় যে ফল পাওয়া যাইত, তখন আর তাহা পাওয়া যায় না। গ্রহণের বা অপর কোন ঘটনার কাল-নিরূপণের জন্য হিসাবে বসিয়া জ্যোতিষিগণ যে ফল লাভ করেন, তখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্যোতিষিক ব্যাপারের সহিত তাহার মিল দেখা যায় না। ভুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করার পরে, নিয়মের এই প্রকার স্খলন প্রাচীন জ্যোতিষিগণ পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা হইতে জ্যোতিষিক গণনায় চুল-চেরা হিসাবের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। গণনার সহিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার মিল দেখানোর উপরেই জ্যোতিঃশাস্ত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পর্য্যবেক্ষণে ভুল হইলে, এই মিল রক্ষা করিয়া গণনা করা একেবারে অসম্ভব। কাজেই মোটামুটি পর্য্যবেক্ষণের ফলে কোন নিয়মের সন্ধান পাইয়াও জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; বংশের পর বংশ বৎসরের পর বৎসর এবং রাত্রির পর রাত্রি ইঁহাদিগকে বার বার জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণ ও বড় বড় হিসাবের খাতা লিখিয়া জীবন কাটাইতে হয়; আমাদের ন্যায় 'অবৈজ্ঞানিক'দিগের নিকটে এই প্রকার চুল-চেরা হিসাবপত্র বাড়াবাড়ি ঠেকিতে পারে, কিন্তু জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের মহিমাটুকু এই বাড়াবাড়ি এবং চুল-চেরা হিসাবের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটা উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। পাঠক অবশ্যই কেপ্‌লার সাহেবের আবিষ্কৃত জ্যোতিষিক নিয়মাবলীর কথা শুনিয়াছেন; সাধারণতঃ এগুলি কেপ্‌লারের নিয়ম (Kepler's Laws) নামে সুপরিচিত। যখন নিয়মগুলির প্রথম প্রচার হইয়াছিল, তখন সে গুলিকে অভ্রান্ত বলিয়াই পণ্ডিতগণ গ্রহণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, কেপ্‌লারের নিয়মে অনেক গলদ বর্ত্তমান। তাঁহার স্থূল-পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ নিয়মাবলী অনুসারে কয়েক বৎসর গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ঠিকই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাঁহার প্রথম পর্য্যবেক্ষণের ভ্রম যখন বৎসরে বৎসরে পুঞ্জীভূত হইয়া বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আর গ্রহ-নক্ষত্র কেপ্‌লারের নিয়ম মানিয়া চলে নাই। কাজেই নিয়মের সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত নিউটন্ সাহেব্ তাঁহার মহা-কর্ষণের নিয়মাবলী দ্বারা কেপ্‌লারের নিয়মের সংশোধনে লাগিয়া গেলেন, খুব সূক্ষ্ম হিসাবপত্র চলিতে লাগিল এবং শেষে জানা গেল, কেপ্‌লার যে-সকল নিয়ম কেবল পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাদের মূল মহাকর্ষণের নিয়মাবলীতেই প্রোথিত। পৃথিবী যে নিয়মের অনুগত হইয়া আতা-ফলকে মাটিতে ফেলে, সৌর-জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই যে, সেই নিয়মেরই অধীন হইয়া মহাকাশে পরিভ্রমণ করে; তাহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল। এই সকল ছাড়া, চন্দ্রের গতির উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জোয়ারভাঁটা প্রভৃতি যে-সকল প্রাকৃতিক ঘটনা জ্যোতিষীদিগের নিকটে মহা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একে একে সেগুলিরও কারণ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ধূমকেতু যখন সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করে, এবং অতি দূর প্রদেশে যুগ্মতারকাগণ যখন পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে, তখনও যে তলে তলে জ্যোতিষ্কগণ মহাকর্ষণেরই নিয়মাধীন থাকে, তাহাও সকলে জানিতে পারিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিউটন্ সাহেব খাতাপত্র লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া যে সময়টা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার অপব্যবহার হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম হিসাবই এখন গ্রহ-নক্ষত্রের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি আমাদিগকে সূক্ষ্মরূপে জানাইতেছে, এবং সৌরজগৎ ছাড়িয়া অতিদূর নক্ষত্রলোকের

সংবাদও আমাদিগের নিকটে বহিয়া আনিতেছে। আমরা যে পৃথিবী-খানির উপরে বাস করিতেছি, তাহার জন্মতত্ত্ব এবং শৈশবের ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা কাহার না হয়? নিউটন্ সাহেবের সূক্ষ্ম গণনাই এখন আমাদের সেই সকল ইচ্ছারও পূরণ করিতেছে। নিউটনের হিসাবপত্র খুব সূক্ষ্ম হইলেও ইহা একেবারে অভ্রান্ত নয়। হয় ত বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নিয়মে হিসাব করিলে আমরা ভুল পাইব না, কিন্তু অতিদূর ভবিষ্যতে ঠিক্ এই নিয়মে গ্রহনক্ষত্রেরা চলাফেরা করিবে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বরং এ প্রকার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে বহু যুগ পরে কেপ্লারের নিয়মের ন্যায় নিউটনের নিয়মেরও সংশোধন প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। দুই হাজার বৎসর পরে যে দিন নিউটনের নিয়ম না মানিয়া জ্যোতিষ্ক-দিগকে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইবে, সেই দিনই কোন সূক্ষ্মতর গণনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সুতরাং এখন হইতেই যদি পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি লইয়া খুব সূক্ষ্মগণনায় কালক্ষেপ করেন, তবে তাহাকে সময়ের অপব্যবহার বলা যায় না।

আমরা এ পর্য্যন্ত সৌরজগতের কথা লইয়াই আলোচনা করিলাম, যে অনন্ত নক্ষত্রলোক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এখন তাহার কথা স্মরণ করা যাউক। হার্সেল সাহেবের পর বহু জ্যোতিষী বহু অনিদ্র রজনী নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণে কাটাইতেছেন; ইহাতে যে, কত সূক্ষ্ম হিসাবপত্র এবং তর্ক-কোলাহলের উৎপত্তি করিতেছে, আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকটে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এগুলিও নিষ্কর্ম্মার সময়-ক্ষেপণের উপায় নয়। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহগণের উদয়াস্ত এবং তাহাদের চলাফেরাসংক্রান্ত যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা দেখিয়া অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ অবাক্ হইয়া যান, তাহাদের মূলও উক্ত

হিসাবপত্রের মধ্যে প্রোথিত। পাঠকের বোধ হয় অজ্ঞাত নাই, আমরা যখন জমি-জমা জরিপ করিতে আরম্ভ করি তখন প্রাচীন বৃক্ষ বা অপর কোন স্থায়ী বস্তুকে কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই স্থায়ী চিহ্ন হইতে পার্শ্বস্থ জমির দূরত্ব কত, তাহাই জরিপি চিঠাপত্রে লিখিত থাকে। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির চলাফেরা লিপিবদ্ধ রাখিতে হইলেও, ঐ প্রকার এক একটা স্থায়ী চিহ্নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনন্ত আকাশে সে প্রকার চিহ্ন কোথায়! জ্যোতিষীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থির নক্ষত্রগণকে চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া হিসাব করেন। চিহ্নের (Station) গোলযোগ হইলে জমিরদারকে জমি-জমার হিসাবপত্র লইয়া ভবিষ্যতে অশেষ হাঙ্গামায় পড়িতে হয়। যে-সকল নক্ষত্রকে স্থায়ী চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষীরা হিসাবপত্র করেন, তাহাতেও এক চুল নড়চড় হইলে, গণনায় মহা বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই চিহ্নস্বরূপে গৃহীত নক্ষত্রগুলির উপরে জ্যোতিষীদের নিয়তই খরদৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। প্রাচীন জ্যোতিষীরা নক্ষত্রগুলিকে নিশ্চল বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন আর কোন নক্ষত্রকেই নিশ্চল বলা যায় না। এক একটি নক্ষত্র এক একটি মহাসূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ; কত গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ইহারা প্রত্যেকেই এই প্রকার জ্যোতিষ্কপরিবারে পরিবৃত হইয়া এক একটি নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষীদিগকে নক্ষত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে-সকল নক্ষত্র নিশ্চল বলিয়া স্থির ছিল, সেইগুলিরও স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হওয়ায় জ্যোতিষীদের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। নিয়তই ইঁহাদিগকে নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, এবং তাহাদের অধিকৃত স্থানের একটু নড়চড় দেখিলে তাহা লিপিবদ্ধ রাখিয়া ভবিষ্যতের গণনার

পথ সুগম করিতে হয়। সুতরাং নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের জন্য জ্যোতিষিগণ যে শ্রম করেন এবং যে সূক্ষ্ম হিসাবপত্র খাড়া করেন, তাহারও মধ্যে একটুও বাহুল্য নাই বলিয়াই মানিতে হয়।

আঠারো কোটি ষাইট লক্ষ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট এক মহাবৃত্তাকার পথে পৃথিবী সূর্য্যকে এক বৎসরকালে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। অর্থাৎ বলিতে হয়, পৃথিবী আজ আকাশের যে অংশে আছে, ছয় মাস পরে তাহা আঠারো কোটি ষাইট্ লক্ষ মাইল দূরে গিয়া দাঁড়াইবে। আমরা যখন গাড়িতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে থাকি তখন পথের পার্শ্বের বৃক্ষ-গুলিকেও স্থানচ্যুত হইতে দেখি। যে গাছটি একটু পূর্ব্বে আমাদের সম্মুখে ছিল, গাড়ি অগ্রসর হইলে তাহা পিছাইয়া পড়ে। সুতরাং এই পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র বুকে লইয়া আমাদের এই পৃথিবী যখন ছয়মাসে আঠারো কোটি ষাইট্ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে, তখন পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ন্যায় আকাশের নক্ষত্রগুলিকেও একটু আগাইতে বা পিছাইতে দেখারই সম্ভাবনা। নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর গতিতে প্রকৃতই এই প্রকার নড়াচড়া করে কি না, জ্যোতিষিগণ বহু দিন হইতে ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কতকগুলি স্থির নক্ষত্রের এই প্রকার স্থানচ্যুতিও লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন এই শ্রেণীর নিকট নক্ষত্রের সংখ্যা বহু জ্যোতির্ব্বিদের চেষ্টায় প্রায় চারি শত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে কেবল চারি শতটিই সৌরজগতের নিকটবর্ত্তী এবং তাহাদেরই কেবল দূরত্ব পরিমাপের উপায় আছে, তদ্ব্যতীত সকল নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে, আমরা সাড়ে আঠারো কোটি মাইল পরিভ্রমণ করিয়াও তাহাদের একটুও বিচলন লক্ষ্য করিতে পারি না। সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিষিগণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই যে একটু আভাস প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে কম লাভবান্ করে নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রদিগের সংবাদ জানিতে না পারিয়া জ্যোতিষিগণ হতাশ হন নাই। উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া আরো সূক্ষ্মতর হিসাবের সাহায্যে দূর নক্ষত্রের সংবাদ আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি মহাসূর্য্য, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি স্বকীয় গতি আছে। যেগুলি অতি দূরে অবস্থিত, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে তাহাদের গতি দুই চারি শত বৎসরেও ধরা পড়ে না; কেবল নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রেরাই একটু দীর্ঘ-কালে একটুমাত্র বিচলন দেখাইয়া স্বকীয় গতির পরিচয় প্রদান করে। নক্ষত্রদিগের এই গতির পরিচয় পাইয়া হার্সেল্ সাহেবের মনে হইয়াছিল, আমাদের সূর্য্যটি যখন নক্ষত্রজাতীয় জ্যোতিষ্ক, তখন ইহারও একটা গতি থাকার সম্ভাবনা। হার্সেল্ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিষয়টি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং শেষে দেখাইয়াছিলেন, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া আমাদের সূর্য্যটি সত্যই হারকিউলিস্ রাশির দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ হার্সেল সাহেবের প্রদর্শিত পন্থায় নানাপ্রকার উন্নত যন্ত্রাদি-সাহায্যে সৌরজগতের গতির পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন এবং এই গতির পরিমাণ বৎসরে অন্ততঃ চল্লিশ কোটি মাইল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই পৃথিবীর ষাণ্মাসিক সাড়ে আঠারো কোটি মাইল পরিভ্রমণেও যে-সকল নক্ষত্র বিচলন দেখাইয়া আত্মপরিচয় দেয় নাই, সৌরজগতে বার্ষিক চল্লিশ কোটি মাইল ভ্রমণে তাহাদেরই পরিচয়-গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দূর নক্ষত্র-দিগের পরিচয় সংগ্রহের জন্য জ্যোতিষিগণের এই যে অক্লান্ত শ্রম ইহার কি সার্থকতা নাই? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য বুঝিয়া মানবজাতি কি ইহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না?

যাঁহারা আধুনিক জ্যোতিষিক আবিষ্কারের সংবাদ রাখেন

গ্রীনউইচ মানমন্দির
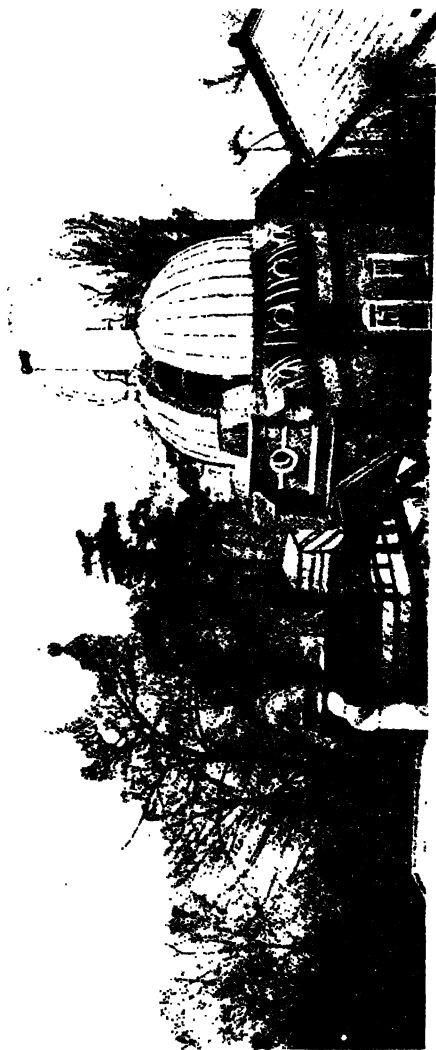
তাঁহাদের নিকটে গ্রনিন্‌জেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ক্যাপ্তেন্ (Kaptyen) সাহেবের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি সম্প্রতি নাক্ষত্রিক-জগৎসম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা প্রচার করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে প্রকৃতই বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ক্যাপ্তেন সাহেব বলিতেছেন, মহাকাশে এই যে অসংখ্য তারকাগুলি কোটি কোটি মাইল বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মিটি-মিটি জ্বলিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অতি গূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইহার মতে সমগ্র বিশ্বের নক্ষত্রগুলির মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাগ রহিয়াছে; বিশৃঙ্খলভাবে আকাশে সজ্জিত থাকিয়াও ইহাদের প্রত্যেকটি ঐ দুই দলের মধ্যে কোন একটির অন্তর্ভূত হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। একটা উদাহরণ দিলে ক্যাপ্তেন্ সাহেবের এই আবিষ্কারটি সহজে বুঝিবার সুবিধা হইবে। মনে করা যাউক, যেন আকাশে দুই ঝাঁক পাখী উড়িয়া চলিয়াছে; এক ঝাঁক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছুটিতেছে, আর এক ঝাঁক যেন দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিয়াছে। দুই ঝাঁকের কোন পাখীরই বিশ্রাম নাই, সকলেই উড়িয়া চলিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রগণ এই পাখীর ঝাঁকের মতই দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছে বলিয়া ক্যাপ্তেন্ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। তাহারা কোন্ দিক্ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। যে-সকল নক্ষত্রকে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ চিরস্থির বলিয়া অনুমান করিতেন, তাহাদেরই এই প্রকার সুশৃঙ্খলিত গতি আবিষ্কার করা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের এই বৃহৎ আবিষ্কারটির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতদিগের চুল-চেরা সূক্ষ্ম-গণনাই ইহাকে পূর্ণতা প্রদান করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাড্‌লি (Bradley) সাহেব প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীন্‌উইচ্

মানমন্দিরে বসিয়া যখন আকাশের নক্ষত্রদের মানচিত্র-অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এই নক্ষত্রগণনাকে নদীতীরে বসিয়া জলস্রোতের গণনার ন্যায় একটা অনাবশ্যক কার্য্য বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন। কিন্তু আজ ক্যাপ্তেন্ সাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নক্ষত্র-জগতের যে-সকল সংবাদ প্রচার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছেন, তাহা সেই ব্রাড্‌লি সাহেবেরই নক্ষত্র-পরিচয়ের সহিত বর্ত্তমানকালে নক্ষত্রদিগের অবস্থানাদি মিলাইয়া জানা যাইতেছে।

সূক্ষ্মগণনায় জ্যোতিঃশাস্ত্র কত উন্নত হইয়াছে এবং মানবের জ্ঞানও ইহাতে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার অতি অল্পই পরিচয় প্রদান করা হইল। দূর জ্যোতিষ্কদিগের ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া আজকাল নক্ষত্রলোকের যে-সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেগুলির কথাও আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক-দিগের সূক্ষ্মগণনাই এখানে জয়যুক্ত হইয়াছে। কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রের নয়, রসায়নীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের চুল-চেরা সূক্ষ্মগণনাকেই সেগুলির উন্নতির মূলকারণস্বরূপ দেখা গিয়া থাকে।

শুক্র-ভ্রমণ

বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় আমার বড় আমোদ, এজন্য বহু চেষ্টায় কতকগুলি বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং পুরাতন-দ্রব্য-বিক্রেতার দোকান হইতে দুই চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। একটি ভগ্ন-পরকলা দাগী হাত-দূরবীণ, একটি ক্ষুদ্র আনিরয়েড্ ব্যারোমিটার্ এবং দুইটি ছোট বড় তাপমানযন্ত্র আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবলম্বন ছিল; এতদ্ব্যতীত একটি তন্ত্রিহীন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, কয়েকটি কাচের নল, একটি সচ্ছিদ্র ইন্‌কান্‌ডেসান্ট বৈদ্যুতিক দীপ, একটি বুন্‌সেনের সেল্ এবং কয়েক হাত রেশমমোড়া তার ইত্যাদিও সংগ্রহ ছিল। আমার একটি বিজ্ঞানানুরাগী বন্ধুর সাহায্যে, দূরবীক্ষণটি মেরামতের জন্য পিন্ ঠুকিয়া এবং বৈদ্যুতিক দীপটি জ্বালাইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া অবকাশ-কাল, বেশ সুখে অতিবাহিত হইত। এখন সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর সম্মুখে সুদীর্ঘ অবকাশ। এই সুদীর্ঘ দিন ক্ষেপণের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার একটা ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চায় আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সাহায্য পাইব না, মনে পড়ায় সময়ক্ষেপণের কল্পিত উপায়টি যে বিশেষ সুখপ্রদ হইবে তাহা বড় আশা করিতে পারিলাম না।

আমাদের বিজ্ঞানানুশীলন-কালে, বন্ধুবর এক অভিনব উপায়ে নৌকাচালনের যন্ত্র অবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, যন্ত্রটি পেটেণ্ট করিবার আশায় ও বন্ধুগণের উত্তেজনায় একখানি নৌকা ও তদানুষঙ্গিক কল ইত্যাদিও বহুব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-

বশতঃ, কলসাহায্যে চালানো দূরের কথা, রজ্জুদ্বারা সাধারণ উপায়ে চালাইতে গিয়াও, তরীখানি নাকি, উল্‌টাইয়া বিপরীতভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই আবিষ্কার-বিভ্রাটের সমস্ত দোষ কাষ্ঠসংযোজক মূর্খ সূত্রধারের হইলেও, সেই দিন হইতে বন্ধুবরের উৎসাহের মাত্রাটা অধোগামী হইতে দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরে, রাসায়নিক পরীক্ষাসময়ে, এক দিন আর একটা গুরুতর বিভ্রাটের ফলে, কিছুদিন বিজ্ঞানালোচনায় যোগদানে অসমর্থ হওয়ায়, বন্ধুবরের বিজ্ঞানানুরাগ এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বহুচেষ্টাতেও বন্ধুকে আর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাইতে পারি নাই, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার কথোপকথন কালে গম্ভীরভাবে দুই একটা বৈজ্ঞানিক বুখ্‌নি দেওয়া স্বভাবটা তাঁহার পূর্ব্ববৎ ছিল—তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত গুম্ফরাজিশোভিত চস্‌মাবৃত মুখমণ্ডল দেখিয়া, তিনি যে ভবিষ্যতে একজন উচ্চদরের লোক হইবেন, তাহাতে বড় কেহ সন্দেহ করিতে পারিত না।

বীতরাগী বন্ধুকে পুনরায় বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত করা দুরাশা জানিয়াও একদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; যাহা দেখা গেল তাহাতে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিপক্ষে আরো সন্দেহ উপস্থিত হইল। সেদিন রবিবার, বন্ধুর আফিস বন্ধ—তাঁহার সেই ক্ষুদ্র সজ্জিত ঘরে, মেজের এক প্রান্ত অধিকার করিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমাকে আসিতে দেখিয়াই তিনি স্মিতমুখে চেয়ার টানিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহার লিখিত বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "আজ কাল মাসিক পত্রাদিতে, বেশ ছোট ছোট গল্প দেখিয়া, একটা গল্প লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলুম, গল্পটা প্রায় লেখা শেষ হয়েছে, এখন শেষ মিলাতে গিয়ে বড় গোলযোগ হয়েছে।" বন্ধুর এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম; আমার জানা ছিল বৈজ্ঞানিকগণের কাব্যপ্রিয় হওয়া একটি ভয়ানক ফ্যাসান-বিরুদ্ধ কার্য্য, ঘোর ফ্যাসানা-

নুরাগী বন্ধুর পূর্ব্বব্যবহার দ্বারা এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত ছিল, কিন্তু তাঁহাকেই কাব্যসেবী দেখিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার পাঠগৃহের মেজের উপর যে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পুস্তকরাশি সজ্জিত ছিল, এখন দেখিলাম তাহার সকলগুলিই আল্‌মারীবদ্ধ হইয়াছে; সেক্‌স্‌পীয়র, সেলী, টেনি-সন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের চক্‌চকে বাঁধানো পুস্তক টেবিল অধিকার করিয়াছে। বন্ধুবর সাগ্রহে তাঁহার লিখিত গল্পটি পড়িয়া শুনাইলেন। গল্পটির কথা এখন কিছুই মনে নাই, কিন্তু আমার স্মৃতি-শক্তি নিতান্ত নিস্তেজ নয়, বোধ হয় বন্ধুর হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার সরস গল্পটির উপর মনঃসংযোগের অবসর পাই নাই; তবে গল্পপাঠান্তে শেষ মিলানো সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহিলে, এটাকে ট্রাজিক্ করা ভাল বলিয়া যে একটা বড় "বেখাপ" উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে আছে, এবং বন্ধুবর এই উত্তর শুনিয়া তাঁহার পরামর্শদাতাকে নিতান্ত কাব্যরস-বর্জ্জিত ঠাহরাইয়া, যে দুই একটি সরস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও ভুলি নাই। যাহা হউক, এই অবস্থার নবকাব্যানুরাগী বন্ধুকে বিজ্ঞানালোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত করা বড় সহজ হইবে না ভাবিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইলাম; তবু মনোগত প্রকৃত ভাবটা আয়ত্ত করিবার ইচ্ছায়, তাঁর আফিসের কথা তুলিয়া শীঘ্রই একটা পাকা চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা, বড় সাহেবের হঠাৎ বদ্‌লির কারণ ইত্যাদি পাড়িয়া এডিসনের নূতন ফোনোগ্রাফ-যন্ত্রের কথা উপস্থিত করিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই বন্ধুবর নিরুত্তর হইবেন, কিন্তু এ প্রসঙ্গেও তাঁহার বাক্যস্রোত পূর্ব্ববৎ সমান খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং এডিসনের যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে যে এখনও অনেক গবেষণা ও চিন্তার আবশ্যক, তাঁহার স্বভাবসুলভ কল্পনা-সাহায্যে দুই একটি নূতন উদাহরণ দ্বারা তাহা বেশ বুঝাইতে লাগিলেন। সে যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিক কথোপকথনে সোৎসাহে যোগ দিতে দেখিয়া, বন্ধুর মতি-পরিবর্ত্তনের

ইহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ফোনোগ্রাফের কথা ও পারিস-পরিদর্শনীর ইফেল্ টাওয়ারের নির্ম্মাণ-কৌশলাদির বিবরণ শেষ হইলে আমার নিজের কথাটা উপস্থিত করিলাম। পুনরায় বিজ্ঞানালোচনায় যোগ দিতে হইবে শুনিয়া বন্ধু, বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা ও 'ওরিজিনালিটি'র হীনতা-সম্বন্ধে নানা কথার উত্থাপন করিলেন, পরে বহুমূল্য যন্ত্রাদির সাহায্য না লইয়া দরিদ্র বঙ্গসন্তানদিগের বিজ্ঞান-আলোচনার প্রয়াসটা যে, পূর্ণ বাতুলতা তাহাও বলিলেন; কিন্তু চক্ষু বুঁজিয়া নিশিদিন্ আজ্গবি চিন্তা আহ্বান করা অপেক্ষা এ পাগ্‌লামি কতক ভাল বলিয়া পীড়াপীড়ি করায়, বন্ধু অবশেষে আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অল্পদিন হইল হঠাৎ মাথার পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, ডাক্তারেরা তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য গভীর চিন্তা এককালে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন—এজন্য যন্ত্রাদি লইয়া পরীক্ষা বা গবেষণাসাপেক্ষ প্রাক্‌টিকাল্ কার্য্য যে, তাঁহার দ্বারা আপাততঃ হইবে না, সে কথাও বন্ধু বলিয়া রাখিলেন। অনন্যোপায় হইয়া, কয়েকখানি নূতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া উভয়ে মিলিয়া তাহাই আলোচনা করিবার মনঃস্থ করিলাম।

ইহার পর দুই দিনে, আমরা নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি পড়িয়া বেশ সময় ক্ষেপণ করিয়াছি। তৃতীয় দিবসে বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি এবং তিনি আপিসে গিয়াছেন কি না ভাবিতেছি, কারণ বিনা বেতনে আপ্রেণ্টীসের কাজটা, গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার অনুগ্রহপ্রদর্শন বলিয়া ভাবিতেন, এবং সপ্তাহে ছয় দিনই যে তিনি অনুগ্রহ প্রকাশে বাধ্য, তাহা ন্যায়ানুগত বিবেচনা করিতেন না। যাহা হউক এমন সময়ে এক-খানি ছোট পুস্তক হস্তে বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু-আনীত পুস্তকখানি, জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ-জ্যোতির্ব্বিদের রচনা—অবশ্য ইহাতে গ্রহ-উপগ্রহসম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় আছে ভাবিয়া, সে দিন ঐ পুস্তকখানি পাঠের ব্যবস্থা করা গেল। বন্ধু পুস্তকখানির দুই চারি

পাতা উল্‌টাইয়া শুক্রগ্রহের বিবরণ পড়িতে লাগিলেন। সে দিন বড় গরম; শুক্রগ্রহের বিবরণপাঠ সমাপ্ত হইলে, অপর এক নূতন বিষয় পাঠারম্ভে বড় ইচ্ছা হইল না; বন্ধুও সে দিন দুই একটি হাঁই তুলিয়া পার্শ্বের ইজিচেয়ারখানির আশ্রয়ে শুইয়া, পুস্তকের পাতাগুলি ঘন ঘন উল্‌টাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন—উভয়ের সম্মতিক্রমে সে দিন আর অধিক পড়া হইল না। বন্ধু ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া শুক্রগ্রহ-সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন—এবং গ্রহটি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীববাসোপযোগী বলিয়া যে একটা কথা উঠিয়াছে, সে বিষয়েও তাঁহার মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বন্ধুর কথা শুনিতে লাগিলাম।

এই অবস্থার কত পরে মনে নাই, বোধ হইল যেন আমি বন্ধু-কথিত শুক্রগ্রহের অন্ধকার ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রি দ্বিপ্রহরে পৃথিবীর জনহীন সুপ্ত প্রান্তর যে প্রকার শান্ত ও গম্ভীর দেখিয়াছি, ইহাও সেই প্রকার গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। এই সময়ে একটা কথা মনে পড়িল—চন্দ্রের যেমন একাংশ সর্ব্বদাই আলোকিত ও অপরাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, শুনিয়াছি শুক্রগ্রহেরও সেই প্রকার একই অংশ চিরতামসাবৃত থাকে—এই অংশ কখন সূর্য্যালোকে অলোকিত হয় নাই, এবং হইবারও আশা নাই ভাবিয়া, রাত্রের নিস্তব্ধতা যেন দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবীর রাত্রির ন্যায়, এই চিরনিশাময় গ্রহের অন্ধকার, অতি নিবিড় নয়, আকাশে ভাসমান অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলিই অত্যন্ত দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইল। আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ-কালে একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক সহসা আমার নয়নগোচর হইল, ইহার নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিলাম—এই জ্যোতিষ্কযুগল দেখিয়াই, ইহারা আমার চির-পরিচিত আবাসভূমি পৃথিবী ও তাঁহার উপগ্রহ চন্দ্র বলিয়া স্থির করিলাম, এবং আমাদের ধন-জন-পূর্ণ পৃথিবী, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সৃষ্টির

তুলনায় কত ক্ষুদ্রতম পদার্থ তাহা কল্পনা করিয়া বিস্ময়পূর্ণ হইতে লাগিলাম।

আকাশে পৃথিবীর উচ্চতা এবং ইহার অবস্থানাদি দেখিয়া, গ্রহের কোন্ অংশে আমি উপস্থিত হইয়াছি, মনে মনে তাহার একটা স্থূল হিসাব করিলাম—দেখিলাম, ইহার অনালোকিত ভাগের পূর্ব্বাংশে প্রায় বিষুব-রেখার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এস্থান হইতে আলোকিতাংশের ব্যবধান প্রায় ছয় শত ক্রোশ হইবে। শুক্রে উপস্থিত হইবামাত্র পরিচ্ছন্ন আকাশে নানা নূতন দৃশ্য দেখিয়া, গ্রহের উপরিস্থ কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, কিন্তু শীঘ্র এত অধিক শীত অনুভব করিতে লাগিলাম যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শীতনিবারণের চেষ্টা করিতে হইল। গায়ে মোটা কাপড় ছিল বটে, কিন্তু শীত এতই প্রবল বলিয়া বোধ হইল যে, তাহা দ্বারা শীতনিবারণ হইল না। এই প্রকার অবস্থায় নির্জীবভাবে দাঁড়াইয়া থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া, এই অপরিচিত প্রদেশের এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। বেড়াইতে আরম্ভ করায় শরীর কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইল বটে, কিন্তু আমার পদক্ষেপণের বিকট শব্দে বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলাম—সে শব্দ এতই উচ্চ যে, ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই তিনটি অশ্বের ক্ষুরধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এতদ্ব্যতীত এই নূতন রাজ্যে আর একটি ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত ঠেকিল—এই মহা শীতে কোন স্থানে তুষার বা বরফের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইলাম না।

এই সকল অপার্থিব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপারের যথার্থ কারণ অবধারণার্থে কিছু ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কেন বলিতে পারি না—কোনক্রমেই মনঃস্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় একটা সৃষ্টি-ছাড়া অপার্থিব দেশে আসিয়া হঠাৎ আবির্ভূত হওয়ায়, অতীত জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার কথা আসিয়া মনে একটা উজান স্রোত উপস্থিত

করিয়াছিল, তাহারি টানে মনে কোন কথাই স্থান পায় নাই। এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা আমার বন্ধুর অভাবটা বড়ই তীব্ররূপে অনুভব করিতে হইয়াছিল—তিনি উপস্থিত থাকিলে, হয়ত উক্ত অপার্থিব ঘটনা দুইটির কারণাবিষ্কারের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে হইত না, বিনা চিন্তায় অতি গুরুতর বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেরও সিদ্ধান্ত খাড়া করা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সকল চিন্তাই একে একে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং এই অপরিচিত প্রদেশে ভবিষ্যতে আমার কি হইবে—এই মহতী চিন্তা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়ে একটা মহাবিপ্লবের সূচনা করিয়া দিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া ঝটিকাক্রান্ত তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে কোন একটি জীব আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে বুঝিতে পারিলাম—স্থির-দৃষ্টিতে দেখিয়া, যেন এক বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দ্রুতবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। শুক্রগ্রহে উপস্থিত হইয়া জীব-বাসের কোন নিদর্শন পাই নাই, হঠাৎ ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম—কিছুদিন পূর্ব্বে জীবনিবাস কেবল পৃথিবীতেই সম্ভব বলিয়া বন্ধুর সহিত যে মহা তর্ক করিয়াছিলাম, সেটা মনে পড়িয়া গেল এবং সে বিষয়ে বন্ধুর অনুমানই যে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। দাঁড়াইয়া অতি অল্পকালমাত্র এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, মৎচিন্তিত জীব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার আকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং কিঞ্চিৎ ভয়েরও সঞ্চার হইল। আমাদের বনমানুষের সহিত ইহার আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে; সর্ব্বশরীর ঘনকৃষ্ণলোমাবৃত, শরীরের তুলনায় মস্তকটি অত্যন্ত বৃহৎ, এতদ্ব্যতীত হস্তপদাদি দীর্ঘনখযুক্ত ও দেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই ভীষণ জীবটি আমার পুরোবর্ত্তী হইয়া, এত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল যে, চিরসুপ্ত

স্তব্ধ প্রান্তরও যেন সেই ভীষণ কোলাহলে কম্পিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব জীবের অপূর্ব্ব গর্জ্জন আক্রমণের সূচনা বিবেচনা করিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষীণদেহ পার্থিব-জীব, ইহার সুতীক্ষ্ণ বক্রদন্তের সহিত যে, এক মুহূর্ত্তকাল যুঝিবে, তাহা বিশ্বাস হইল না, অদৃষ্টফলের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলাম! ক্রমেই তাহার উচ্চ গর্জ্জন মন্দীভূত হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করা ব্যতীত ইহার অপর কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধ হইল এবং তাহার নানা অঙ্গভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া, নিশ্চয়ই আমাকে সহগামী হইবার জন্য ভাবপ্রকাশ করিতেছে বুঝিলাম। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সে আমার পূর্ব্বাবলম্বিত পথ ত্যাগ করিয়া, আর এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল; আমিও তাহার অনুগমন করিলাম। দেখিলাম শুক্রবাসী জীব অতি দ্রুত চলিতে পারে; আমি পূর্ব্বে যে তাহাকে দৌড়িতে দেখিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক দৌড় নয়, তাহার সাধারণ পদক্ষেপ এতই দীর্ঘ যে, মানবপদক্ষেপণের দশগুণও ইহার সহিত সমান হয় না। আমি তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলাম। শুক্রগ্রহের এই দারুণ শীতে শরীর উষ্ণ রাখিয়া জীবন ধারণার্থে, স্বভাবতঃই ইহারা স্থূললোমাবৃত ও দ্রুতগমনশীল হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

আমার এই অদ্ভুত সহচরের সহিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, আমাদের অনুসৃত পথের সম্মুখেই, নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে, একটা বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ দেখা গেল। পথপ্রদর্শক জীবটি সেই স্তূপাভিমুখে চলিতে লাগিল, এবং আমরা অতি অল্পকাল-মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলাম। সমতল ভূমিতে এপ্রকার স্তূপ বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকিল। শুক্রগ্রহে আমি নবাগত, সুতরাং তুচ্ছ পার্থিব জ্ঞান দ্বারা ইহার প্রাকৃতিক ব্যাপারের

উপর মতামত প্রচার করা এবং বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির প্রত্যেক ঘটনা পার্থিব বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সীমাভুক্ত করিবার চেষ্টা যে, স্বল্পবুদ্ধির পরিচায়ক তাহা বুঝিয়া এই স্তূপটি কি জানিবার জন্য বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। আমার সহচর স্তূপের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মহা চীৎকার আরম্ভ করিল; দুই একবার শব্দ করিবামাত্র, তাহার একাংশ আলোকিত হইয়া উঠিল এবং স্তূপগাত্রস্থ গহ্বর হইতে, আমার সহচরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটি জীব বহির্গত হইয়াই, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহা কলরব আরম্ভ করিল—তাহাদের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝিলাম, ইহারা আমার সম্বন্ধেই কথা বলিতেছে। তাহাদের অপূর্ব্ব ভাষায় কিয়ৎকাল এই প্রকার শব্দ করিয়া আবাসস্থানে প্রবেশের জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়াও আমি তাহাদের অনুগমনে সাহসী হইলাম না। বাল্যকালে আরব্য উপন্যাসের যে-সকল গল্প শুনিয়াছিলাম এবং ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায় ঠাকুরমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, মুদ্রিতনেত্রে রাক্ষসপুরী ও পিতৃভক্ত রাজপুত্রের রূপকথা শুনিয়া, নির্ম্মম রাক্ষসকুল ও বিপন্না রাজপুত্রী-সম্বন্ধে যে একটা কল্পনা খাড়া করিয়াছিলাম, এবং সেই রাক্ষসপুরীর করুণ কাহিনীর সহিত, জলপ্লাবিত পুষ্করিণীর আনন্দমত্ত ভেকের কোলাহল ও মৃদু গম্ভীর মেঘ-গর্জ্জনের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে ভাবিয়া, ঠাকুরমার কোলের নিকট ঘেঁসিয়া শুইয়াছিলাম, সেই সকল অতি পুরাতন স্মৃতি যেন সজীব হইয়া আমার গতিরোধ করিল; বোগ্‌দাদের বণিক্ পুত্র যদি পৃথিবীতে থাকিয়া এত বিপদাক্রান্ত হইতে পারে, আমি ক্ষুদ্র পার্থিবজীব, বিধাতার এক নূতনরাজ্যে আসিয়া তদনুরূপ বিপদ সংঘটন কেন অসম্ভব বিবেচনা করিব? শুক্রজীবগণের ব্যবহার আদর-ব্যঞ্জক হইলেও, তাহাদের আতিথ্যগ্রহণ সর্ব্বাংশে বিপদশূন্য বলিয়া বোধ হইল না—গুহাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

আমার এই অনিচ্ছার ভাব দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে একজন ত্বরিতপদে গুহাপ্রবেশ করিল এবং অতি অল্প সময় মধ্যে এক অদ্ভুত দীপহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুহা-দ্বারে দাঁড়াইল। এবার গুহাবিবর হইতে অপর একটি জীব বহির্গত হইল,—এটি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত শুক্রবাসীর জাতীয় নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। অনতি-উজ্জ্বল দীপালোকে, তাহার দেহ শুভ্র বস্ত্রাবৃত দেখাইল এবং বাহ্য আকৃতি ও চালচলন সকলই মনুষ্যের ন্যায় দেখিলাম। জগদীশ্বরের এই অদ্ভুত রাজ্যে, আমার ন্যায় আর একটি দুর্ভাগ্য মনুষ্যসন্তান দেখিয়া বিস্মিত হইলাম—বিস্ময় ও আনন্দে ক্ষণিক কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, এক বিপুল-আবেগপূর্ণ হৃদয়ে দৌড়িয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আর বিস্ময়ের সীমা থাকিল না—এক ভয়ানক চীৎকার করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম। আমার জীবনে এই প্রকার উচ্ছ্বাস ও আবেগপূর্ণ আলিঙ্গন কখনও করি নাই এবং এ প্রকার অব্যক্ত কঠোর-চীৎকার আর কখনও আমার কণ্ঠ-নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না—আলিঙ্গন-বদ্ধ এই ব্যক্তি আমার সেই বৈজ্ঞানিক বন্ধু! বন্ধুর আজানুলম্বিত ঢোলা কামিজ দেখিয়া দূর হইতেই তাঁহাকে চেনা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহাকে কখন বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ দেখি নাই, এখন এই দুইটা মিলিয়া তাঁহাকে এমনি রূপান্তরিত ও অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছিল যে, অতি অল্পদূর হইতেও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আমার বাহুবদ্ধ হইয়াও বন্ধুর মৃত্তিকাসংলগ্ন দৃষ্টি উত্তোলিত হইল না—তাঁহার স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রস্তরবৎ নিশ্চলই থাকিল। কয়েকবার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করায় মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার নিরুৎসাহব্যঞ্জক বিমর্ষ বদনমণ্ডলে বিস্ময়ের ছায়া আসিয়া পড়িল। বোধ হয় তিনি আমার অস্তিত্বের উপর সন্দিহান হইয়া, সকলই এই অদ্ভুতরাজ্যের মায়ার খেলা ভাবিয়া-

ছিলেন। যাহা হউক আমি যে শুক্রবাসিগণের মায়া-প্রসূত নহি এবং প্রকৃতই তাঁহার চিরপরিচিত পার্থিব সুহৃদ্ তাহা নানা উপায়ে বিশ্বাস করাইয়া দিলাম—বিশ্বাসসংস্থাপনে অবশ্য কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এক জন বন্ধুকে এই প্রকার সন্দেহ করায়, পরে তিনি বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ন্যায় একজন পূর্ণ জড়বাদীর পক্ষে প্রত্যক্ষ মানুষটাকে, একেবারে মায়ার রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার কল্পনাটাও যে একটি গুরুতর অপরাধ, তাহা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

আমার শুক্রে গমনের বিবরণাদি বিবৃত করিয়া, বন্ধুর আকস্মিক লোকান্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন—"ভাই, তোমার বৈঠকখানা ঘরে সেই আরাম-কেদারায় শুইয়া আল্‌বোলার নলটি মুখে রাখিয়া সদ্য-আলোচিত গ্রহ প্রকৃতই জীবাবাসোপযোগী হইলে, কি প্রকার জীব সেস্থানে বাস করিতে পারে, তাহার বিষয় ভাবিতেছিলাম; এবং অল্প চিন্তার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগও করিয়াছিলাম; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এবং উদ্গারিত ধূম নলটিই বা কখন ওষ্ঠচ্যুত হইয়াছিল, তাহা কিছুই মনে নাই। তাহার কিঞ্চিৎ পরেই, কি এক অদ্ভুত কুহকে আমার কল্পিত অধিবাসিগণের দুর্গন্ধময় গহ্বরে নীত হইয়াছি—এ প্রকার বিস্ময়জনক ঘটনার কথা কখন শুনি নাই; কোন দেশের কোন বিজ্ঞানবিৎ এই অদ্ভুত উপায়ে জ্যোতিষিক আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিয়াছ কি?" আমি নানা প্রকারে বন্ধুকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং সকলকেই যে একই নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার কোন বাঁধা নিয়ম নাই, তাহা হইলে লোভেরিয়রের নূতন গ্রহাবিষ্কার ব্যাপারটা একবারে উড়াইয়া দিতে হয়—এ সকল কথাও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

আমার আশ্বাসবাণীতে, বন্ধুর বিষাদাঙ্কিত গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিয়াছিল কি না দেখি নাই। নিকটবর্ত্তী শুক্রবাসিগণ পরস্পর মহা কলরব আরম্ভ করিয়াছিল—দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট ছিল।

আমাদিগকে গুহা প্রবেশ করাইবার জন্য শুক্রবাসিগণ বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধু যখন অক্ষত শরীরে গুহানিস্ক্রান্ত হইয়াছেন, তখন ভয়ানক শীতে জীবনধারণ অপেক্ষা তাহাদের আতিথ্যগ্রহণ যে বিশেষ বিপদসঙ্কুল, তাহা বিবেচনা হইল না, বন্ধুরও গুহাপ্রবেশে অমত ছিল না। আমার খর্ব্বদেহ পূর্ব্ব সহচরটি এবারও পথপ্রদর্শক হইয়া দীপহস্তে সর্ব্বাগ্রে গুহাপ্রবেশ করিল, আমরা পশ্চাৎ চলিলাম। শুক্রবাসীর ন্যায় বর্ব্বর জাতির ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য সুখের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই গুহায় সজ্জিত দেখিলাম। গুহাটি বেশ গরম; শুক্রের অন্ধকার-অংশে সূর্য্যকিরণাভাবে, বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, কাজেই কাষ্ঠ কয়লা ইত্যাদি দাহ্য পদার্থও তথায় এককালীন উৎপন্ন হয় না, এজন্য শুক্রের জীবগণ এক প্রকার নিকৃষ্ট প্রাণীর বসা সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করে। দেখিলাম, শীত নিবারণার্থে গুহার দুই অংশে বসা-অগ্নি জ্বলিতেছে, এবং গুহাটি বেশ আলোকিত হইয়াছে।

বন্ধু শুক্রগ্রহে উপনীত হইয়া, ইহার অধিবাসীদের অনেক গার্হস্থ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিলাম—ইহারা প্রায়ই উদ্ভিজ্জভোজী; মৃত্তিকা খনন করিয়া শুক্রগর্ভের অতি নিম্ন প্রদেশে উদ্ভিদাদি উৎপন্ন করে; সৌরতাপাভাবে ইহাদের উৎপত্তির কোন অনিষ্ট হয় না—শুক্রের আভ্যন্তরীণ তাপ দ্বারা সূর্য্যতাপের কার্য্য সাধিত হয়। কি পরিমাণ তাপে কোন উদ্ভিদ্ ভাল উৎপন্ন হইবে, ইহা তাহারা বেশ বুঝে এবং তাপের আবশ্যকতা অনুসারে, উদ্ভিদ-ক্ষেত্রের গভীরতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহারা বসা-

সংগ্রহের জন্য যে সকল পশু হত্যা করে, তাহাদের মাংস মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ করিয়া আহার করে, এবং লোমশ চর্ম্ম, শয্যা ও বস্ত্রাচ্ছাদনরূপে প্রস্তুত রাখে।

আমরা অগ্নি-পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গল্প করিতে লাগিলাম—এই অবকাশে এক শুক্রবাসী আহার প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। হিসাব করিয়া দেখিলাম আমরা প্রায়, দশ ঘণ্টা শুক্রগ্রহে উপস্থিত হইয়াছি, নানা উৎকণ্ঠা ও আবেগের আবর্ত্তে পড়িয়া রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তি ও উদর-সেবার কথাটা মনে স্থান পায় নাই—কিন্তু এখন এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করায় শারীরিক অবসাদ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং আহারেচ্ছাটাই অতি প্রবল বলিয়া বোধ হইয়াছিল—আহার্য্যের সদ্ব্যবহারে আমার মোটেই অমত ছিল না। অজ্ঞাত-ব্যবহার বর্ব্বরজাতির প্রদত্ত আহার্য্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া, বন্ধুবর প্রথমে আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আমার সহিত যোগদান করা আপত্তিকর বিবেচনা করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার দার্শনিক হৃদয়টাও উদরের কুহকে ঠিক্ থাকিতে পারে নাই। আহারান্তে পকেটবদ্ধ চুরুট বাহির করিয়া ধূম-পান করিতে লাগিলাম। বন্ধু চুরুট-ধূম-পানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি নিকটস্থ চর্ম্মশয্যা আশ্রয় করিয়া, আমাদের শুক্রপরিভ্রমণ ও গুহাত্যাগাদি-সম্বন্ধে নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন। বন্ধুর বিষাদকালিমাঙ্কিত মুখমণ্ডল যেন ক্রমেই প্রফুল্লভাব ধারণ করিতে লাগিল, তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টি যেন জগতের অতি গুহ্য জটিলতত্ত্বেরও মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে উদ্যোগী; আমার মুখনিঃসৃত কুণ্ডলিত ধূম স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—তুচ্ছ ফুৎকারজাত ধূমের ক্ষণিক উত্থান-পতনে বন্ধু কোনও গভীর দার্শনিক তত্ত্বাবিষ্কারের সুযোগ পাইয়াছিলেন কিনা জানি না।

আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে গুহার বাহিরে আসিলাম। অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রভূষিত আকাশের নীচে শান্ত প্রকৃতি বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইল। অনতিকৃষ্ণ প্রান্তরের সহিত অনন্ত আকাশের আলিঙ্গন আরো মধুর; ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে শুক্রগ্রহটিকে একটি অনন্ত বিষাদে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, এটা যেন সৃষ্টিকর্ত্তার ছেলেখেলার উদাহরণ, অনন্ত শক্তির আধার বিশাল নক্ষত্র ও নানা ঋতুসম্পন্ন গ্রহাদি নির্ম্মাণ করিতে করিতে বালসুলভ চাপল্য বশতঃ তিনি যেন কি গড়িতে কি গড়িয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু অশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাগ্যবান্ ভ্রাতাদের সহিত চিরদগ্ধ ও বিষাদাবগুণ্ঠিত শুক্রগ্রহটিও জগৎ-নিয়ন্তার কীর্ত্তিগাথার অনন্ত তানে, একটি ক্ষীণ-স্বর যোজনায় ভুলে নাই—দিগদিগন্তের নক্ষত্র, যেন মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাদের এক হতভাগ্য দুর্ব্বল ভ্রাতার ঐকান্তিকতা চাহিয়া দেখিবে। তখনও আমাদের পৃথিবী ক্ষুদ্র চন্দ্রের সহিত দিগন্তে প্রকাশিত ছিল, আমরা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর অস্তগমন দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। অসীম স্তব্ধ আকাশের একপ্রান্তে পৃথিবী মিট্ মিট্ জ্বলিতে-ছিল—অনন্ত বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী কি এতই ক্ষুদ্র? তবে পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব মানুষই বা কত ক্ষুদ্র এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ও বাসনাই বা কত ক্ষুদ্র! বড়ই ক্ষোভের কথা, এই সুমহান্ দৃশ্যের মধ্যে বিশ্ব-মহিমার সার তত্ত্বটুকু প্রত্যক্ষ করিয়াও আধ্যাত্মিকতার চরমোৎকর্ষ হিন্দু-সন্তানটির মনে, একটুও বৈরাগ্যের ভাব উদিত হয় নাই,—গগন-প্রান্তের ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুটি, আমার সেই মধুর গৃহ মনে করিয়া দিয়াছিল—বহুদূর স্থিত ছায়ারাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া যে ক্ষুদ্র বাগানটি আছে, তাহাতে বান্ধব-সমাগম ও সান্ধ্য-আলাপন যে কত মধুর তাহাই কেবল মনে জাগিতেছিল; এই সুদীর্ঘ মরুব্যবধান উত্তীর্ণ হইয়া কখন সেই অতুল সৌন্দর্য্যময় জীবজগতের প্রাত্যহিক জীবনোৎসবে যোগ দিতে পারিব, কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। বন্ধু ত আত্মহারা—

চন্দ্র অস্তে গিয়াছে, পৃথিবী তখনও দিগন্তপ্রান্তে স্নিগ্ধোজ্জ্বল *শেষ কিরণ* বর্ষণ করিয়া অস্ত গমনোন্মুখ—বন্ধু এই দৃশ্যে যে কত বড় কবিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন জানি না, তবে ইহার মধ্যে তিনি যে একটু কিছু সূক্ষ্ম দেখিতেছিলেন, তাঁহার অচটুল নয়নযুগল ও স্থিরমূর্ত্তিতে, তাহা বেশী প্রতিভাত হইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র গ্রহাদির অস্তদৃশ্য শুক্রগ্রহে বাস্তবিকই এক নূতন ঘটনা। পৃথিবীর আকাশ সর্ব্বদা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকায়, ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দিগন্তবর্ত্তী হইবামাত্রই বাষ্পাবরণে অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহাদের ক্ষীণ জ্যোতি বাষ্পরাশি ভেদ করিয়া ধরা-পৃষ্ঠে পৌঁছিতে পারে না; কিন্তু শুক্রের অন্ধকার-অংশে কোন সময়েই সূর্য্য উদিত হয় না, এজন্য তাপাভাবে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতে না পারায় আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে ও প্রত্যেক ক্ষুদ্র নক্ষত্রটিও মানব-চক্ষে দীপ্তিশালী দেখায়। এই ভয়ানক শীতে, শুক্র-পৃষ্ঠে বরফতুষারাদি অভাবের কারণ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায়, ইহাও সৌরতাপাভাবের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন; কথাটা প্রকৃত বলিয়াই বোধ হইল; সূর্য্যকিরণাভাবে শুক্রগর্ভনিহিত জলরাশি বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না—কাযেই মেঘ বৃষ্টি, নদী তুষারাদি উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অসভ্য শুক্রবাসিগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমরা অনেক কাল গুহাবাস করিলাম। শুক্রগ্রহে সময়নিরূপণ ব্যাপারটা বড় কঠিন, আমাদের রাত্রিদিনের মত ইহাতে একটা বড় সময়বিভাগের কোন উপায়ই নাই। আমার পকেটে একটি ঘড়ি ছিল, তাহাতে কেবল বার ঘণ্টার হিসাব চলিত, তাহার পর সকলই গোলযোগ হইয়া যাইত একই অংশ সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত রাখিয়া আমাদের ২২৪ দিন ১৮ ঘণ্টায়, শুক্র সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে জানিতাম, কাযেই পৃথিবী স্বীয় কক্ষপ্রদক্ষিণ-কালে অর্থাৎ এক বৎসর পরে, যে-সকল জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত

প্রত্যক্ষ করে, শুক্র হইতে তদপেক্ষা অল্পকাল ২২৪ দিনে, ঠিক সেই সকল জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত দেখা যাইবে—একথাটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল; নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্ররাশির উদয়াস্তকাল পরীক্ষা করিয়া, সেই সময়টি শুক্রবর্ষ ২২৪ দিনের কত অংশ, তাহা হিসাব করিয়া সময়নিরূপণ করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে দেখা গেল, আমরা প্রায় দুই সপ্তাহ গুহাবাস করিতেছি। শুক্রগ্রহে আগমন-কাল হইতে আমাদের একটি বড় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল—ক্ষুধাদমন শক্তিটা আমাদের অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে উদরের কুমন্ত্রণায় পৃথিবীতে নিশিদিন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছি, শুক্রে পদার্পণের কিছুকাল পর হইতেই তাহার অস্তিত্বের চিহ্ন-মাত্রও জানিতে পারি নাই, এই দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা কেবল তিনবার আহার করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতে দুর্ব্বলতা বা শারীরিক অবনতির লেশমাত্র অনুভব করি নাই। শুনিয়াছি দেবতারা অমৃতপানে অমর ও ক্ষুধারহিত হইয়াছেন; যদি আহার-লিপ্সা-হীনতা দেবত্বের একটা অঙ্গ হয়, তাহা হইলে শুক্রগ্রহে আসিয়া যে আমরা ঈশ্বরত্বের একটা বড় সোপানে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের পৌরাণিক স্বর্গ যে কতকটা শুক্রগ্রহের ন্যায়, বন্ধুবর তাহা ইহা হইতে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক আমাদের অসম্ভব ক্ষুধানিরোধ-শক্তির প্রকৃত কারণ আবিষ্কারের জন্য বন্ধুকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; এই গবেষণায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি বন্ধুকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম। অনেক পরীক্ষা করিয়া শুক্রবাসী-দিগের প্রধান খাদ্য একজাতীয় শাক সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর দেখা গেল; কেবল একবার মাত্র ইহা আহার করিলে প্রায় দশ দিবস পর্য্যন্ত সামান্য ক্ষুধারও উদ্রেক হয় না। এই উদ্ভিজ্জাহারই যে আমাদের ভোজনস্পৃহা নিরোধের একমাত্র কারণ, তাহাতে আর সংশয় রহিল না।

বহুকাল একস্থানে থাকিয়া মন বড় অস্থির হইল, বন্ধু বলিলেন—"শুক্রের অন্ধকার-অংশে যাহা দেখিবার ছিল, সকলই দেখা গেল, এখন ইহার সূর্য্যকিরণোন্মুক্ত অপরার্দ্ধে কি আছে দেখা যাক্"। বন্ধুর কথায় আমার অণুমাত্র অমত ছিল না; আমি প্রসঙ্গক্রমে দুই একবার এবিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার গুহাত্যাগে অনিচ্ছার লক্ষণ দেখিয়া, কথাটা স্পষ্ট প্রকাশ করি নাই। যাহা হউক, আমরা শীঘ্রই শুক্রের অপরার্দ্ধ ভ্রমণার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। পথে শীত নিবারণোপযোগী লোমশ চর্ম্ম, এবং দুই মাসের আহারোপযোগী পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুধানাশক শাক ইত্যাদি কয়েকটি পদার্থ সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করা গেল। আমরা শীঘ্রই গুহাত্যাগ করিতেছি শুনিয়া, শুক্রবাসিগণ মধ্যে এক ঘোর আকুলতা আসিয়া পড়িল—অসভ্য শুক্রজীবদের নিকট প্রীতি আমরা আশা করি নাই; আমার প্রথমপরিচিত শুক্রবাসী ঘটোৎকচ্ গুহাত্যাগের উদ্যোগ দেখিয়া আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বড়ই অনুরোধ করিতে লাগিল। আমাদের সহচর হইলে পথপ্রদর্শন ও অপর অনেক কার্য্যে ইহার সহায়তা পাইব দেখিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইবার আমাদের আপত্তি হইল না। সংগৃহীত পশুচর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া, ঘটোৎকচের মস্তকে আহার্য্য উদ্ভিজ্জাদির ভার রাখিয়া, আমরা গুহা ত্যাগ করিলাম।

নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দিক্‌নির্ণয় করিয়া, আমরা শুক্রের বিষুব-রেখার সমান্তরাল পথে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। গণনা করিয়া দেখা গেল, আমাদের অবলম্বিত পথানুক্রমে ছয় শত ক্রোশ চলিলে শুক্রের আলোকিতাংশে উপস্থিত হওয়া যাইবে। শুক্রের আকাশ সর্ব্বদাই মেঘহীন ও পরিচ্ছন্ন; এজন্য পর্য্যবেক্ষণকার্য্যের কোনও অসুবিধা হইত না। পথিমধ্যে আমাদের সমবেত চেষ্টায় শুক্রের একটি অপ্রাকৃতিক ঘটনার মীমাংসা হইয়াছিল, ভ্রমণকালে আমাদের পদোদ্ভূত অশ্বক্ষুরধ্বনিবৎ উচ্চ শব্দের প্রকৃত কারণ বন্ধুচিন্তাতেও অনেকক্ষণ স্থির

করিতে পারি নাই, পরে শুক্রপৃষ্ঠে তাপের অল্পাতিরেক না থাকায় বায়ুর স্থিরতা ও ইহার গুরুত্বের সমতাই, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার কারণ বলিয়া বোধ হইল। আমাদের পদক্ষেপণে স্তব্ধ বায়ুরাশি এতই অন্দোলিত হয় এবং তজ্জাত শব্দতরঙ্গ এত অধিককাল স্থায়ী হয় যে, তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

আমরা সোৎসাহে চলিতে লাগিলাম। অধিক শীতার্ত্ত বা পরিশ্রান্ত হইলে শুক্রপৃষ্ঠস্থ সুগভীর ফাটাল আশ্রয় করিয়া সুস্থ হইতাম। শুক্রপৃষ্ঠে এপ্রকার আশ্রয় গ্রহণোপযোগা স্থান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে অংশে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তথায় জীববাসের সামান্য লক্ষণও দেখা গেল না, দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সমতল প্রান্তরের ভীষণ দৃশ্যটা মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে এমন হাহাকার উত্থিত করিত যে, পদক্ষেপণের সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য লয়প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক বন্ধুর দার্শনিক মনটি বড়ই সুশিক্ষিত বলিতে হইবে—বিজ্ঞানের কথা তুলিলেই এই ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও মনকে একবারে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, নিজেই যুক্তি-উত্থাপন ও তাহার খণ্ডন করিয়া, উপস্থিত বিপদের কথা ভুলিয়া মহানন্দ উপভোগ করিতেন।

কিছুকাল এই প্রকারে অগ্রসর হইয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমরা এক সপ্তাহ চলিতেছি এবং ইতিমধ্যে একশত ক্রোশেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়াছি। এই সময়ে আমাদের পথের অনতিদূরে একটি উচ্চ স্তূপ দৃষ্ট হইল; আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার নিকটে গেলাম। দূর অন্ধকারে ইহাকে উচ্চভূমি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলাম বাস্তবিক তাহা নয়, ইহা একটি বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মাত্র। এই প্রাণিহীন মহামরু-মধ্যে অট্টালিকার চিহ্ন দেখিয়া আমরা বড় বিস্মিত হইলাম—সেই ভগ্ন অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কৌশল ও স্থপতিবিদ্যার চরমোৎকর্ষতার লক্ষণ যথার্থই বিস্ময়জনক।

কলাবিদ্যার বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ এই অট্টালিকা যে আমাদের পরিচিত শুক্রবাসিগণের হস্তপ্রসূত নয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানিতাম; বন্ধু অনুমান করিলেন, শুক্রের এই অংশে নিশ্চয়ই এককালে অতি উন্নত জীবের বসতি ছিল, সেই সময় বোধ হয় পৃথিবীর ন্যায় এখানেও নিয়মিতরূপে দিবারাত্রি হইত; পরে কোন দুর্ঘটনা বশতঃ ইহা চিরান্ধকারাবৃত হইয়া উন্নতজীবাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে এবং কালে সেই সকল উন্নত জীবগণের বংশ লোপ হইয়াছে, এই ভগ্ন অট্টালিকা কেবল প্রাণিহীন তামসাচ্ছন্ন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বন্ধুর অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল।

এই ঘটনার পর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, এক সময়ে আমাদের পুরোবর্ত্তী পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ আলোকচিহ্ন দেখা গেল—নির্ম্মল শুক্রাকাশে এই দৃশ্য বড়ই প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল। এই ভয়ানক অন্ধকারময় রাজ্যে আসিয়া পর্য্যন্ত এমন স্নিগ্ধমধুর আলোক চক্ষুর্গোচর হয় নাই, ঊষাগমনের পূর্ব্বে পার্থিব গগনে যে ক্ষীণালোকের বিকাশ দেখিয়াছি, ইহা ঠিক তদনুরূপ। ইহা যে সূর্য্যোদয়ের চিহ্ন নয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানিতাম; শুক্রে আদিম অবস্থা যাহাই থাকুক, এখন ইহার একাংশ যে এককালে সূর্য্যালোকরহিত ও অপরাংশ সর্ব্বদাই সৌর-কিরণোন্মুক্ত, তাহাতে আর আমাদের সন্দেহ ছিল না। গণনা করিয়া দেখিলাম, আমরা তখনও শুক্রের আলোকিতাংশ হইতে প্রায় সার্দ্ধ চারিশত ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত; এতদূর হইতে সূর্য্যালোকচিহ্ন প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বন্ধু বলিলেন, আমরা পৃথিবীতে সূর্য্য-উদয়ের অনেক পূর্ব্বে যেমন রশ্মি সকলের পথপরিবর্ত্তন দ্বারা বহুদূরস্থিত সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাই, এখানেও হয়ত সেই প্রকারে শুক্রবায়ুরাশিতে দূরস্থিত সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করায়, তাহার

পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া, এই বহুদূরবর্ত্তী স্থানও আলোকিত করিতেছে। বন্ধুর কথাটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত হইলেও উপস্থিত বিষয়ে তাহা প্রযুজ্য বলিয়া বোধ হইল না। বায়ু-আবরণে আলোকপথ পরিবর্ত্তন ইহার কারণ হইলে, গুহাবাসকালে আমরা আলোক দেখিতে পাইতাম, শুক্রবায়ুরাশির গভীরতা ও ইহার রশ্মিপথ-পরিবর্ত্তন-ক্ষমতা (Index of Refraction) বোধ হয় পৃথিবীর বায়ু অপেক্ষা অল্প, এজন্য গুহাবাসকালে পার্থিব সান্ধ্যালোকের (Twilight) ন্যায় কোন আলোক নয়নগোচর হয় নাই; উপস্থিত বিষয়টির কোন মীমাংসা হইল না, এ সময় আমার ক্ষুদ্র আনিরয়েড্ ব্যারোমিটারটির কথা মনে হইল, সেটি সঙ্গে থাকিলে অনেক কাযে লাগিত।

আমরা অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শুক্রের এই অংশ তত বন্ধুর ছিল না, বেশ সমতল পরিচ্ছন্ন পথ; এই সুযোগে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকবেগে চলিতে লাগিলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পূর্ব্বাকাশের ক্ষীণালোক ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শুক্রের অনিবিড় অন্ধকার তাড়িত হইয়া, এক মধুর উজ্জ্বলতা চারিদিকে বিকশিত হইল। পূর্ব্ব গগনের তারকা সকল ক্রমেই জ্যোতিহীন হইয়া একে একে নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এই আলোক এতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমরা প্রায় নয় দশ ক্রোশ অগ্রসর হইলে, আর এক নূতন দৃশ্য নয়নগোচর হইল—পূর্ব্বগগনপ্রান্তে এক স্থূলোজ্জ্বল লোহিত রেখা আমরা হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বন্ধু ইহা দেখিয়া প্রথমতঃ সূর্য্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর হিসাব করিয়া দেখা গেল, সূর্য্যদর্শনলাভে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, তবে ইহা যে আশু সূর্য্য-উদয়-জ্ঞাপক লক্ষণ তাহাতে আর সংশয় থাকিল

না। আমাদের অনুগত সহচর ঘটোৎকচ এই ভয়ানক উৎকণ্ঠা ও চিন্তার সময়ে একটি বড় কৌতুকাবহ ঘটনার অবতারণা করিয়াছিল; সে পূর্ব্বোক্ত দূরবর্ত্তী আলোক দেখিয়াই, এমন কোলাহল ও আহ্লাদ-সূচক লম্ফঝম্প করিতে লাগিল যে, তাহার অসাধারণ প্রফুল্লতার কারণ দেখিতে না পাইয়া, এ সকল নিশ্চয়ই তাহার বিকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক বিবেচনা করিয়াছিলাম, এবং শেষে এই বর্ব্বর আমাদের কোন অনিষ্ট করে, এজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনেরও চেষ্টা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে যখন সে আমাদের পদতলশায়ী হইয়া, তাহার অদ্ভুত জাতীয়-ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার বাস্তবিকই বিকৃত মস্তিষ্কজ নয় বলিয়া স্থির করিলাম। বন্ধু, গুহা-বাসকালে শুক্রবাসিগণের সহিত অধিকাংশ সময়ই থাকিয়া, তাহাদের ভাষাটা কতক আয়ত্ত করিয়াছিলেন; ঘটোৎকচের ঘোর চীৎকার হইতে সারসংগ্রহ করিয়া বন্ধু বলিলেন—"পূর্ব্বাকাশের এই লোহিতালোক শুক্রবাসীদের বড় পূজ্যসামগ্রী; যে ভাগ্যবান্ শুক্রবাসী জীবনে একবার মাত্রও, এই মহাতীর্থ দর্শন করিয়াছে, সে সমাজে বড়ই আদরণীয় ও স্বয়ং অতুল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে; আমাদের দ্বারা ঘটোৎকচের সেই মহাতীর্থ দর্শন হইল বলিয়া, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।"

এখন দিক্-নির্ণয় ও পথভ্রান্তি-নিবারণের জন্য আর নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণাদির আবশ্যক হয় না; আবশ্যক হইলেও তাহার উপায় ছিল না, পূর্ব্বগগনের আলোকে পশ্চিমাকাশের দুই একটি শুভ্রকান্তি নক্ষত্র ব্যতীত অপর কোন জ্যোতিষ্কই দৃষ্টিগোচর হইত না। আমরা আকাশপ্রান্তস্থ পূর্ব্বোক্ত লোহিতালোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুকাল গত হইল কিন্তু উক্ত আলোকের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। এক দিবস স্থিরনেত্রে পরীক্ষা করিতে করিতে

আলোকমধ্যে যেন এক শ্বেতবর্ণ পদার্থ দেখা গেল। পদার্থটি কি প্রথমে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, উভয়ে নানা পরীক্ষাদি করিয়া শেষে ইহা তুষারাবৃত কোন পর্ব্বতশৃঙ্গ বলিয়া স্থির করিলাম। আমরা আকাশে যে আলোক দেখিয়াছিলাম, তাহা যে বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ সূর্য্যকিরণ নয়, এখন ইহা বুঝা গেল—তুষার-পর্ব্বতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যে, আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। দূরস্থ পর্ব্বত দেখিয়া আমরা সোৎসাহে প্রবলবেগে চলিতে লাগিলাম; প্রায় কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, তুষার-ধবল পর্ব্বতের আমূল সকলই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমরা সেই পর্ব্বতের তুষার-মণ্ডিত পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিকটেই একটি অনতি-উচ্চ পাহাড় ছিল, আমরা বহুযত্নে পাহাড়ে উঠিলাম—তথা হইতে পর্ব্বতের সুমহান্ গম্ভীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল। আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া পর্ব্বতারোহণের সুযোগ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। বন্ধু কিয়ৎকাল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন-চেষ্টা বড়ই বিপদ্‌সঙ্কুল হইবে—এই পর্ব্বত শিলাময় নহে, ইহা একটা বৃহৎ তুষারপর্ব্বত।" বন্ধুর কথাটা তাঁহার পূর্ব্ব-প্রচারিত নানা আজ্‌গবি সিদ্ধান্তের অন্যতম ভাবিয়া, ইহাতে বড় মনোনিবেশ করি নাই; কিন্তু যখন দেখিলাম, এ পর্য্যন্ত পর্ব্বতে একখণ্ডও ক্ষুদ্র শিলা দৃষ্ট হয় নাই, তখন বন্ধুর কথা জোর করিয়া মিথ্যা বলার কোন কারণ নাই বিবেচনা করিলাম এবং পরক্ষণেই পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি ভাসমান লোহিতাভ মেঘখণ্ড সকল দেখিয়া, তাঁহার অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। আমরা উভয়ে বিষয়টির আলোচনা করিয়া, এই তুষারপর্ব্বতের উৎপত্তির কারণ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলাম। শুক্রের সূর্য্যকিরণোন্মুক্ত অংশ হইতে মেঘ

সকল আসিয়া শীতল অন্ধকারাংশে প্রবেশ করিলে, শৈত্যাধিক্যে সকলই বরফ ও তুষারে পরিণত হইয়া, আলোক-আঁধারের সন্ধিস্থলে পতিত হয়; বহুকাল হইতে এই প্রকারে তুষার সঞ্চিত হইয়া, এক মহা পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে; পার্থিব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণ দ্বারা শুক্রমণ্ডল পরিদর্শন কালে, ইহার প্রান্তে যে উজ্জ্বল রেখা দেখিয়া থাকেন, তাহা যে এই তুষার পর্ব্বতই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত হইয়া উৎপন্ন করে, তাহাও বুঝা গেল।

এখন এই ভীষণ হিমপর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া কি প্রকারে আমাদের গন্তব্যস্থান শুক্রের আলোকিতাংশে উপনীত হইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ঘটোৎকচ পর্ব্বতারোহণ-কার্য্যে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল—তাহার দীর্ঘ নখযুক্ত হস্তপদ দ্বারা অনায়াসে মসৃণ তুষারপর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল, এবং তুষারে স্খলিতপদ হইবামাত্র, আমাদিগকে হইতে সাহায্য করিয়া উপরে তুলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ মহা শব্দে বৃহৎ বরফখণ্ড পড়িতে লাগিল, তাহার বজ্রকর্কশ ধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির ও সংজ্ঞা লোপের উপক্রম হইল। ঘটোৎকচের অবিরাম পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা ও বন্ধুর উৎসাহবাক্যে চালিত হইয়া, পর্ব্বতের অনেক উপরে উঠা গেল: এই সময়ে সুবর্ণ-গোলকের ন্যায় স্থির সূর্য্য আমরা প্রথমে নীলাকাশে উদিত দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সেই মহা-শীতে ও আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে প্রথম সূর্য্যদর্শনের কবিত্বটুকু অনুভব করিতে পারি নাই—কখন্ একখণ্ড বরফ বজ্রনিনাদে অসিয়া তুষার-সমাধিতে চিরশায়িত করিবে, এই চিন্তায় তখন হৃদয় পূর্ণ ছিল। কত উচ্চে উঠিয়াছিলাম হিসাব করি নাই, তবে বহুকাল আরোহণ করিয়া আমরা যে একটি অপেক্ষাকৃত অল্পোচ্চ পর্ব্বতশিখরে আসিয়াছিলাম তাহা বেশ মনে আছে। আমরা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলাম, নিম্নে বিশাল সমুদ্র ও ভাসমান বৃহৎ বরফস্তূপ ব্যতীত

অপর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। আমরা তুষার পর্ব্বতের যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তথা হইতে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ ক্রমনিম্ন হইয়া মৃত্তিকায় মিলিত হইয়াছে, তুষার পর্ব্বতের এই পিচ্ছিল ঢালু পার্শ্ব দিয়া স্থির পদে অবরোহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল; আবার সে স্থান পরিত্যাগ করারও উপায় নাই দেখিলাম। আমাদের প্রিয় সহচর ঘটোৎকচও যেন এই অবস্থায় পড়িয়া কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। আমরা অনুমান করিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতশিখর হইতে শুক্রের আলোকিতাংশের সমুদ্র প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ক্রমনিম্ন পিচ্ছিল ব্যবধান উত্তীর্ণ হইবার জন্য, বন্ধুবর এক উপায় আবিষ্কার করিলেন—ঘটোৎকচের নিকট আমাদের একখানি বড় ছুরিকা ছিল, তাহা দ্বারা মসৃণ বরফে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র খনন করিবার কৌশল, তাহাকে শিখাইয়া দিলেন; ঘটোৎকচ উপদেশ মত সেই প্রকারের ক্ষুদ্র সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়া অবতরণ করিতে লাগিল; আমরা হস্তপদ দ্বারা সেই ছিদ্র অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিলাম। অত্যন্ত ভীত দেখিয়া, আমাকে অগ্রে নামাইয়া সর্ব্বপশ্চাৎ বন্ধু স্বয়ং অবতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়দ্দূর অবরোহণ করিয়া হঠাৎ আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া পদস্খলন হইল; এই ভয়ানক বিপদে, আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া, বন্ধুর পদদ্বয় অবলম্বন করিয়া পুনরায় ছিদ্রে পদ স্থাপন করিব ভাবিয়া, দৃঢ়মুষ্টিতে বন্ধুর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলাম, কিন্তু বন্ধু আমার ভার বহন করিয়া দৃঢ়পদে থাকিতে পারিলেন না, তিনিও স্খলিতপদ হইলেন। আমরা উভয়ে এই প্রকারে জড়াজড়ি করিয়া, ক্রমনিম্ন পিচ্ছিলপর্ব্বত-গাত্র দিয়া পড়িতে লাগিলাম এবং পতনের সহিত আমাদের গতিও ভয়ানক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। আমাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া ঘটোৎকচ ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বায়ুর শন্ শন্ শব্দ এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অপর কোন শব্দই

আর শুনিতে পাই নাই। প্রায় এক মিনিট এই প্রকারে নামিয়া আমরা সমুদ্রজলে পতিত হইলাম—পর্ব্বততলে বরফ বা শিলাদি কোন কঠিন পদার্থ ছিল না, নচেৎ আমরা সেই ভয়ানক বেগে পতিত হইয়া যে এককালে ধূলিসাৎ হইতাম তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। আমরা উভয়েই বিলক্ষণ সন্তরণ-পটু ছিলাম, পতনের পর অল্পায়াসেই অদূরবর্ত্তী এক বৃহৎ বরফখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

এই অভাবনীয় উপায়ে আমাদের জীবনরক্ষা হওয়ায়, আমরা একান্ত মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম; পা ধরিয়া টানিয়া বন্ধুকে এই মহা বিপদের সঙ্গী করায় আমি তাঁহার নিকট বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলাম। ঘটোৎকচ যে প্রকার পর্ব্বতারোহণ-পারদর্শী তাহাতে শীঘ্র তাহার বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়াও এখন সে কি প্রকার অবস্থায় আছে, আমরা তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমাদের নিকটেই উচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। এই প্রাণিহীন তুষারপ্রদেশে কোথা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইল দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় আমাদের পশ্চাতে, একখানি নৌকারোহণ করিয়া কয়েকটি লোক তীরবেগে, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকাখানি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; আরোহিগণ আমাদিগকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়া তাহাদের জাতীয় ভাষায় আমাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল: আমরা তাহাদের ভাষা কিছুই জানিতাম না, কাজেই কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলাম না। অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহারা আমাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া, পর্ব্বতপ্রমাণ ভাসমান বরফের মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণপথ দিয়া চলিতে লাগিল এবং অতি অল্প সময় মধ্যে অনতিদূরবর্ত্তী এক বৃহৎ জাহাজে উঠাইল। জাহাজস্থ ব্যক্তিমাত্রেই আমাদিগকে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইল, জাহাজের চালক

আমাদের সিক্তবসনাদি পরিবর্ত্তন ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই শুক্রবাসিগণকে দেখিয়া আমরাও অতীব বিস্মিত হইয়াছিলাম; তাহাদের শারীরিক গঠনাদি সকলই মনুষ্যের ন্যায়, বরং ইহাদের ন্যায় কৃষ্ণকেশ উজ্জ্বলচক্ষু ও সুশ্রী মুখমণ্ডলযুক্ত মনুষ্য পৃথিবীতে প্রায়ই দুর্লভ বলিয়া বোধ হইল। কার্য্যতৎপরতা ও চালচলন দেখিয়া তাহারা যে, এক উদ্যমশীল উন্নতজাতিসম্ভূত, তাহা স্পষ্ট জানা গেল। জাহাজের প্রত্যেক কামরায় শীতনিবারণার্থ অগ্নি রক্ষিত হইয়াছে এবং আরোহিগণের সকলেরই শরীর স্থূল পশমী বস্ত্রে আবৃত আছে দেখা গেল। ইহারা যে কোন উষ্ণতর প্রদেশবাসী আমরা তাহা দ্বারা অনুমান করিলাম।

এই শুক্রবাসিগণ কি কারণে বরফাবৃত সমুদ্রে আসিয়াছে, জানিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, পরে শুনিয়াছিলাম, আমাদের উল্লঙ্ঘিত তুষার পর্ব্বত ভেদ করিবার উপায়াবিষ্কারার্থে ইহারা রাজব্যয়ে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে। আমরা আশ্রয়গ্রহণ করার কিছু পরেই জাহাজ ছাড়িবার আয়োজন হইতে লাগিল; কিন্তু কয়েকজন আরোহীসহ একখানি নৌকা তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই বলিয়া, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল। আমি এক সুসজ্জিত কামরায় অগ্নিপার্শ্বে বসিয়া আমাদের ভয়াবহ অতীত জীবনের কথা বন্ধুর সহিত আলোচনা করিতে লাগিলাম—ইতিমধ্যে জাহাজের বাহিরে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, আমরা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কয়েকটি শুক্রবাসী নৌকায় করিয়া আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ঘটোৎকচকে লইয়া আসিতেছে এবং সে মহা চীৎকার করিতেছে। তাহাকে লইয়া সকলেই মহা ব্যতিব্যস্ত। আমাদিগকে দেখিয়াই ঘটোৎকচ একবারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং পদতলে পড়িয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। এই অদ্ভুত জীবটিও আমাদের সহচর জানিয়া জাহাজের চালক তাহার থাকিবার পৃথক

ব্যবস্থা করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। পরে শুনিলাম, ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে কয়েকটি নৌকারোহণে তুষার পর্ব্বত পরীক্ষা করিতে গিয়া ঘটোৎকচকে একখণ্ড বরফে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে দেখিয়াছিলেন এবং দুর্দ্দশা দেখিয়া ইহাকে তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

জাহাজ দ্রুতবেগে বরফমধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিল। এই দুর্গম প্রদেশেও সুন্দর জাহাজ-পরিচালন কৌশল দেখিয়া ইহারা অসাধারণ নৌবিদ্যাকুশল বলিয়া বোধ হইল। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, এই সুবৃহৎ জাহাজ একটি যন্ত্র দ্বারা কেবল বৈদ্যুতিকশক্তি-প্রভাবে চালিত হইতেছে, এবং অধিক ভারগ্রহণোপযোগী করিবার জন্য ইহা আলুমিনিয়ম্ বা অপর কোন স্বল্পভার-ধাতু দ্বারা গঠিত হইয়াছে। সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নানা অজ্ঞাতব্যবহার যন্ত্রাদি দেখিয়া, ইহারা যে বিশেষ সভ্য ও উন্নতজাতিভুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না এবং সংসারের দৈনিক কার্য্যসাধনার্থে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়োগে, ইহারা যে ধরাবাসী মনুষ্য অপেক্ষাও সিদ্ধহস্ত তাহাও বুঝিলাম। চালক আমাদের বড়ই যত্ন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিনীত ব্যবহার ও শিষ্টাচার কখনই ভুলিতে পারিব না। ঘটোৎকচের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতিও তাঁহার বিশেষ যত্ন দেখা গেল। বন্ধু এক সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, ইহারা যে আমাদের পাইয়াই জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার পর এত যত্ন করিতেছে, ইহার একটি অতি গূঢ় কারণ আছে; আমাদের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব হস্তগত করিয়া, স্বদেশে উপস্থিত করিতে পারিলে, ইহারা বিশেষ পুরস্কৃত হইবে; তুষার পর্ব্বত ভেদোপায় আবিষ্কার অপেক্ষা এই অদ্ভুত জীবাবিষ্কার বোধ হয় তাহাদের নিকট অধিকতর সম্মানজনক। বন্ধুর এই অনুমান বড় অমূলক বলিয়া বোধ হইল না—আমাদের জন্য ভবিষ্যতের ক্রোড়ে আর যে কত বিপদ সঞ্চিত আছে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমরা যখন তুষারসমুদ্র দিয়া চলিতে লাগিলাম, জাহাজের চালক প্রায়ই অবকাশ-কালে আমাদের নিকট আসিয়া বসিতেন, কিন্তু পরস্পর আমরা ভিন্নভাষাজ্ঞ হওয়ায় ব্যাক্যালাপে সুযোগ হইত না। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নানা দুশ্চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা ইহাদের ভাষা শিক্ষা করিবার বড় ইচ্ছা হইল ; চালকও আমাদের বিশেষ বিবরণ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উভয়ের সমবেত যত্নে আমরা শীঘ্রই শুক্রবাসিগণের ভাষা আয়ত্ত করিলাম।

ভাষাজ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত শুক্রবাসিগণের সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির অনেক পরিচয় পাইতে লাগিলাম এবং বিজ্ঞানের অনেক অংশে ইহারা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বোধ হইল। শুক্রবাসিগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মনুষ্য অপেক্ষা অনেক হীন দেখা গেল। শুক্রের এই অংশে সর্ব্বদাই স্থিরপ্রায় সূর্য্য বিকশিত থাকে বলিয়া, আলোকাধিক্য প্রযুক্ত গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শনের কোনই সুবিধা হয় না ; বোধ হয় ইহাই তাহাদের এই হীনতার প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত গগনমণ্ডল অধিকাংশ সময়ই যেরূপ ঘোর কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিয়া নিকৃষ্ট জ্যোতিষিক জ্ঞানের জন্য, ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর কোন দোষারোপ করা গেল না। জ্যোতিষ্ক-পরিদর্শনের এ প্রকার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেখিলাম ইহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে এবং তৎ-সাহায্যে তাহারা শুক্রকক্ষাভ্যন্তরস্থ বরুণগ্রহের (Mercury) গতি ও ইহার উপগ্রহণাদি (Transit) সম্বন্ধে নানা তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছে। শুক্র-গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় দেখিলাম পার্থিব বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষা ইহারা সৌর-ব্যাপারের অনেক গূঢ় রহস্য সমাধান করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় শুক্রের উপগ্রহ না থাকায়, ইহারা সূর্য্যগ্রহণ দেখিতে পায় না, কাজেই পূর্ণগ্রহণজাত সূর্য্যের ছটামুকুটই (Corona) বা কি পদার্থ সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শুক্রবাসিগণের এই জ্যোতিষিক অজ্ঞতাবশতঃ আমাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শুক্রের ন্যায় পৃথিবী নামে একটা গ্রহ যে, সৌর-পরিবার মধ্যে আছে, ইহারা তাহা জানিত না এবং দেখাইবার কোন উপায়ও ছিল না। আমরা ঘটোৎকচের সহিত যে তুষার পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া এ প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বরং ইহাদের বিশ্বাস্য হইয়াছিল, কিন্তু আমরা যে বহুদূরস্থিত ধরাবাসী দুইটি জীব, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারি নাই। বহু বাক্‌বিতণ্ডায় আমরা যে শুক্রের আলোকিতাংশের জীব নহি, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং আমরা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন শুক্রবাসী, ইহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল। যাহা হউক, আমরা যে অন্ধকারাবৃত শুক্রবাসী নহি, এবং ইতিপূর্ব্বে যে আমরা অনেকবার সূর্য্যমুখ দর্শন করিয়াছি, সৌর কৃষ্ণচিহ্নের (Dark spots) উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম ; আমরা যে, বরুণ-গ্রহের ন্যায় কোন একটি গ্রহের অধিবাসী অবশেষে তাহা ইহারা স্বীকার করিয়াছিল।

শুক্রের আলোকিতাংশের অধিবাসিবর্গের পূর্ব্বোক্ত স্থূল বিবরণ জানিয়া, এই অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন উন্নতজাতির আবাসস্থান ও তাহাদের প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য বড় উৎসুক হইলাম। এখন আর আমরা নিতান্ত নিরানন্দ ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকি না, অনেক সময়েই জাহাজের চালক ও কর্ম্মচারীদের সহিত আমোদআহ্লাদে যোগ দিয়া সময় বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়া যায়। কিন্তু বন্ধু যেন ক্রমেই বিমর্ষ হইতে লাগিলেন, বোধ হয় আমাদের এই আমোদআহ্লাদ তাঁহার সেই সাংসারিক সুখের স্মৃতি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিল। আমি একদিন আমাদের নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র ক্যাবিনে আহারান্তে মুদ্রিত চক্ষে বিশ্রাম করিতেছি, বন্ধুবর ধীরপদে আসিয়া আমার নিকট উপবেশন করিলেন, এবং মুদ্রিতনয়ন হইলেও আমাকে সজাগ জানিয়া, শুক্রবাসীদের আচার-

ব্যবহারাদি-সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সেদিন বিমর্ষতার মাত্রাটা কিছু অধিক দেখিয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করায়, বন্ধুবর স্পষ্টই বলিলেন, "শুক্রের উভয়াংশে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল সকলই জানা গিয়াছে—শুক্রের তামসাচ্ছন্ন মহা প্রান্তর পরিভ্রমণকালে যে উৎসাহ ছিল তাহা আর কিছুই নাই, এখন যেন একটা ভয়ানক নিরুদ্যম ও অবসাদ আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং সকলই যেন ঘোর নিরানন্দময় ও একঘেয়ে বলিয়া বোধ হইতেছে—"। বন্ধুর কথা শেষ না হইতে, কাম্‌রার বাহিরে এক মহা কোলাহল শুনা গেল, যেন কয়েকজন লোকে উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর বিবাদ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া চক্ষু খুলিয়া যেমন উঠিয়াছি, দেখিলাম আমার সেই ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরের কৌচের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি! বুঝিলাম, আমি এ পর্য্যন্ত কৌচেই শায়িত ছিলাম; নীচের ঘরে আমার এক উড়িয়া বেহারার সহিত এক দেশীয় ভৃত্যের মহা ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছে উভয়েই যথাসাধ্য চীৎকার করিতেছে। যদিও উভয় ভৃত্যই এক নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন পাইত, তথাপি প্রাধান্য লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত, এবং প্রত্যেকে অপরের উপর যথাসাধ্য প্রভুত্বস্থাপনের প্রয়াস পাইত; আজও যে সেই পুরাতন প্রাধান্য-প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এই গোলযোগ, এবং এই গোলযোগই যে আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গের কারণ, তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে ঘরের মেজের উপর মিট্ মিট্ করিয়া সেজ জ্বলিতেছিল। বন্ধুর অনুসন্ধানে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, তাঁহার অধিকৃত কেদারা খানি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্নদর্শনকালে বন্ধু কি প্রকার অবস্থায় ছিলেন জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম, বিলম্ব না করিয়া তাঁহার বাড়ী গেলাম। দেখিলাম বন্ধু বড় ব্যস্ত এবং তাঁহার স্বভাবগম্ভীর মুখমণ্ডল

অত্যন্ত প্রফুল্ল, তিনি স্বপ্ন-সম্বন্ধে কোন কথাই জানেন না দেখিয়া দুই এক কথার পর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং পরদিবস উভয়ে মিলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারের আলোচনা করিব বলিয়া স্থির করিলাম। সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না, গৃহিণী অবশ্যই আসন্ন অসুখের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু দিবসে বিলক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল বলিয়া কোন অসুখই হয় নাই। প্রাতে শুনিলাম একটি অস্থায়ী চাকুরীর পরোয়ানা পাইয়া, বন্ধু সেই রাত্রেই বিদেশযাত্রা করিয়াছেন। রাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ শুভসংবাদ আমাকে বলেন নাই ভাবিয়া মনে একটু খট্‌কা থাকিল। যাহা হউক সেই অবধি এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা কাহাকেও বলি নাই।

সম্পূর্ণ